আধুনিক রন্ধন-বিজ্ঞানের নবতম নিদর্শন

মেয়েদের পিকনিক

বহু বহু প্রাসঙ্গিক তথ্যপূর্ণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত
অভিনব পাক-প্রণালী

'ছেলেদের টিফিন' রচয়িত্রী
শ্রীবীণাপাণি দেবী সাহিত্য-সরস্বতী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

উৎসর্গ

স্বনামধন্য সহৃদয় চিকিৎসক

ডাঃ শ্রীযুত অমলকুমার রায় চৌধুরী এম-ডি

মহাশয়ের স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী

৺স্নেহলতা রায়চৌধুরাণীর

পুণ্যোজ্জল স্মৃতির

উদ্দেশে

গ্রন্থখানি

সমর্পিত হইল

গ্রন্থ-পরিচয়

বর্ত্তমানে রন্ধন-বিজ্ঞানের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়েছে। রন্ধন-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিরও আদর বেড়েছে। এতে মনে হয় যে, প্রকাশ-ভঙ্গিতে নূতনত্ব থাকলে কোন গ্রন্থই দেশবাসীর দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে না। বছর দুই আগে লেখিকার 'ছেলেদের টিফিন' নামে জলখাবারের বইখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এতই জনপ্রিয় হয় যে, সম্বৎসরের মধ্যেই একুশ শো বই শেষ হয়ে যায়। সেই বইখানির সম্পর্কে বহু বহু প্রশংসাপত্রের সঙ্গে বহু বহু জিজ্ঞাসা আমার উৎসাহ উদ্রিক্ত করে তোলে। ইচ্ছা ছিল, সেগুলিকে অবলম্বন করে কতকগুলি নূতন তথ্য ঐ গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণে সংযোগ করে দেব। কিন্তু কাগজের অভাবে প্রকাশক মহাশয়ের পক্ষে এ পর্য্যন্ত তার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় সে সঙ্কল্প আমাকে ত্যাগ করতে হয়। ইতিমধ্যে খাদ্য-সম্পর্কে যে সঙ্কট-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে স্বাস্থ্যবিদগণের মতে জীবনরক্ষার অনুরোধে আমাদের নিত্যকার আহার্য্য ধারার পরিবর্ত্তনও একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই রন্ধন-বিজ্ঞান ও খাদ্য-সমস্যার সমাধান-কল্পে সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনায় গ্রন্থখানিকে রূপায়িত করা হয়েছে।

সখের রাঁধুনি এবং ভোজনবিলাসীরা এই গ্রন্থে হয় ত অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়ে পুলকিত হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সংসারের কিশোরীরা—একদিন যারা সুগৃহিণী এবং পাকা রাঁধুনী হয়ে পরিজনদের আনন্দবর্দ্ধন করবে—তাদের পানে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থখানিকে শিক্ষার পথ দিয়ে বস্তু-সাহিত্যের আসরে এনে উপস্থিত করেছি। উদ্দেশ্য

এই যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব খাদ্য অপরিহার্য্য এবং যাদের সঙ্গে আমরা চিরপরিচিত, আমাদের সংসারের বালিকারাও শিক্ষার সঙ্গে সহজেই যাতে সে সব খাদ্যগুলির আদ্যোপান্ত জেনে খাদ্য বিচার করতে সমর্থ হয় এবং কোন্ খাদ্যটি আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী, কি ভাবে রন্ধন করলে খাদ্যের গুণ বজায় রেখে রুচিকর করা যায়—এগুলি পর্য্যায়-ক্রমে জেনে রন্ধনব্যাপারে পাকাপোক্ত হতে পারে।

'ছেলেদের টিফিন' পড়ে যাঁরা প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন, 'মেয়েদের পিকনিক'এর মধ্যেও তাঁরা রন্ধন-বিজ্ঞান ও খাদ্য-সত্তার সম্বন্ধে নব নব তথ্যের সন্ধান পেয়ে তাঁদের সংসারে কন্যা ও বধূর হাতে এখানি আদরে তুলে দিলে লেখিকার উদ্যম ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও গ্রন্থখানির প্রকাশ-ব্যাপারে প্রচুর ব্যয় স্বীকার করে লেখিকাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন এবং কলিকাতা হগ মার্কেটের প্রসিদ্ধ মৎস্য ব্যবসায়ী সুসাহিত্যিক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস মৎস্য সম্বন্ধে বহু নির্দ্দেশ দিয়ে লেখিকার আশীর্ব্বাদভাজন হয়েছেন।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

শ্রীবীণাপাণি দেবী

মেয়েদের পিকনিক

সূচিপত্র

গোড়ার কথা—মেয়েদের পিকনিকের পরিচয় ১—৬

রন্ধন-সম্ভার ৭—৬৭

রন্ধনের ইতিহাস—রান্নার সৃষ্টি হল কি ভাবে আর মেয়েদের হাতেই কেন তার ভারটি পড়ল ; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রন্ধন বিদ্যার আদর ও প্রচার ; রাজপরিবারে রান্নার কদর।··· (৭—১৪ পৃঃ)

রন্ধনের উপাদান—রন্ধন-যন্ত্র ও রন্ধন সংক্রান্ত তৈজস-পত্র, বিভিন্ন আকৃতির রন্ধন-যন্ত্র বা উনানের পরিচয়, উনান পাতবার ও মজবুত করবার প্রণালী, আধুনিক উন্নত প্রণালীর উনান ; উত্তাপ ও জ্বালের কথা ; বিনা ধোঁয়াতে উনান ধরাবার প্রণালী, বাড়ীতে জ্বালানি তৈরীর সহজ উপায় ; বাষ্পের সাহায্যে রন্ধন প্রণালী ; বিনা কুকারে বাড়ীতেই বাষ্পের সাহায্যে রন্ধনের নূতনতম প্রণালী ; রন্ধন অনুযায়ী উত্তাপ বা জ্বালের নির্দ্দেশ ; জলের কথা ; রন্ধনে জলের উপযোগিতা ; জল সম্বন্ধে নির্দ্দেশ। (১৫-৪৫)

খাদ্য-বিচার—খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ (স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও পরিচয়, খাদ্য-প্রাণ বা ভিটামিন সম্বন্ধে সরল ব্যাখ্যা, শাক-সব্জি, তরি-তরকারি, ফল, মাছ-মাংস-ডিম, দুধ-ছানা-মাখন প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্যের পরিচয় এবং স্বাস্থ্যের উপর এদের প্রভাব। (৪৬-৬৭)

রন্ধন-প্রসঙ্গ—রন্ধনের উদ্দেশ্য ও গুণ; রন্ধনের দোষ, রন্ধনের দোষগুলি দূর করবার উপায়; আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত রন্ধন-প্রণালী; **রন্ধনের মসলা** ঃ মসলা-পরিচয়, বাটা মসলা, গুঁড়ামসলা বা কারী-পাউডার, 'গোটা'-মসলা, 'গোটা'-মসলার উপাদান ও ব্যবহার প্রণালী, তরল মসলা, পাঁচফোড়ন, ব্যঞ্জন ভেদে মসলার উপযোগিতা (কোন্ কোন্ ব্যঞ্জনের পক্ষে কোন্ কোন্ মসলা উপযোগী, স্বাদে রুচিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী) জিরা, কালজিরা, কাল মরিচ, শ্বেত বা সা-মরিচ, পিঁপুল, ধনে, মৌরি, মেথি, রাঁধুনি, হিং, পিঁয়াজ ও রসুন, আদা, সরিষা, কাঁচা লঙ্কা, শুকনা লঙ্কা, হরিদ্রা, তেজপাতা, গরম মসলা, জায়ফল ও জৈত্রী, বড় এলাচ, জাফরান, পোস্তদানা ও তিল প্রভৃতির প্রকৃতি বিচার ও ব্যবহারের নির্দ্দেশ; মসলা নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ প্রণালী। (৭৪—৮৫)

খাদ্য-সম্ভার ৮৬—২০০

শর্করাজাতীয় খাদ্য—(কার্ব্বো-হাইড্রেট)—ধান গম যব জই ভুট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যজাত এবং আলু মিষ্ট-আলু কচু ওল কাঁচকলা প্রভৃতি সমপর্য্যায়ভুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যগুলি রন্ধনোপযোগী করবার ব্যবস্থা ও প্রণালী; এদের রাসায়নিক উপাদান; ধান থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য ঃ ধান ভেজে খই করবার প্রণালী, খই ভাজবার প্রণালী, খইএর মুড়কি, খই-নাড়ু, খই-মণ্ড, খইয়ের ক্বাথ, খইয়ের মোয়া; ধান থেকে মুড়ির চাল তৈরী করবার প্রণালী, মুড়ির চাল থেকে মুড়ি ভাজবার প্রণালী, ধান থেকে চিঁড়া করবার প্রণালী; খই-মুড়ি-চিঁড়ার গুণ; চিঁড়ার চাকতি, চিঁড়ার চিত্তহরণ, চিঁড়ার কচুরি, চিঁড়ালুর মোহনপুরি, চিঁড়া-কমলা; ধান থেকে ভাতের চাল প্রস্তুত প্রণালী; আতপ চাল তৈরী করবার প্রণালী, সিদ্ধ চাল তৈরী করবার প্রণালী; চালের ক্ষুদ, চাল ও

ভাত, ভাত রান্নার প্রণালী, ফেন না-গেলে ভাত রঁাধবার প্রণালী, ভাতে ভাত, ভাত ভাজা, ভাতের সব্‌জি পলাও, ভাতের পোলাও, ভাতের চপ, উদ্বৃত্ত বা বাসি ভাত গরম করবার প্রণালী. ভাতের গোলাপী পোলাও। (৮৬—১০৯)

গম থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য: আটা প্রস্তুত প্রণালী, গমের দালিয়া, রুটি প্রস্তুত প্রণালী। সুজির রুটি, নারিকেলের রুটি, তালের রুটি, চাপাটি, পাঁউরুটির টোষ্ট, পরটা প্রস্তুত প্রণালী, গোল পরটা, তেকোনা পরটা, চৌকো পরটা, মোগলাই পরটা, ঢাকাই পরটা, ফেণী পরটা, পূরি প্রস্তুত প্রণালী, সাধারণ পূরি, ছাতুর পূরি, ডাল পূরি, জোড়া পূরি, কচুরি প্রস্তুত প্রণালী, শিঙ্গাড়া প্রস্তুত প্রণালী, শিঙ্গাড়ার পুর, লুচি, মিষ্টি লুচি, রঙ্গিন লুচি, লাল লুচি, সবুজ লুচি, হলদে লুচি, চাঁপা রঙের লুচি। (১১০-১২৪)

যব ও ভুট্টাজাত খাদ্য—যবের আটা, যবের ছাতু, ভুটা জোয়ার বজরা ছোলা মটর প্রভৃতির ছাতু। (১২৪-১২৫)

আনাজ বা তরকারি জাত খাদ্য: আলু কচু ওল কাঁচকলা পেঁপে প্রভৃতি শর্করা-জাতীয় তরকারি গুলির রন্ধন-প্রণালী, তরকারীগুলির রাসায়নিক উপাদান, আলু ছেঁচকি, আলুর ঘণ্ট, আলু ভাজা (বিভিন্ন প্রণালীর), আলুর ঝুরি ভাজা, গুলি আলু ভাজা, আলুর পকৌড়ি, আলুর বড়া (পাটভাজা), আলুর চপ, আলুর কচুরি, আলুর ডেভিল, আলুর পটপটি, আলুর থাসা, সিদ্ধ আলুব সালাদ, কচু-কাঁচকলা-পেঁপে ওল প্রভৃতির ঐ সকল খাদ্য, ওলের ডালনা, কচুর কাটলেট, কাঁচা কচুর সালাদ। (১২৬-১৩৩)

শাক-সবজি-জাত খাদ্য—(শর্করা, ছানা ও চর্ব্বি সংযুক্ত) এদের রাসায়নিক উপাদানের কথা, বিভিন্ন প্রকার শাকভাজার

প্রণালী, সজিনা ফুল, কচু ও ওলের ডেগো, কচুপাতা ভাজা, পলতা ভাজা, কুমড়া পাতার কাটলেট, শাকসিদ্ধ, বাঁধা কপির বড়া, কপি সিদ্ধ, কপির রাওতা, বাঁধা কপির মফিন, কপির ঘণ্ট, কপির বাটি-চড়চড়ি, ঢেঁড়স-কারী, গোলাপফুলের পাপড়ি ভাজা, গুলকন্দ, আমপাতার ডালনা, মোচার টিকলি, শাক-সবজির আচার। (১৩৩-১৪৩)

ছানা জাতীয় বিভিন্ন খাদ্য—(প্রোটিন) ডাল, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আধুনিক প্রণালীতে রন্ধন করবার প্রণালী; ডালের গুণ, ডাল রাঁধবার প্রণালী, ডালের স্থপ, টকের ডাল, তিত ডাল, বিভিন্ন ডালের মসলা ও ফোড়ন, অনুষঙ্গযোগে ডাল রন্ধন প্রণালী, ডালের আমিষ কারী, ডালের ঘণ্ট, ডালের ডালনা, ডালের পুর, চানাচুর, ডালের হালুয়া, ডালের বরফি, ডালের মোহনভোগ। (১৪৪-১৫৪)

মাছ থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য: মাছের গুণ ও রাসায়নিক উপাদান, কোন্ মাছে কি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে, বিভিন্ন মাছ কাটা ও পরিষ্কার করবার প্রণালী, পোনা, পারসে, ইলিস, ইলিসের ডিম, কই, ফেঁসা, খয়রা, চেলা, বোমলা, মৌরলা প্রভৃতি মাছ ভাজার বিভিন্ন প্রণালী, অনুষঙ্গযোগে পমফ্রেট, তপসে, পারসে, ভাঙন, ভেটকি প্রভৃতি মাছের 'ফ্রাই'; বিভিন্ন মাছের 'বেগুনী'; গলদা চিংড়ীর 'তেলা ভাজা'; কাঁটা-শূন্য করে ইলিস মাছ রাঁধবার প্রণালী, ইলিসামৃত, ইলিসের কাঁটা তরকারি, ভেটকি মাছের কাঁটা-তরকারি, বাঁধা কপি ও ভেটকী মাছের তরকারী, মাছের ঝাল, ঝাল-চড়চড়ি, মাছ কষার প্রণালী, মাছের তেল ঝোল, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, মাছের স্থপ, কুঁচা চিংড়ির ব্যঞ্জন; কাটলেট, কোপ্তা. মাছের পুর। (১৫৫-১৭৭)

মাংস থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য: মাংস বিচার, মাংসের কিমা, মাংসের রোষ্ট, হরিণের মাংস প্রস্তুত প্রণালী, কচ্ছপ বা কেঠোর মাংস,

মাংসের চর্ব্বিকে ব্যবহার যোগ্য করবার প্রণালী, মাংসের ষ্টু, মাংসের স্যুপ, মুগ সংযোগে মাংসের স্যুপ, মাংসের ক্বাথ, মাংসের ঝোল, মাংসের কারী বা কালিয়া, কোর্ম্মা, কাবাব, কোপ্তা। (১৭৭-১৮৭)

ডিম থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য : ডিমের স্যুপ, ঝাল-কারী, পোচ, ডিম-রুটি, ডিম-পরটা, কাষ্টার্ড, ডিমের 'স্নো-বল', কোপ্তা, ডেভিল, পুডিং, ডিমের পাটি-সাপটা। (১৮৭-১৯২)

স্নেহ দ্রব্য বা চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য (ফ্যাট)—স্নেহ জাতীয় খাদ্যগুলির রাসায়নিক উপাদান এবং দেহরক্ষায় এদের উপযোগিতা ; মাখন ও উদ্ভিজ্য তেলের প্রকৃতি বিচার ; স্নেহজাতীয় বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী : নারিকেল কুরকুচির ডালনা, নারিকেলের বড়া, নারিকেলের কচুরি, নারিকেল-মুগের রসমুণ্ডি, নারিকেলের বরফি, নারিকেলের রসপুলি, নারিকেল দুধের হালুয়া, নারিকেল কারী, নারিকেলের মালপো, নারিকেলের নকল চিংড়িমাথা, মধুরেণ সমাপয়েৎ—নিরামিষ পুডিং। (১৯৩-২০০)

মেয়েদের পিকনিক

গোড়ার কথা

পিকনিক কথাটির সোজাসুজি বাঙলা মানে হচ্ছে চড়ি-ভাতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোড়াতে খেলা-ঘর পেতে ঘর-সংসার গোছাতে চায়—সেই ছেলেখেলার মধ্যে রান্নাবান্নার কাজটিও প্রধান হয়ে ওঠে। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খেলার ধারা ও মনের রুচি বদ্‌লাতে থাকে। তখন বাড়ী থেকে চাল ডাল তরিতরকারি তেল নূন—রান্নার যত কিছু উপকরণ সব চেয়েচিন্তে এনে চড়ি-ভাতি করবার আনন্দে মেতে ওঠে। দলে ছেলে থাকলে তারা বাইরের কাজে লেগে যায়—যেমন দোকান থেকে কিছু কিনে-কেটে বা বাগানের শাকপাতা খুঁজে পেতে আনা, জল তোলা, কাঠ কয়লা এনে দেওয়া—এই সব আর কি। কিন্তু চড়ি-ভাতির যেটি আসল ব্যাপার অর্থাৎ রান্নাবান্নার কাজটি মেয়েদের আয়ত্তেই থাকে, তার কারণ—এই কাজটি হচ্ছে মেয়েদের সহজাত সংস্কারের মতন, তাই এই অধিকারটি তারা হাতছাড়া করতে চায় না কিছুতেই।

বর্ত্তমানে রন্ধন শিক্ষাটিও বিদ্যাশিক্ষার অন্তর্গত হওয়ায় আর এই বিদ্যাটিকে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলে শিক্ষিত সমাজ স্বীকার করায় কলেজের মেয়েরাও রন্ধন বিদ্যার প্রচার ও সংস্কারে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই প্রচার কার্য্যটি ভালভাবে চালাবার জন্যই তাঁরা একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করে, তার নাম রেখেছেন--পিকনিক-পার্টি বা মেয়েদের পিকনিক।

যে সব মেয়ে ছেলে-বেলা থেকেই রন্ধন বিদ্যায় পটু, শৈশবে খেলা-ঘরে রান্নাবান্নার ব্যাপারেই খেলা-ধূলা করেছেন, তার পর পাঠশালা বা স্কুলে পড়াশুনার মধ্যেও চড়ি-ভাতি করে হাতে-কলমে রান্না শিখেছেন, শেষে স্কুলের শিক্ষার পর কলেজে ঢুকেও এই বিদ্যাটি চালু রেখেছেন, আর এই রন্ধন-বিদ্যাটিকেই মেয়েদের উঁচুদরের কলা-বিদ্যা বলে মেনে নিয়েছেন—এই ধরণের রান্না-ব্যাপারে পাকা-পোক্ত বারোটি শিক্ষিতা মেয়ে অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর বাঙ্গালী মেয়েদের হিতের দিকে চেয়েই এই সম্পূর্ণ অভিনব সংস্থা বা সমিতিটির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সমিতির নাম হয়েছে যেমন 'মেয়েদের পিকনিক', তেমনি এর উদ্দেশ্য আর কার্য্য-ধারাও নামটির মতনই নূতন ও চমৎকার। যে বারোটি মেয়ে এই সমিতি চালাচ্ছেন, বিদ্যার ব্যাপারে তাঁরা প্রত্যেকেই যেমন কলেজের এক একটি রত্ন; বিদ্যা-মন্দিরে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও সংপাঠীদের সহিত ভদ্র ব্যবহার এবং সুমধুর স্বভাবের জন্য এঁদের সুখ্যাতিও তেমনি সকলেরই মুখে। বাড়ীতেও এঁরা প্রত্যেকে গৃহশ্রীর মতই পিতা মাতার সংসারটিকে ঘিরে রাখেন। প্রতিবেশীদের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। যাদের মনে এই ধারণাটাই বরাবর দৃঢ় হইয়াছিল—বেশী পড়াশোনা করলেই মেয়ে যায় গোল্লায়, সাপের পাঁচ পা দেখে, ধিঙ্গির মত শুধুই হুল্লোড় করে বেড়ায়—এই মেয়েগুলি যেন পরামর্শ করেই প্রতিবেশীদের এই অন্ধ ধারণাগুলি একেবারে পালটে দিয়েছেন। ফলে,এখন প্রায়ই ভূতের মুখে রাম নাম শোনা যায়। পাড়ায় যাঁরা অতি মাত্রায় রক্ষণশীলা—পাণ থেকে চুণটুকু খসলেই বাড়ী থেকে পাড়া পর্য্যন্ত হাঁকে ডাকে কাঁপিয়ে তোলা যাঁদের চিরকালের স্বভাব—তাঁরাই এখন এঁদের কাজ-কর্ম্মের ধারা আর রান্না-বান্নার কায়দা-কানুন দেখে অবাক হয়ে থাকেন, আপনাদের মধ্যেই বলাবলি করেন—'সত্যি, ওসব এরা শিখলে কোথা থেকে? পাস-করা মেয়ে হেঁসেলে ঢুকে

এমন করে হাঁড়ি ধরতে পারে—নানা রকমের রান্না করতে জানে, এমন ত কখন দেখি নি। আমরা যা জানি না, কানেও কখনো শুনি নি—এরা যে সে সবও শিখে এসেছে। তাহলে এখন বুঝছি—সেই যে একটা কথা আছে না—'যদি না পড়াস্ পো, তবে সভায় নিয়ে থো।'—এইটিই হচ্ছে ঠিক। কত সব বই পত্তর পড়ে—বিদ্যের জাহাজ যাঁরা—তাঁরা কত কি শেখায়—তাই এমন শিক্ষা পেয়েছে। ভালো হোক বাপু, এদের ভালোতে দেশের ভালো।'

এঁদের সুখ্যাতির পিছনে যে-সব ঘটনা জমা হয়ে আছে তাদের মোটামুটি হিসাব এই যে, পিকনিক পার্টির মেয়েরা শুধু সমিতি খুলে ভাসা ভাসা বক্তৃতা দিয়েই খাতার কাগজে তাকে চেপে রাখেন নি; সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাতে কলমে কাজ সুরু করে দিয়েছেন; আর সে-কাজ ব্যাপকভাবে চলেছে ঘরে ও বাইরে। সমিতির বারোটি মেয়েকেই এই বলে শপথ করতে হয়েছে যে, তাঁরা প্রত্যেকে সমিতির নির্দ্দেশগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। সেই নির্দ্দেশগুলি শুধু যে পিকনিক বা চড়িভাতির সম্পর্কে তা নয়, তার সঙ্গে রন্ধন শিক্ষা, রন্ধন-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ, নূতন নূতন খাদ্যের কথা এবং এই রান্না বান্না ও খাবারের সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারটি কি ভাবে জড়িয়ে আছে, এমন কি—যুদ্ধ হাঙ্গামা বা অজন্মার জন্য দুর্ম্মূল্যের বাজারেও অল্প খরচে কি ভাবে পরিচিত সাধারণ শাক-সব্জী ও অন্যান্য সুলভ সামগ্রীকে মুখরোচক অথচ স্বাস্থ্যকর আহার্য্যে পরিণত করে একাধারে আহার ঔষধের উপাদান করা চলে—সে সমস্তই হাতে-কলমে ঘরের ও বাইরের মেয়েদিগকে শিখিয়ে দিয়ে গৃহস্থালীর ব্যাপারে কৃতবিদ্য করে তোলাই হচ্ছে সমিতির প্রত্যেক মেয়ে-সদস্যের কাজ।

কিন্তু এ-সব কাজ ত আর শুধু বই পড়িয়ে আর বক্তৃতা দিয়েই সিদ্ধ হতে পারে না, তাই হাতে-কলমে শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা করে তোলবার

জন্যে ঘরের ও বাইরের মেয়েদের নিয়ে 'পিকনিক' বা চড়িভাতির ব্যবস্থা করতে হয়। সপ্তাহের প্রতি রবিবারটি এজন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, আর প্রত্যেক পিকনিকেই শিখানো রান্নার পরীক্ষা যেমন চলে, তেমনি কোন না কোন নূতন রান্না শিখাবারো ব্যবস্থা থাকে। উপরন্তু সেই-সঙ্গে শিক্ষয়িত্রী সমিতির সুচিন্তিত নির্দ্দেশগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে রন্ধন ব্যাপারটি কত বড় একটা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান এবং এর সঙ্গে আমাদের জীবন রক্ষার কি সম্বন্ধ।

বহু বৈঠকের আলোচনার পর সমিতি রন্ধন-বিজ্ঞান, খাদ্য-বিচার এবং বর্ত্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিক রান্নাবান্না ও আহার সম্বন্ধে যে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—এই পিকনিকের সাহায্যেই মেয়ে-মহলে সেগুলি প্রচার করে মাতৃজাতিকে কর্ম্মঠ স্বাবলম্বী ও স্বাস্থ্যবতী করে তোলাই হচ্ছে তাঁদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একটা প্রবচন আছে—'আপনি আচারি কর্ম্ম অন্যে শিখাইবে।' সমিতির শিক্ষিতা মেয়েরা এই প্রবাদ-বাক্যটিকে নীতি-বাক্যের মতই গ্রহণ করেছেন। তার ফলে, তাঁরা প্রত্যেকে সমিতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করেই কর্ম্মক্ষেত্রে চলেছেন, পথভ্রষ্ট কেউই হন নি। আর নিষ্ঠার সঙ্গে সমিতির নিয়মগুলি মেনে চলে আসছেন বলে—এঁরা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী ; রন্ধন-বিজ্ঞান অনুসরণ করে পুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণে অভ্যস্ত থাকায় এঁদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যও চমৎকার, কোন রোগ-বালাই নেই, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়ে না, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া ত দূরের কথা, হঠাৎ কোন বিপদ আপদ এলে ভুলেও এঁরা ভয়ে পিছিয়ে পড়েন না—উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে নির্ভয়ে তার প্রতিকারে মুখ তুলে দাঁড়ান।

রান্নাবান্না ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাতেও এঁরা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী। এ সম্বন্ধে এঁদের মত এই যে, গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপদ-বিপদ অভাব-কষ্ট দুঃখ-দুর্ঘটনা অপরিহার্য্য—একটা না একটা লেগে থাকেই।

কিন্তু তাই ব'লে, কিছু একটা হ'লেই যে চীৎকার তুলে বাড়ী মাথায় করতে হবে—তার কি কথা আছে! এ-ক্ষেত্রে মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে প্রাথমিক অবস্থাটি কোন রকমে সামলে নেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমতীর কাজ। হয় ত, রাঁধতে বসে অসাবধানে কাপড়ে গেছে আগুন ধরে, কিম্বা তপ্ত তেলে মাছ দিতেই তেল ছিটকে এসে গায়ে পড়েছে, অথবা মাথাটা তুলতে গিয়ে মাথার উপরে খোলা জানালাটার কোণা লেগে কপালটি গেছে কেটে—ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে।—আবার অন্য দিকে হয় ত সংসারে কোন জিনিস বাড়ন্ত, দুটো আছে, তিনটে নেই—এ সব অবস্থায় হৈ চৈ না করে রান্না ঘরে বসেই মেয়েটি ধীরভাবে কি প্রতিকার করতে পারে, আর এই সব আকস্মিক আপদ বিপদ ও অভাবের ব্যাপারে হাতের কাছে তারই এক্তিয়ারে খুব সাদাসিধা কি কি জিনিস থাকলে হৈ চৈ করবার দরকারও হয় না—পিকনিক সমিতি সে সবেরও নির্দ্দেশ দিয়েছেন, পিকনিকের সঙ্গে এগুলিও শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হয় প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রী-মেয়েকে।

তাঁদের সেই সব শিক্ষা প্রণালী—অর্থাৎ পালা ক'রে তাঁরা বছরের পর বছর ধরে নিজের নিজের পাড়ার মেয়েদের নিয়ে যে-সব পিকনিক বা চড়িভাতি করে এসেছেন, আর সেই সঙ্গে রান্না-বান্না আর গৃহস্থালী সম্বন্ধে যে সব শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন, এই বইখানিতে সেইগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইখানি পড়ার বয়ের মতন মন দিয়ে পড়লে রান্না সম্বন্ধে সব কিছুই যেমন সহজে জানা যাবে, রান্নাঘরে হাতের কাছে রাখলে সংসারের অনেক প্রয়োজনীয় কাজেরও সন্ধান মিলবে। পিকনিকের সময় এখানি সঙ্গে নিলে পিকনিকটিও সব দিক দিয়েই পরিপাটি হবে।

পিকনিক সমিতির পরিচালিকারা কি-ভাবে বালিকাদিগকে হাতে-

কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, স্থানে স্থানে তার দৃষ্টান্তও গল্পের আকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-বারোজন কৃতবিদ্য মেয়ে পিকনিক সমিতি গড়েছেন, তাঁদের ভিতর থেকে এই গ্রন্থে কেবল বনমালা দেবীকেই বালিকাদের শিক্ষার সম্পর্কে উপস্থিত করা হলেও তাঁকেই সমিতিটির প্রতিনিধি বা পূর্ণ অঙ্গ বলে ধরে নিতে হবে। কারণ, সমিতির অপর এগারজন মেয়েও বনমালা দেবীর সহপাঠিনী, তাঁরাও সম্মানের সঙ্গে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম-এ পড়ছেন, আর বয়স, বলিষ্ঠ আকৃতি ও শিষ্ট মধুর প্রকৃতি যেমন প্রত্যেকের সমান, বারোটি মেয়ের মনোবৃত্তিও তেমনি দেশের বালিকাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য সমান গতিতে বইছে।

শিক্ষয়িত্রীরাও যাতে বনমালা দেবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং শিক্ষালয়ের বালিকারাও অসঙ্কোচে রন্ধন ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই নূতন পরিকল্পনায় রন্ধন-বিজ্ঞানের এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে।

রন্ধনের ইতিহাস

গোড়াতেই বলেছি, কলেজের শিক্ষিতা মেয়েরা তাঁদের ছাত্রীগুলিকে নিয়ে পিকনিক করবার সময় রান্নাবান্নার সম্বন্ধে অনেক শক্ত শক্ত কথা সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন, রান্না ব্যাপারটিও যে মেয়েদের একটা উঁচুদরের বিদ্যা, এমন কি বিজ্ঞান ব'লে এর মর্য্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এসব কথাও গল্পের মত করে বলতেন। পিকনিকে যে-সব রান্না-বান্না হ'ত, সেগুলি শোনাবার ও শেখাবার আগে রান্না সম্বন্ধে তাঁরা যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি আগে শুনিয়ে দিই—কেমন? তাঁরা হয় ত এক একটি কথা অনেক দিন ধরে বাড়িয়ে ছড়িয়ে বলেছেন, আমি এক একটি বিষয় ধরেই এমন ভাবে সেগুলো শোনাতে চাই—যাতে তোমাদের মনে ব্যাজার না ধরে, বরং শোনবার উৎসাহ বাড়ে।

প্রথমেই তোমাদের জেনে রাখা উচিত—রান্নার সৃষ্টি হল কি ভাবে আর মেয়েদের হাতেই কেন তার ভারটি পড়ল! কথাটা ভাবতে বসলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি যে, আদিকাল থেকে পুরুষ ও নারী সমান ভাবে নিজের কাজ বেছে নিয়েছে। পুরুষ যখন দেশ রক্ষা এবং সমাজ বন্ধনের জন্য নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি, বিধি-ব্যবস্থা, ধর্ম্ম দর্শন বিজ্ঞান, আগুন প্রভৃতির আবিষ্কার করতে লাগলেন, নারীও সেই সঙ্গে সংসার-ধর্ম্ম রক্ষা করবার ভার নিয়ে পাশপাশি কাজ সুরু করে দিলেন। পুরুষের কাজ হল—দেশ রক্ষা করা, সমাজের মঙ্গল যাতে হয়, প্রজা কষ্ট না পায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা; লোকের মনে জ্ঞান ও বিদ্যার আলো দেবার জন্য ভাল ভাল গ্রন্থ রচনা করা। আর

নারীর উপর পড়ল—গৃহ ও গৃহস্থালির ভার ; এই ভারটির সঙ্গে—রান্না-বান্না, ঘরকন্নার শৃঙ্খলা, পরিজনদের সেবা-পরিচর্য্যা, সন্তান পালন, এক কথায় সংসারটি চালাবার জন্য যা কিছু আবশ্যক সে সমস্তই জড়িয়ে আছে। আগুন আবিষ্কার করবার আগে রান্না-বান্নার পাটই ছিল না—থাকবেই বা কি ক'রে? তখনও সমাজ-জীবনে জ্ঞানের আলোক পড়ে নাই, সভ্যতার সৃষ্টি হয় নাই। লোকে তখন কাঁচা শাক-শব্জী আর ফলমূল খেয়েই জীবন ধারণ করতেন। আগুন যেমন আবিষ্কার করলেন পুরুষ, তাকে কাজে লাগাবার ভার নিলেন নারী। প্রথম প্রথম শাক-সব্জি কিম্বা পশুমাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে তাঁরা ভক্ষণ করতেন। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে আচার ব্যবহার যেমন বদলে যেতে লাগল, মানুষের রুচিও উন্নত হয়ে উঠল। পুরুষ আগুনকে উপলক্ষ করে যাগ-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, আর নারীও সেই আগুনকে গৃহে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তার সাহায্যে নানা রকম খাদ্য প্রস্তুত করতে মনোযোগী হলেন। এই থেকেই হল রন্ধনের সৃষ্টি।

এর পর ঋষিরা যখন ধর্ম্ম অর্থ দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ বই লিখতে লাগলেন, রন্ধন ব্যাপারটিকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মত তাঁরা যে কলা-বিজ্ঞান রচনা করলেন—তাতে ৬৪ রকমের বিদ্যার উল্লেখ দেখা গেল। এগুলির মধ্যে প্রধান বিদ্যা হচ্ছে—রন্ধন। চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয়—এই চার জাতীয় নানা রকম ব্যঞ্জন অন্ন পলান্ন মিষ্টান্ন পরমান্ন পানীয় প্রভৃতি পাক করবার প্রণালী ও উপদেশে কলা-বিজ্ঞানের এই অংশটি পূর্ণ। কিন্তু ঋষিরা পাক-প্রণালী লিখলেন বটে, কিন্তু তার শিক্ষা ও পরীক্ষার ভার দিলেন মেয়েদের উপরে। মেয়েরাও সেই থেকে ঋষিদের লেখা পাক-প্রণালী দেখে রন্ধন-বিদ্যা হাতে-কলমে শিখতে আরম্ভ করলেন। তার পর এঁরা যখন এ বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠলেন, ঋষিরা ব্যবস্থা

দিলেন—মেয়েদের মধ্যে এই সব শিক্ষিত মেয়েরাই রন্ধন ও অন্যান্য কলা-বিদ্যা—যেমন গৃহস্থালির কাজ, পান সাজার কাজ, আলপনা দেওয়া, সিলাই করা, গান বাজনা নাচ, সাজ-গোছ করা, মালা গাঁথা—এই সব বিদ্যা হাতে-কলমে শিখাবেন। ঋষিরা এগুলিকেও কলা-বিদ্যা ব'লে তাঁদের বিজ্ঞানে উল্লেখ করে গেছেন। এই ভাবে হ'ল রন্ধন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি আর তার গোড়ার ইতিহাসও এই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আদিকালের ইতিহাস থেকেও জানা যায় যে, পুরুষ রন্ধন-বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই বিদ্যাটিকে চালু করবার ভার পড়ে নারীর উপরে। দেশের ও সমাজের অন্যান্য ব্যাপারে—রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিল্প, কৃষি, প্রভৃতির উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারী অনেক স্থানেই পাশাপাশি কাজ করেছেন, কিন্তু রন্ধন ব্যাপারটি সুরু থেকেই নারীই অধিকার করে আছেন—এর সঙ্গে গৃহস্থালি এবং সন্তান পালনের দায়িত্বও নারীই বহন করছেন।

জার্ম্মানীর নারী বিদ্বেষী দার্শনিক নীটসে পর্য্যন্ত রন্ধন-বিদ্যার ব্যাপারে নারীর প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। ইনি কে জান? যাঁর মতবাদ মেনে নিয়ে হার হিটলার জার্ম্মান জাতটাকে নূতন করে গড়ে তুলেছেন—তিনিই নীটসে। তাঁর নাম থেকেই জার্ম্মানীর এই সর্ব্বনাশা দলের নাম হয়েছে নাত্‌সী বা নাজি। ইনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—আদি যুগে পুরুষ নারীর হাতে শুধু সন্তান পালনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে বড় বড় কাজে মাথা ঘামাতে লাগলেন। সব কাজেই তাঁরা কৃতী হলেন, কিন্তু পারলেন না শুধু রন্ধনে কৃতবিদ্য হতে। কাজেই দায়ে পড়ে এ ভারটি তখন মেয়েদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। পুরুষ যদি এ কাজে পটুতা লাভ করতে পারতেন, তাহলে এ ব্যাপারটি মেয়েরাই এক চেটে করে রাখতে পারত না।

পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন বা আমেরিকা সব চেয়ে ধনাঢ্য দেশ ; সেখানকার পুরুষ মেয়ে সকলেই যেমন সভ্য, তেমনি উন্নতিশীল। কিন্তু এই সুসভ্য ধনী দেশেও আজকাল রান্নার খ্যাতি এত বেড়ে গেছে যে, শুনলে অবাক হতে হয়। সেখানকার পণ্ডিতদের মত হচ্ছে—রান্নার মত বিদ্যা আর নাই। পুরুষও যদি এ বিদ্যায় পটু হতে পারে, তাহলে তাদের খ্যাতি ত বাড়বেই, দেশেরও কল্যাণ হবে। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই যাতে ভালভাবে রন্ধন বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে—তার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় রন্ধন বিদ্যাকে ছাত্রী-ছাত্রীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করায় সেখানকার বিলাসী ও অভিজাত সমাজেও রন্ধন বিদ্যার রীতিমত আদর হয়েছে।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রন্ধনবিদ্যাবিশারদ কোন অধ্যাপক এ সম্পর্কে জোর গলায় রান্নার ব্যাপারে ছাত্রীদেরই বেশী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে রান্না-বান্না শেখাবার যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। এতে বেশ ভাল করেই বুঝবার সুযোগ পাওয়া গেছে যে, ছেলেরা আর সব বিদ্যায় যত কৃতিত্বই দেখাক না কেন, রান্না-বান্নায় কিছুতেই মেয়েদের সমকক্ষ হতে পারে না। মেয়েরা যেমন ভেবে-চিন্তে হিসাব করে রাঁধে, সেই সঙ্গে হেঁসেলটি পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে জানে—ছেলেরা তার ধার দিয়েও যায় না। মেয়েরা এক হাতে রান্নার সঙ্গে নিজেই সব যোগাড়-যন্ত্র করে নেয়, ছেলেদের বেলায় সেটি হবার উপায় নেই ; একটি ছেলে যদি রাঁধতে বসে, পাঁচটি ছেলেকে তার সঙ্গে খাটতে হয়—হাতে হাতে প্রত্যেক জিনিসটি যোগাড় দিতে হয়। এই জন্যই না-মেনে পারা যায় না যে, রান্না বিদ্যাটি মেয়েদের একবারে ধাতুগত।

মার্কিন পণ্ডিতের কথাগুলি বেশ ভাববার মতন নয় কি? ও দেশেও রান্না বিদ্যাটির কত খ্যাতি, রান্না ব্যাপারকে ওঁরা কি রকম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন, উপরের কথাগুলি পড়ে সেটা বুঝতে পারলে ত? শুধু মার্কিন দেশ কেন, ইয়োরোপের সব দেশেই—প্রায় প্রত্যেক অভিজাত ঘরেই রন্ধন-বিদ্যার খুবই প্রতিষ্ঠা, রাঁধতে পারা বিশেষ গৌরবের কথা।

তোমরা হয় ত শোন নি যে, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের প্রপিতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়া খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। ডিমের 'অমলেট' নামে যে খাদ্যটি খুবই মুখরোচক ও পুষ্টিকর, মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজেই ডিমের এই সেরা খাবারটির আবিষ্কার করেছিলেন। এটি তাঁর খুবই প্রিয় খাদ্য ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এইটুকুই যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হয়েও তিনি নিজের হাতে এই অমলেট তৈরী করতেন, আর খাওয়ার চেয়ে এতেই ছিল তাঁর বেশী আমোদ।

ওদেশে রাজারাজড়া বা বিখ্যাত পুরুষদের মধ্যেও রাঁধবার সখ খুব বেশীভাবেই দেখা যায়। তাঁরা রন্ধন বিদ্যাটা সখ করেই শিখেছিলেন, বাড়ীতে বিশেষ কোন ভোজ হলে পাচকের হাতেই রান্নার ভার ছেড়ে দিতেন না, পাকশালায় বসে নিজেরাই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন, দু-চার রকম খাবার নিজেদের হাতেও তৈরী করতেন। এই রকম রান্নার সখের জন্য যাঁরা বিখ্যাত হন, তাঁদের মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের বড় ভাই—যিনি এক সময় সম্রাট ছিলেন ও ইচ্ছা করে সিংহাসন ত্যাগ করেন—এখনকার ডিউক অফ উইণ্ডসরের নাম প্রথমেই করা চলে। রন্ধন বিদ্যায় ইনি এমনি নিপুণ আর এই কাজটি তিনি এত ভালবাসেন যে, বাড়ীতে বিশেষ কোন খাই-দাইএর আয়োজন হলে পাকশালার ভারটি নেন নিজে; তারপর খাবার টেবিলে তাঁর হাতের তৈরী খাবার নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে তিনি পান প্রচুর আনন্দ। ডিউক নিজেই বলেন—

'আমার হাতের রান্না বন্ধুবান্ধবদের খাইয়ে আমি যে আনন্দ পাই, তেমন আনন্দ আর কিছুতে হয় না।'

ডিউকের মত বড় ঘরের আরও অনেক বড় লোক সখ্ করে এইভাবে রান্নায় দক্ষতা দেখিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁরা এজন্য আনন্দ পান, মনে মনে গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু তাই বলে ঘর গৃহস্থালির রান্না-বান্নার কাজ মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে গিয়েছে, একথা কেউ বলতে পারবে না; বরং পুরুষদের হাতে সরকারী রান্নাবান্নার যে ভার এ পর্য্যন্ত ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ-সরকার মেয়েদের দ্বারাই এ-কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হবে জেনে পুরুষদের স্থলে মেয়েদেরই নিযুক্ত করেছেন। আগের দিনে ইংলণ্ডে পুরুষরাই জল ও স্থলের সেনাবাহিনীর জন্য রান্না ও তাদের পরিবেশন করতেন, এখন এসব কাজ মেয়েরাই করছেন। এমন কি এসব রাঁধুনী ও পরিবেশনকারিণীদিগকে শিক্ষাদেবার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে।

রান্নার এই ইতিহাস থেকে তোমরা বুঝতে পারবে, পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলিতেও রান্না বিদ্যার কত খ্যাতি, আর রাঁধুনীদের প্রতি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কত শ্রদ্ধাশীল। আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনা করলেও এই রকম দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজ্য হারিয়ে বনে গমন করতে বাধ্য হন, তখন বনভূমির আশ্রমেও বহু লোক তাঁর সঙ্গে একত্র বাস করতেন। সেই সমস্ত লোকের জন্য দ্রৌপদী একাই যাবতীয় রান্না করতেন। শুধু রান্না নয়, খাবার সময় স্বহস্তে পরিবেশন করতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। আশ্রমবাসী সকলের ভোজন শেষ হলে তবে দ্রৌপদী আহারে বসতেন।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে তোমরা মস্ত বীর বলেই জান। কিন্তু রান্নার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব বীরত্বের চেয়ে কম ছিল না। অজ্ঞাতবাসের সময়

তিনি পরিচয় গোপন রেখে সুপকার বা রাঁধুনী বলেই আত্মপরিচয় দেন। মৎসরাজ বিরাট যখন তাঁর মুখে শুনলেন—তিনি ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনী, তখন আদর করে নিজের রন্ধনশালার ভার তাঁরই হাতে সঁপে দেন। ভীমসেন রান্নার সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও লিখেছিলেন। এদিক দিয়ে পাক-প্রণালীর আদি লেখকের সম্মান তাঁকেই দেওয়া চলে!

মহারাজ নলও রন্ধন বিদ্যায় রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন। বিনা জলে পাক করবার প্রণালী তিনিই আবিষ্কার করেন। এই বিদ্যাটির জন্য তিনি তৎকালে খুব খ্যাতি লাভ করেন। এমন কি, রাজ্যচ্যুতির পর তিনি যখন অজ্ঞাত ভাবে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে থাকেন, এই বিদ্যাটির জন্যই তাঁর পত্নী—বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর কাছে ধরা পড়ে যান, আর সেই থেকেই তাঁর দুর্ভোগের অবসান হয়।

সেকালে আমাদের সমাজেও রান্নাবান্নায় মেয়েদের খ্যাতি বড় কম ছিল না। রন্ধনশালার উপর মেয়েরাই বরাবর কর্ত্তৃত্ব করেছেন। বড় বড় জমিদার ও বনেদী ধনীদের ঘরের গৃহিণী বধূ ও কন্যারা রান্নাবান্নাকে তাঁদের কর্ত্তব্য বলেই মনে করতেন; এটি যেন ঠিক তাঁদের সহজাত সংস্কারের মতই ছিল। তখন পূজা-পার্ব্বণ বা কোন উৎসব উপলক্ষে প্রতিবেশীর বাড়ীতে ভোজের আয়োজন হলে, রান্নার ব্যাপারে যে সব মেয়ের খুব খ্যাতি—সেই 'যজ্ঞি'র (যজ্ঞের) রন্ধনশালায় তাঁদেরই ডাক পড়ত। কোন উৎসবে বহুভোজনের আয়োজনকে তখন 'যজ্ঞ' বলা হত। সেই যজ্ঞের রন্ধনশালায় রাঁধুনীরূপে যোগ দেবার আহ্বান পাওয়াটা তখনকার বড় ঘরের মেয়েরাও খুব গৌরব বলেই মনে করতেন।

কিন্তু দেশের সে ভাব, মেয়েদের সে উৎসাহ ক্রমে ক্রমে বদলাতে থাকে। এর পর এমন একটা অবস্থা এসে পড়ে যে—স্বহস্তে রান্না করায় গরীবানার ভাব স্পষ্ট হতে থাকে আর মাইনে করা পাচক রেখে তারই

হাতে পাকশালার সঙ্গে আমাদের প্রাণ রক্ষার অবলম্বনটি ছেড়ে দেওয়া বড়মানুষীর একটা 'ফ্যাসান' হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি, চাকরী বা ছোট খাটো ব্যবসায়ের আয়ে যাঁদের সংসার কোন রকমে চলে, তাঁরাও মাইনে করা পাচক রেখে প্রতিবেশীদের সঙ্গে টক্কর দিতে লাগলেন। এর কুফলও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ; অনাচার ও রোগে আমাদের সংসার ছন্নছাড়া হতে লাগল।

সুখের কথা, এখন আবার হাওয়া বদলাতে সুরু করেছে। বিদেশের রাজ-পরিবারে এবং ধনীর সংসারে গৃহিণীদের রান্নায় উৎসাহের কথা শুনে ক্রমে আমাদের দেশের অনেকেরই চোখ খুলে গেছে। ওদেশের সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রন্ধন বিদ্যা শিক্ষাটিকে বাধ্যতামূলক করায়, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও মেয়েদের মধ্যে এ বিদ্যাটির প্রসারে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সুতরাং রন্ধনের এই ইতিহাস থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে, পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এ বিদ্যাটির আদর আজ কত! রান্না যে ঘর-কন্নার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ভাল রান্না শিখে—স্বহস্তে নানা রকম নূতন নূতন খাদ্য রেঁধে সংসারের পরিজনদের খাওয়ান সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দ, রন্ধনে পারদর্শিতা এ-যুগেও মেয়েদের যে পরম গৌরবের কথা—রন্ধনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলি তোমরা মনের ভিতরে গেঁথে রাখবে। রন্ধনে রীতিমত দক্ষতা লাভ ক'রে তোমরাও যেন জোর গলায় বলতে পার—রান্না বিদ্যার মত বিদ্যা আর নেই, আমরাই এ বিদ্যার সাধিকা।

রন্ধনের উপাদান

রান্নার কাজে হাত লাগাবার আগে, রান্নার ব্যাপারে যে-সব বস্তুর একান্ত প্রয়োজন, সেগুলির কথা খুব ভাল করে জানা চাই; নতুবা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত লক্ষ্যহারা হবে—আসল উদ্দেশ্যটির খুঁত থেকে যাবে। উপাদান শব্দটি শুনে হয় ত ভাবছ—রান্নার সঙ্গে এর আবার কি সম্বন্ধ? সেইটিই স্পষ্ট করে গোড়াতেই বুঝিয়ে দিতে চাই। উপাদান কথাটার সোজা মানে হচ্ছে—নেওয়া। এর আর একটি মানে—মিলিয়ে দেওয়া। রান্নার সম্পর্কে দুটো মানেই খাটে। রান্না করতে হলে অমনি অমনি ত আর রান্না হয়ে উঠবে না—নানা রকমের বস্তু যেমন নিতে হবে, হিসাব করে তেমনি মিলিয়ে দেবারও প্রয়োজন। প্রত্যেক জিনিসটি গড়ে তোলবার গোড়াতেই রয়েছে এই উপাদান। ধর, রান্নার জন্য একটি হাঁড়ি কিনে এনেছ। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন—হাঁড়িটির উপাদান কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে—মাটি, জল, আগুন। কেন না, হাঁড়িটি গড়তে হলে সুরুতেই চাই—মাটি আর জল; তৈরী হবার পর তাকে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয়। কিন্তু প্রধান উপাদান হচ্ছে—মাটি। হাঁড়িটি যদি পিতলের হয়—তাহলে তখন তার উপাদান আর মাটি নয়, পিতলের হাঁড়ি যেসব উপাদানে তৈরী হয়, সেইগুলিই বলতে হবে। এমনি—সব জিনিসেরই উপাদান আছে।

এখন দেখতে হবে—রন্ধনের জন্য কি কি উপাদান আমাদের প্রয়োজন। অর্থাৎ, যেগুলির অভাবে রান্নার কাজ আরম্ভ হ'তে পারে না। সেই উপাদানগুলি হচ্ছে—

(১) রন্ধন পাত্র ও অন্যান্য তৈজস

(২) রন্ধন যন্ত্র বা উনান

(৩) উত্তাপ বা জ্বালানি

(৪) জল

এই জিনিসগুলিকে রান্নার উপাদান বলা চলে। কেন না, রান্নার ব্যাপারে প্রথমেই এগুলির প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ রান্না করবার সময় এগুলি ব্যবহার করতে হয়। কাজেই বুঝতে পারছ বোধহয়, রান্নার প্রণালীগুলি জানবার আগে এই উপাদানগুলির সম্বন্ধে সমস্তই ভাল করে জেনে একবারে নখ-দর্পণে ছকে নিতে হবে। মনে রাখা চাই—রন্ধন বিদ্যার এইটিই হচ্ছে প্রথম পাঠ।

এর পরে বলব রান্নার উপযোগী খাদ্যগুলির সম্বন্ধে নানা কথা। আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী ও রসনার তৃপ্তিজনক ক'রে কি ভাবে সেগুলি রাঁধতে হ'বে, কি প্রণালীতে রাঁধলে রান্না ভাল উতরাবে, ঐ সব উপাদান থেকে বর্ত্তমানের রুচি অনুসারে কত রকম খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে, আর, তাদের প্রস্তুত করবার প্রণালী কিরূপ—এ-সব পর পর এমন করে বলব যাতে বুঝতে তোমাদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়।

এখন রন্ধনের যে উপাদানগুলির নাম করেছি, একটি একটি করে তাদের গুণ আর প্রয়োজনের কথা বলছি।

রন্ধনপাত্র ও রন্ধনসংক্রান্ত তৈজস—মাটি অথবা লোহার পাত্রই রান্নার পক্ষে প্রশস্ত। আগে আমাদের দেশে ভাত ডাল তরকারি প্রভৃতি মাটির পাত্রেই রান্না হত। ভাতের জন্য হাঁড়ি, ডাল তরকারির জন্য মাটির তিজেল নামক পাত্রের খুব চলন ছিল। এখনও যে-সব সংসারে কাঠের জ্বালে বা কয়লার পরিমিত আঁচে রান্নার ব্যবস্থা আছে, সেখানে ভাত ডালের জন্য মাটির হাঁড়ি ও তিজেল, আর তরকারির

জন্য লোহার কড়ায় রান্নার কাজ চলে। মাটির হাঁড়িতে পরিমিত আঁচে যে রান্না হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তার উপযোগিতাও খুব বেশী। মাটির পাত্রের পরেই লোহার পাত্রই প্রশস্ত। লোহার পাত্রের পরে পিতলের পাত্রের নাম করা যায়। কিন্তু যে সব তরকারিতে অম্লের সংশ্রব থাকে, পিতলের পাত্রে সেই তরকারিগুলি কিছুতেই রন্ধন করা উচিত নয়। সেকালে পিতলের পাত্রের তলায় এঁটেল মাটির প্রলেপ দিয়ে মেয়েরা উনানে চড়াতেন। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা এ ব্যবস্থার সমর্থন করতেন। এভাবে পিতলের পাত্রে যে খাদ্য রন্ধন করা হত, স্বাস্থ্যের পক্ষে তার গুণের কথাই তাঁরা স্বীকার করতেন। একালে এলুমিনিয়মের পাত্র সুলভ হওয়ায় অধিকাংশ গৃহেই রান্নার ব্যাপারে তার চলন হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিদ্‌রা এলুমিনিয়মের পাত্রে রন্ধনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা মাটি বা লোহার পাত্রকেই রন্ধনের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়ে উপযোগী বলে থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে পলান্ন, মাংস, পরমান্ন প্রভৃতি রান্নার সম্পর্কে তামার তৈরী কলাই করা পাত্রের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তামার পাত্রের কলাই যদি কোন স্থানে উঠে যায়, তাহলে সে পাত্রে রন্ধনকরা খাদ্য বিষাক্ত হয়ে উঠে। একই বাড়ীতে ভোজ খেয়ে এক সঙ্গে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছেন এমন ঘটনা অনেক শোনা যায়। পরে তদন্ত করে জানা গেছে, তামার পাত্রের কলাই উঠে যাওয়ায় খাদ্য বিষাক্ত হয়, আর তার ফলেই ওরকম দুর্ঘটনা ঘটে। কাজেই **কলাই করা পাত্র ব্যবহার করবার আগে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে—ভিতরের কলাই তার ঠিক আছে কি না। যদি দেখ, কোন জায়গায় সামান্যমাত্রও কলাই চটে গেছে, তখনি সে পাত্র বর্জ্জন করবে।**

রন্ধন-সম্পর্কে **বিভিন্ন পাত্রগুলির পরিচয়** এবং সেগুলির ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দ্দেশ নিম্নে দেওয়া হল।

(ক) **এলুমিনিয়মের পাত্র**—রান্নার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও এই পাত্র চালু হবার পর থেকে রোগের প্রভাবও বেড়েছে। যদি একান্তই এলুমিনিয়মের পাত্রে রন্ধন করতে হয়, রন্ধনের পরই ঐ পাত্র থেকে অন্ন ব্যঞ্জন তুলে মাটীর বা কলাই করা এনামেলের পাত্রে রাখবে। সাদা ভাত বরং এলুমিনিয়মের পাত্রে রাখলে তত ক্ষতিকর হয় না, কিন্তু ঘি-ভাত, খিচুড়ি, পরমান্ন, ডাল, মাছ-মাংস, দুধ—অর্থাৎ যে সকল খাদ্যে তেল ঘি চর্ব্বির সম্বন্ধ আছে, এলুমিনিয়মের পাত্রে বেশীক্ষণ সে সব খাদ্য রাখা উচিত নয়। এতে রন্ধন করা খাদ্য বা দুগ্ধ বিকৃত এবং বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে।

(খ) **মাটির পাত্র**—এই পাত্রই সব চেয়ে ভাল। যত্ন এবং অভ্যাস করলে কয়লার আঁচেও মাটির হাঁড়িতে ভাত ডাল তরকারি মাছ মাংস পরমান্ন প্রভৃতি রাঁধতে পারা যায়, আর সে রান্নার স্বাদও ভাল হয়। মাটির হাঁড়িতে পরিমাণ মত জল দিয়ে তবে উনানে বসাবে। মাটির হাঁড়িতে তরকারি রাঁধবার আগে, তেল বা ঘি চড়িয়ে আলু বা লুচি ভেজে নিলে হাঁড়ি তেল খেয়ে বেশ মজবুত হয়। পরে এই তৈলপক্ক হাঁড়ি তরকারী রাঁধবার পক্ষে মজবুত হয়ে থাকে।

(গ) ভাল **লোহার** পেটা-পাত্র (ঢালাই নয়) সব কাজেই উপযোগী। অভাবে এলুমিনিয়মের পাত্র ব্যবহার করা ছাড়া উপায় কি? মিষ্টি খাবার তৈরী করবার সময় তাড়ু দিয়ে অনবরত নাড়াচাড়া করতে হয় বলে মাটির হাঁড়ি এসব ব্যাপারে ব্যবহার করা চলেনা, কেননা তলা ভেঙ্গে যেতে পারে। মাটির হাঁড়িতে সিদ্ধ সাদ্ধাই ভাল হয়। লোহার কড়ায় তরিতরকারি মাছ মাংস প্রভৃতি ভেজে বা কসে নিয়ে মাটির হাঁড়িতে সিদ্ধ করতে দেওয়া উচিত। লোহার তৈরী এক রকম চ্যাটালো অল্প কানা উঁচু কড়া পাওয়া যায়। চপ, কাটলেট, জিলিপি, প্রভৃতি ভাজার পক্ষে এই কড়া খুব প্রশস্ত।

(ঘ) **বারকোস**—আটা ময়দা ছানা প্রভৃতি মাখতে বা ঠাসতে হলে কাঠের বারকোস ব্যবহার করবে। লোহার বারকোসও মন্দ নয়, কিন্তু ব্যবহারের পর জল মুছে ও গায়ে তেল মাখিয়ে না রাখলে মরচে ধরে। পিতলের তৈরী বারকোসকে '**পরাত**' বলে।

(ঙ) **চাটু**—রুটির পক্ষে লোহার চাটুই ভাল। চাটু কখন পাতলা কিনবে না, লোহার তৈরী পুরু সুরু চাটুতে রুটি ভাল হয়।

(চ) **চাকি বেলুন**—কাঠের বা পাথরের ভাল। সিমেণ্ট জমিয়ে আজকাল একপ্রকার চাকি বেলুনের চলন হয়েছে।

(ছ) **সস্প্যান**—সৌখীন খাবার তৈরীর পক্ষে সস্প্যান সব চেয়ে ভাল। পিতলের পাত্র মিষ্টি খাবার তৈরীর পক্ষে বেশ প্রশস্ত।

(জ) **কড়া**—ভাজা, ঝোল, অম্বল প্রভৃতি নানারকম রান্নাতেই কড়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। লোহা, পিতল, এলুমিনিয়ম এই তিন প্রকার ধাতু-নির্ম্মিত কড়া সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। যে কড়ার দুপাশে দুটি আংটা থাকে না, তাকে '**ভই**' বলে। পেটা লোহার কড়াই ভাল। অনেক দিন টেঁকে,আর ভাল করে নিত্য মাজলে রূপার মত ঝকঝক করে। হাঁড়ি ও সসপেনের ব্যাপারে পাত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে যা বলেছি, কড়ার সম্বন্ধেও সেগুলো ধরে নেবে। পেটা লোহার কড়াকেই রান্নার ব্যাপারে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করবে।

(ঝ) **ঝাঁঝরি**—লুচি কচুরি নিমকি প্রভৃতি ভাজা-ভুজির খাবার তৈরী করতে ঝাঁঝরির দরকার হয়। তার কারণ, ঝাঁঝরি করে ভাজা জিনিস তুলে নেবার সময় তার তলার ছিঁদগুলি দিয়ে ঘি বা তেল পাত্রে ঝরিয়ে ফেলা চলে।

(ঞ) **হাতা ও খুন্তি**—রান্নার ব্যাপারে এদুটি জিনিসও খুব

দরকারী। খুন্তির সাহায্যে ভাজা-ভুজি ও ব্যঞ্জন নাড়া-চাড়া করতে হয়। হাতার সাহায্যে ব্যঞ্জনাদি পাত্র থেকে তুলে ঢালাঢুলি বা পরিবেশন করা চলে। ডাল, পরমান্ন প্রভৃতি পাক করবার সময় নাড়াচাড়ার জন্য হাতা ব্যবহার করতে হয়।

(ট) **বেড়ী, সাঁড়াশী**—উনান থেকে হাঁড়ি নামাবার সময় বেড়ীর দরকার হয়। সাঁড়াশী, সব কাজেই লাগে। ছোট, মাঝারি, বড় তিন রকম সাঁড়াশী রান্নার সময় কাছে রাখা চাই। বেশী ভারি ও বড়সড় পাত্র নামাবার সময় বড় সাঁড়াশী, মাঝারি পাত্র নামাতে মাঝারী, আর ছোট খাটো পাত্র নামাতে ছোট আকারের সাঁড়াশী ব্যবহার করা উচিত। কোন কিছু পাত্র উনান থেকে নামাবার সময় কদাচ আঁচলের খুঁট দিয়ে চেপে নামাবার চেষ্টা করবে না। এই অভ্যাসটি অত্যন্ত খারাপ ও বিপজ্জনক। পাত্র থেকে জিনিসপত্র তোলার সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে—হাত দিয়ে কিছু তুলবে না, হাতা বা চামচ বাবহার করবে।

(ঠ) **ডালের কাঁটা**—ডাল সিদ্ধ হয়ে এলে এই জিনিসটি সে সময় পাত্রের মধ্যে ঘন ঘন ঘুরিয়ে বা নেড়ে-চেড়ে দিলে পাত্রের সমস্ত ডাল বেশ মিশে থকথকে হয়।

(ড) **ধুচুনি**—চালের কুঁড়ো ধুয়ে বার করে চালগুলিকে পরিস্কার করতে ধুচুনির দরকার হয়।

(ঢ) **তাড়ু**—সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরী করতে এর প্রয়োজন হয়। ছানা, ক্ষীর চিনির সঙ্গে পাক করবার সময় তাড়ু অপরিহার্য্য। এ জিনিসটি কাঠের তৈরী, মুখের দিকটা চ্যাটালো আর পুরু। খুন্তির মত পাতলা নয়।

(ণ) **টোষ্টার**—তার দিয়ে তৈরী ; পাঁউরুটি টোষ্ট করতে কিম্বা পাঁপড় পুড়িয়ে নেবার পক্ষে এই জিনিসটির প্রয়োজন হয়।

(ত) **কেট্‌লি**—চায়ের জল গরম করবার পক্ষে কেট্‌লিই প্রশস্ত।

(থ) **চিমটা**—রুটি চাটুতে সেঁকার পর আগুনের আঁচে পুড়িয়ে নেবার সময় চিমটার প্রয়োজন হয়। আগুনে ফেলে কিছু পোড়াতে দিলে চিমটার সাহায্যেই সহজে তোলা যায়।

(দ) **চামচ**—সাঁড়াশী যেমন তিন রকম আকারের রাখা উচিত, চামচেও তেমনি তিন রকম রান্নার সময় হাতের কাছে রাখা আবশ্যক। প্রথম প্রথম—আন্দাজ ঠিক মত না হওয়া পর্য্যন্ত—নূন মশলা চিনি প্রভৃতি চামচে করে মেপে দেওয়াই ভাল। চায়ের চামচ বলতে যা বোঝায়—সেই চামচই মাপের সময় নেওয়া চাই। এইটিই ছোট চামচ। এর চেয়ে কিছু বড়—অর্থাৎ মাঝারি চামচ—ডিম ও মশলা প্রভৃতি মেশাতে প্রয়োজন হয়। বড় চামচ বেশী রকমের জিনিস মেশাতে বা পরিবেশন করতে কাজে লাগে।

(ধ) **পলা**—তেল ঘি আধার থেকে নিয়ে পাক-পাত্রে দেবার সময় এই জিনিসটি কাজে লাগে। এরও তিন রকম আকারের তিনটি—ছোট বড় মাঝারি—রান্না ঘরে রাখা উচিত।

(ন) **বঁটি**—শাক-সব্জি, তরকারী, মাছ প্রভৃতি কেটে রন্ধনের উপযোগী করতে কাজে লাগে। বঁটি জিনিসটি রান্নাঘরের একটি প্রধান তৈজস।

(প) **কুরুণী**—নারিকেল কোরার পক্ষে এটি অপরিহার্য্য। এর সাহায্যে মালা থেকে ঝুনা নারিকেল সহজে পরিষ্কার করে কুরে নেওয়া যায়। আর এক রকমের চৌকো কুরুণী পাওয়া যায়—তার সাহায্যে লাউ ও কুমড়া কুরে নেওয়া চলে। দু রকম কুরুণীই রান্নাঘরে রাখা উচিত।

(ফ) **ছুরি, বাটালি**—হোটেলে খাবার-টেবিলে যে রকম লম্বা ছুরি দেওয়া হয়, সেই রকম ছুরি একখানি রান্নাঘরে থাকা চাই। সরু

বাটালি একখানি থাকলে ঝুনা নারিকেল মালা থেকে সহজে ইচ্ছা মত সরু মোটা আকারে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়া চলে। অবশ্য, ছুরি বা কাটারি দিয়েও এ কাজ করা যায়, কিন্তু বাটালিতেই সুবিধা বেশী।

(ব) **শিল ও নোড়া**—মসলা বাটার জন্য দরকার হয়।

(ভ) হামানদিস্তা—হাতের কাছে এ জিনিসটিও রাখা চাই। ছোট খাটো কাজে সর্ব্বদা দরকারে আসে। গরম মশসা, জিরে মরিচ, এমনি আরো অনেক কিছু তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে নেবার পক্ষে এটি খুব দরকারী।

(ম) **যাঁতা**—যদিও সহরে আজকাল এর পাঠ উঠে গেছে, কিন্তু রান্নাঘরের এটিও একটা দরকারী তৈজস। ডাল কড়াই ভেঙ্গে বা গুঁড়িয়ে নেওয়ার কাজ এতে চলে। ভারি যাঁতায় গম পর্য্যন্ত পেশা যায়।

(য) **কুলা ও চালুনি**—ডাল কড়াই চাল ও বাটনা-মশলা ঝেড়ে নিতে কুলার দরকার হয়। বেতের বড় ছিঁদওয়ালা চালুনি দিয়ে খই বাছা চলে। তারের মিহি চালুনি আটা চালার কাজে প্রশস্ত। রান্নাঘরে এই দুটি জিনিসও রাখা উচিত।

(২) রন্ধন-যন্ত্র বা উনান—কোন কারখানা চালাতে হ'লে প্রথমেই যেমন মেসিন বা চালাবার যন্ত্রটির যোগাড় করতে হয় আগে, রেল পথে সারিবদ্ধ গাড়ীগুলিকে যেমন শক্তিশালী ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যায়, তেমনি রান্নার ব্যাপারে আগেই আবশ্যক হয় রন্ধন-যন্ত্র বা উনানটির। আদিকালে আগুন সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে এই উনানের আবিষ্কার হয়েছিল তা নয়, অগ্নি উৎপাদনের প্রণালী উদ্ভাবিত হ'লে প্রথমেই তাকে আহারের কাজে পরে যাগ-যজ্ঞের কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ গাছের ডাল-পালা পাতার

সাহায্যে আগুন জ্বেলে, সেই আগুনে গাছের মূল, মাছ, মাংস পুড়িয়ে খাবার রীতি প্রথমে চালু হয়। কোন পাক-যন্ত্র বা উনানের পাট সে সময় ছিল না। ক্রমে ক্রমে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বাড়তে থাকে। ফলে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে, অথবা পাথরের মাঝখানে আগুন রেখে পোড়ার কাজটি আরও একটু ভাল রকমে সমাধা করবার ব্যবস্থা হয়। তার পরের পরিকল্পনা আরও উন্নত হবার ফলেই পাক-যন্ত্র বা উনানের উৎপত্তি। কালক্রমে এই উনানের উন্নতি আরো কত ভাবেই আমরা দেখছি। কত উন্নত প্রণালীর লোহার উনান, ষ্টোভ, ইকমিক-কুকার প্রভৃতি আবিস্কৃত হ'য়ে রন্ধন-কার্য্যে আমাদের সুযোগ সুবিধার উপায় করে দিয়েছে।

কারো কারো মতে, প্রথমে যজ্ঞের কার্য্যেই অগ্নিকে ব্যবহার করা হয় এবং যজ্ঞে অগ্নি রক্ষার আধার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা থেকেই পাক-যন্ত্র বা উনানের উৎপত্তি হয়। আবার অনেকের মতে, মেয়েরাই প্রথমে রন্ধন কার্য্যের সুবিধার জন্য পাক-যন্ত্রে অগ্নিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কৌশলটি আবিষ্কার করেন পরে ঋষিরা তারই অনুকরণে যজ্ঞকুণ্ড রচনা করেন।

পাথরের কয়লা প্রচলনের আগে কাঠের জ্বালে যখন রান্না-বান্নার কাজ নির্ব্বাহ হতে, তখন মাটি খুঁড়ে উনান তৈরী করার ব্যবস্থা ছিল। সামনের দিকে ভাঙ্গা কল্‌সি বা হাঁড়ির গলার দিকটা মাটির সঙ্গে লেপে এমন ভাবে 'ঝিঁক' তৈরী করা হ'ত যে, তার নীচের ফাঁকটুকু দিয়ে কাঠ দেওয়া যেত, আর সেই কাঠ পুড়ে উনানের ভিতরে তলার গর্ত্তে গিয়ে পড়ত। এই জাতীয় উনানে এক সঙ্গে দুই রকম খাদ্য রান্নার জন্য গায়ে গায়ে মিশিয়ে এমন কৌশলে জোড়া উনান করা হত যে, তাদের সামনের দিকে কাঠ দেবার গর্ত্ত থাকত একটি, কিন্তু সেই গর্ত্তে কাঠ দিয়ে দুদিকে ঠেলে দিলে দুটো উনানেই সমান আঁচ পেত। এর নাম হচ্ছে—দোপাকা উনান। ভোজের সময় এক সঙ্গে বেশী রান্নার প্রয়োজন হলে, মাটিতে লম্বালম্বি

বৃহৎ গর্ত্ত খুঁড়ে তার ছ'পাশে বড় বড় তোলো হাঁড়ি রাখবার মত ইট বা মাটির শক্ত ঝিঁক করে যে বিরাট উনান তৈরী হত, তার নাম হচ্ছে—'বান'। এক সঙ্গে আট দশটি বড় বড় হাঁড়ি এই বানে বসিয়ে ভাত ডাল তরকারি প্রভৃতি শীঘ্র ও সহজে পাক করা চলত। এর ছুই মুখে বড় বড় ছুটি গর্ত্ত থাকায় কাঠ দেবার অসুবিধা হত না। এ সব ব্যবস্থা অবশ্য পাড়াগাঁয়েই চলত, আর এখন পর্য্যন্ত অনেক স্থানে চলে। সহরে মাটির অভাব থাকায় মাটির উনান ইট দিয়েই সেকালে তৈরী করা হত। প্রথমে রান্নাঘরে একটা জায়গা ঠিক করে ইট আর মাটির সাহায্যে ঐ ভাবে কাঠের উনান তৈরী করা হত।

কিন্তু পাথুরে কয়লা কাঠের স্থানে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের উনানের পাট প্রায়ই উঠে গিয়েছে, এখন ঘরে ঘরে কয়লার উনানই পাক-যন্ত্ররূপে চালু হয়েছে।

উনান পাতা শিক্ষা—পিকনিক পার্টির শিক্ষয়িত্রীরা উনান তৈরীর নির্দ্দেশ শুধু মুখে মুখে দিয়েই নিশ্চিন্ত নহেন। প্রত্যেক পিকনিকের সময় দলের মেয়েগুলিকে উনান তৈরী শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের দিয়ে কেমন করে উনান তৈরী করানো হয় তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে—পিকনিকের আনন্দটি তারা কেমন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে।

সেদিন বনলতা দেবী তাঁর দলের চোদ্দটি মেয়েকে নিয়ে পিকনিক করতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে। আগেই বলেছি, বনলতা দেবী এম-এ পড়েন। তাঁর বাবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা অধ্যাপক। সংসারটি তাঁর খুব বড় না হলেও ছুই বেলায় প্রায় কুড়িজন লোকের রান্না-বান্নার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু বনমালা দেবী একাই রান্না ঘরের ভারটি নিজের হাতে রেখেছেন—যখন তিনি প্রবেশিকা

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন তখন থেকে। ছোট ছোট ভাই বোন ভাগনী—এরাও রান্নার কাজে বনমালা দেবীর সহায়, রান্নার ব্যাপারে এরাও এমনভাবে তৈরী হয়ে উঠেছে বনমালা দেবীর শিক্ষায় যে, কোন দিন কোন কারণে প্রয়োজন হলে এরাও মিলে মিশে রান্নার ব্যাপারটি বেশ সহজ আর স্বচ্ছন্দভাবেই চালিয়ে নিতে পারে। বুঝতেই পারছ, নিজের আর বাড়ীর ছোটদের আদর্শ দেখিয়ে বনবালা দেবী পাড়ার সকলের চোখগুলি কেমন খুলে দিয়েছেন। তাই, ছেলেবেলা থেকেই রান্না বিদ্যায় হাতি-খড়ি দিয়ে হাতে কলমে এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাটি যাতে শিখতে পারে, আর সেই সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজেও পটু হয়—এই উদ্দেশ্যে পাড়ায় যে কটি কিশোরী আছে—প্রত্যেকেই বনমালা দেবীর পিকনিক পার্টিতে অর্থাৎ রান্নার টোলে যোগ দিয়েছে। তাদের অভিভাবকরাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

দক্ষিণেশ্বরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। কলিকাতার জান-বাজারের পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই দেবালয় ও উদ্যান তৈরী করান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আশ্রমে সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে পরমহংস হন। মহামানব বিবেকানন্দও এইখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষালাভ করে তাঁরই নির্দ্দেশে জীব-কল্যাণকল্পে ব্রতী হন। এই জন্যই অনেক ভেবে-চিন্তে পিকনিক পার্টির মেয়েরা স্থির করেন—মহাপুরুষদের স্মৃতি-ঘেরা দক্ষিণেশ্বরের এই সিদ্ধ উদ্যানেই কিশোরীদের শিক্ষার হাতে-খড়ি দেওয়া হবে। এর পর, এই ধরণের নামকরা আর অতীতের স্মৃতি-ভরা পবিত্র উদ্যানগুলিতে পিকনিক বা চড়ি-ভাতির আয়োজন পালা করে চলবে। ভেবে-চিন্তে তাঁরা যা স্থির করে-ছিলেন, সেই ভাবেই কাজ চলে আসছে—এ সব কথা গোড়াতেই বলেছি। এখন কি ভাবে পিকনিকের সঙ্গে শিক্ষা চলে, বনমালা দেবীর ব্যবস্থাটিই দৃষ্টান্তের মত বলা হচ্ছে।

গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব দেবালয় এবং তাকে পরিবেষ্টন করে সুবৃহৎ বাগানটি যেন ছবির মত শোভা পাচ্ছে। একশ' বিঘা জমির উপর রাণী রাসমণির এই বিরাট কীর্ত্তি তাঁকে অমর করে রেখেছে। মন্দিরের উত্তর দিকে প্রকাণ্ড আমবাগান; গাছের পর গাছের সারি, ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিশে ক্রমশঃই এগিয়ে চলেছে সীমানা পর্য্যন্ত। এই সব গাছের তলাগুলি তপোবনের আশ্রমের মতই স্নিগ্ধ, সুন্দর, শান্তিময়। বনমালা দেবীর সতর্ক তত্ত্বাবধানে মেয়েগুলি গঙ্গায় স্নান সেরে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, এইদিকের একটি নির্জ্জন স্থান তাদের পিকনিকের জন্য বেছে নিয়েছে। স্থানটি মেয়েরাই ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে। বনমালা দেবীর কড়া আদেশ, নিজের হাতেই সব কাজ করা চাই; ঝাঁট দেওয়া থেকে, জল তোলা, বাটনা বাটা, উনান তৈরী করা, উনান ধরান, রান্না চাপান, মসলা দেওয়া, নাড়া-চাড়া, নামানো, পরিবেশন করা—অর্থাৎ পিকনিকের যা কিছু, সবই করবে ছাত্রীরা নিজের হাতে। অবশ্য কাছে বসে বনমালা দেবী বলে দেবেন--কেমন করে কোন্ কাজটি করতে হয়।

পিকনিকের তালিকায় স্থির করা হয়েছে—ছাত্রীরা নিজের হাতে উনান তৈরী করবে। সেই উনানেই হবে চড়িভাতি।

যদিও বালতীর উপর তৈয়ারী উনান একটি সঙ্গে এসেছে, তবুও কেমন করে উনান তৈরী করা হয় সেটি শিখাবার জন্য বাগানে দুটি উনান তৈরী করে রান্না চড়ান হবে স্থির হয়েছে।

ছোট একখানি চৌকির উপর বসে বনমালা দেবী মেয়েদের হাত দিয়েই উনান তৈরী করাতে লাগলেন। গঙ্গার পাড় থেকেই নরম মাটি একটি ঝুড়িতে ভরে তুলে আনা হয়েছে। খানকতক ইট, ছোট ছোট লোহার শিক, ঝিক দেবার জন্যে একটা ভাঙ্গা কলসীর গলার দিকটা, আর কিছু গোবর এনে গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

গঙ্গার পাড় থেকে যে মাটি আনা হয়েছে—সেটা এঁটেল ব'লে তার সঙ্গে বাগানের কিছু ঝুরো মাটি মিশিয়ে জল দিয়ে মেখে দোঁয়াশ করে নেওয়া হয়েছে। কেন না—দোঁয়াশ মাটিতেই উনান ভাল তৈরী হয়। যে মাটী এঁটেল বা খুব আঠা-আঠা নয়, আবার বালির মতন একবারে এলো নয়—জলে মেখে ইটের গায়ে লেপে দেওয়া যায়—তাকেই বলে দো-আঁশ মাটী।

কাঠের উনান—এবার বনমালা দেবী দলের মধ্যে বয়সে বড় আর শক্ত সামর্থ্য মেয়ে মীনাকে জিজ্ঞাসা করলেন—জমির উপরে কাঠের উনান তৈরী করতে হলে আগে কি করা চাই—মীনা ?

মীনা বলল—মাটী খুঁড়তে হবে আগে।

বনমালা দেবী তখন ছোট শাবলটি এগিয়ে দিয়ে বললেন—বেশ, তুমিই তাহলে উনানের মাটী খুঁড়ে ফেল।

শাবলটী হাতে নিয়ে মীনা জিজ্ঞাসা করল—গর্ত্তটি কি রকম করে খুলব ?

বনমালা দেবী বললেন—এমন আন্দাজে গর্ত্ত খুলতে হবে, উনানের মুখ দিয়ে কাঠগুলি দিলে, সেগুলি পুড়ে গর্ত্তে পড়বে অথচ গর্ত্তটি একবারে ভরে যাবে না ; আবার খুব বেশী গভীরও না হয়, কেন না তা হলে আঁচ নীচে নেমে যাবে, হাঁড়িতে জ্বাল পাবে না।

মীনা মাটীতে শাবলের ঘা দিতেই বনমালা দেবী বলে উঠলেন—উনানের মুখ যেখানে হবে, সেখানটি গড়ানে হওয়া চাই। এখন বল ত উনানের মুখ কোন দিকে করবার নিয়ম ?

মীনা মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, আর গৃহস্থালীর কাজও কিছু কিছু এরই মধ্যে শিখে ফেলেছে। তখনই উত্তর করল—পূবদিকেই উনানের মুখ থাকে। আমাদের বাড়ীতেও তাই আছে।

বনমালা দেবী বললেন—ঠিকই বলেছ তুমি। তবে এখানে আমরা পশ্চিম মুখ করেই উনান গড়ব, কেননা—হাওয়াটা আজ পূবদিক দিয়েই বইছে। পূবে মুখ হলে জোরে হাওয়া লাগবে আগুনে, তাই পশ্চিম দিকে উনানের মুখ রাখতে বলছি।

রেখা নামে দলের একটি ছাত্রী বলে উঠল—পশ্চিম দিকে কি উনানের মুখ করতে আছে ?

বনমালা দেবীকে কথাটির উত্তর দিতে হল না, অপর্ণা নামে আর একটি ছাত্রী বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করে বলল—হ্যাঁ, পশ্চিম দিকেও উনানের মুখ হয়, আমাদের বাড়ীতে উনানের মুখ পশ্চিম দিকেই।

রেবা নামে আর একটি মেয়ে বলল—খালি উত্তর আর দক্ষিণ মুখো উনুন করতে নেই, নয় বন দি ?

বনমালা দেবী সম্পর্কে এই দলের অধিকাংশ মেয়ের দিদি। মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিয়ে তিনি জানালেন—হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।

রেখা এবার জিজ্ঞাসা করল—উত্তর দক্ষিণে উনানের মুখ করলে কি দোষ হয় বন দি ?

বনমালা দেবী বললেন— কতকগুলি প্রথা পুরাকাল থেকেই আমাদের সমাজে এমনি চলে আসছে, আমাদের গুরুজনেরা সেগুলো মেনে এসেছেন ; কাজেই আমাদেরও উচিত মেনে চলা। তবে যে-সব প্রথার মধ্যে দোষ আছে, সেগুলোর সংস্কার করা আবশ্যক, তাতে সমাজের মঙ্গলই হবে। কিন্তু যে-সব প্রথার মধ্যে দোষ কিছু দেখা যায় না—অথচ বরাবর চলে আসছে, মানতে ক্ষতি ত কিছু নেই। এই ধরনা—শোবার বেলায় আমাদের গুরুজনরা সাবধান করে দেন—উত্তর আর পশ্চিম দিকে মাথা করে যেন না শুই। কিন্তু তলিয়ে বুঝলে জানা যাবে যে, পূব-পশ্চিমে আর উত্তর-দক্ষিণে বাতাস বেশীর ভাগই জোরে বয়। জোর বাতাসে

আগুনের আঁচ উঠতে বাধা পায়। আবার জোর-বাতাসে শোয়াও ঠিক নয়। এমনি এক একটা বার বা তিথিতে কোন কোন জিনিস খেতে নিষেধ আছে। তেমনি উনানের সম্বন্ধেও এই কথা চলে আসছে বরাবর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা প্রত্যেক বিষয়টির সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ হিসাব করেই এই সব নিয়ম কানুন করেছিলেন। তলিয়ে বুঝতে বসলে দেখতে পাবে—সত্যিই কথাগুলির দাম আছে।

বনমালা দেবীর নির্দ্দেশ মত, মীনা সাবল দিয়ে উনানের উপযোগী করে গর্ত্তটি খুঁড়ে ফেলল। তার পর তিন দিকে ইট পেতে মাটী দিয়ে উঁচু করে ভাঙ্গা কলসীর মুখটি নীচের দিকে এমন ভাবে বসিয়ে মাটী লেপে দিল যে সেই জায়গাটি গর্ত্তের মতই দেখতে হল। এই গর্ত্তে কাঠ দিলে ভিতরে গিয়ে পড়বে। তার পর উপরে মাটী দিয়ে ঢিপির মত করে তিনটি ঝিঁক বা কোণা এমনভাবে তুলল যে তার উপরে হাঁড়ি বা কড়া বেশ সমান হয়ে বসে—না নড়ে। নীচের মুখটিও গোময়-মাটীর প্রলেপ দিয়ে এমন করে তৈরী করল যে কাঠগুলি তার ভিতরে খুব সহজে দেওয়া যায় আর জ্বললার পরে আঙ্গরাগুলো ঝরে নীচে পড়ে যায়।

বনমালা দেবী বললেন—কাঠের উনান তৈরী করে সদ্য সদ্য তাতে রান্না চাপানো ঠিক নয়; তিন চার দিন পরে বেশ শুখিয়ে গেলে তার পর সে উনান ব্যবহার করা উচিত। সদ্য সদ্য ব্যবহার করতে হলে ঘুঁটে আর তুঁষের মৃদু আঁচে উনান তাতিয়ে বা শুখিয়ে নিতে হয়। মীনা, তুমি হাত ধুয়ে ফেল; আর রেবা, তুমি ঐ ধামা থেকে তুঁষ আর ঘুঁটে নিয়ে উনানটি ধরিয়ে দাও, শুখিয়ে উঠুক।

রেখা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, বনদি, ধরুন আমাদের বাড়ীতে এমনি একটা কাঠের উনান যদি করবার দরকার হয়, কি করে সেখানে করব? এ রকম মাটি ত পাব না—আগাগোড়া যে সব সিমেণ্ট করা?

বনমালা দেবী বললেন—তারও উপায় আছে, ইট পেতে সেখানে কাঠের উনান গড়তে হবে। বেশ, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমিই লেগে যাও—পাকা ঘরে কাঠের উনান কি করে পাতা যায়, তোমাকে দিয়েই তৈরী করা যাক।

আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে রেখা তৈরী হয়ে দাঁড়াল। বনমালা দেবী উনান গড়বার জায়গাটুকু চিহ্নিত করে দিয়ে বললেন—মনে কর এইটুকু জায়গা সানের, এখানে মাটি খোঁড়া যাবে না। অথচ এমন ভাবে একটি উনান পাততে হবে যে, ঐ উনানটির মতই কাঠের জ্বালে তাতে রান্না চলবে। এখন, প্রথমে সামনের দিকটি খালি রেখে তিন পাশে তিন খানি ইট পাত; এইবার ঐ পাতা ইটে কাদার প্রলেপ মাখিয়ে উপরি উপরি আরো দু'খানা করে ইট বসাও, আর সামনের দিকে—যেখানে মুখ, নীচটা ফাঁক রেখে উপরে একখানা ইট বসিয়ে দাও—তলাটা ঠিক গর্ত্তের মত দেখাবে। হ্যাঁ—তলার ঐ গর্ত্ত দিয়ে কাঠ যোগান দিতে হবে। এখন মীনা যেমন ঐ উনানটির ঝিঁক তুলে লেপে দিলে—তেমনি করে লেপে ঠিক করে দাও। তবে এ-উনানে ঝিঁকের জন্যে আর কলসীর কানার দরকার নেই।

দেখতে দেখতে ইট মাটির সাহায্যে পাকা ঘরে পাতবার উপযোগী আর একটি কাঠের জ্বালের উনান তৈরী হয়ে গেল। বনমালা দেবীর নির্দ্দেশ-মত মাটীর পলস্তারা দিয়ে উনানটিকে সুশ্রী করা হল।

কয়লার উনান :—এর পর অপর্ণা নামে মেয়েটির পানে তাকিয়ে বনমালা দেবী বললেন—অপর্ণা, আজ তোমাকেই কয়লার উনান পাততে হবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে অপর্ণা হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। বনমালা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—কয়লার উনান পাততে হলে কি কি চাই অপর্ণা?

অপর্ণা হাসি মুখে উত্তর করল—ইট, মাটী আর লোহার শিক।

বনমালা দেবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন—কাজ সুরু করবে কি ভাবে ?

অপর্ণা বলল—মাটীগুলি বেছে খোলা কাঁকর ফেলে দিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে ; বেশ ভিজে কাই কাই মতন হলে হাতের কাছে রাখতে হবে তুলে—

বনমালা দেবী হাসতে হাসতে বললেন—তাহলে ভেজা মাটী হাতের কাছে তুলে নাও, আর কাজ তোমার সুরু করে দাও। এই জায়গাটিতে উনান পাততে হবে।—বলেই তিনি যে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন, তার আধ হাত পিছনে ছিল প্রকাণ্ড একটা আম গাছের গুঁড়ি।

কয়লার উনান পাততে হলে প্রথমে দুখানি আস্ত ইট জমির উপরে পাততে হয়। চিহ্নিত জায়গাটিতে ইট দুখানি অপর্ণা পাততেই বনমালা দেবী প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বল ত—এত জমি পড়ে থাকতে আমি এই আমগাছটি ঘেঁসে উনান পাতবার জায়গা চিহ্নিত করে দিলুম কেন ?

অপর্ণা তৎক্ষণাৎ কথাটার উত্তর করল—ঘরের মাঝখানে উনান পাতা উচিত নয়, পূব বা পশ্চিম কোন্ দিকে মুখ হবে সেটি ঠিক রেখে—ঘরের দেওয়াল থেকে আধ হাত তফাতে উনান পাততে হয়। এটা ত আর ঘর নয়, তাই ঐ গাছটাকেই আপনি দেওয়াল ধরে নিয়েছেন।

বনমালী দেবী প্রসন্ন মুখে বললেন—ঠিক বলেছ তুমি অপর্ণা ; তোমরাও সকলে উনান পাতবার সময় এই কথাগুলো মনে রাখবে। ঘরের দেওয়ালের দিকে খানিকটা ফাঁক রেখে উনান পাতবে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানটির উপর অপর্ণা পাশাপাশি দুইখানি আস্ত ইট সমান করে পাততেই বনমালা দেবী বললেন—এখন ঐ ইট দুখানির উপর কিছু ভিজে মাটী পুরু আর সমান করে লেপে দাও। হ্যাঁ—এবার মাঝখানটি ফাঁক রেখে দু-পাশে এক একখানা করে আস্ত ইট দাঁড় করিয়ে দাও—

অপর্ণা তখন পাতা ইটদু'খানার দুদিকের কিনারা ঘেঁসে এক একখানি ইট দাঁড় করিয়ে দিতেছিল; কিন্তু বনমালা দেবী বাধা দিয়ে বললেন—উঁহু, অত ধার ঘেঁসিয়ে নয়, দাঁড় করানো ঐ ইটের মাথায় লোহার শিক পাততে হবে, তার সুবিধের জন্য—দু'পাশে আঙ্গুল দুই জায়গা ছেড়ে ইট দু'খানা দাঁড় করিয়ে দাও।

কথাটা বুঝতে পেরে অপর্ণা তাই করল; পাতা ইটের উপর মাটী-ভরা বেদীটির দুই দিকে দুই আঙ্গুল পরিমিত স্থান ছেড়ে দিয়ে একখানি করে ইট খাড়া করে দিল।

বনমালা দেবী বললেন—এখন ঐ ইট দুখানার মাথার উপরে লোহার শিকগুলি সাজিয়ে দাও।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল—কটা শিক বসাব? আর প্রত্যেক শিকটির মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে?

বনমালা দেবী বললেন—উনানটি যে রকম আকারের হবে, সেই পরিমাণে শিক বসাতে হবে। এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলে দিচ্ছি, সকলে শুনে রাখ।—ধর, খুব বড় একটা সংসারের জন্য বড় সড় উনান গড়তে হবে; তখন দু'খানার জায়গায় চারখানা ইট পাশাপাশি পেতে, তার ওপরে মাটী দিয়ে আবার চারখানা ঐভাবে পাততে হবে। উনান বড় আর উঁচু করতে হলে—এইভাবে তার ভিতটি উঁচু করা চাই। এই অনুপাতে এই রকম বড় উনানের ফাঁদটিও বড় হবে, কাজেই শিকগুলো বড় বড় আর সংখ্যাতেও বেশী চাই। অপর্ণা যে উনানটি গড়ছে—এটি হচ্ছে গৃহস্থ সংসারের মাঝারী উনান। এর জন্য পাঁচটি শিকই যথেষ্ট; আর লম্বায় আধ হাত করে হলেই চলবে। ফাঁক এমন আন্দাজে রাখতে হবে যে, কয়লা গুলো না গ'লে পড়ে যায়। কুঁচো কয়লায় যাঁদের রাঁধা অভ্যাস, শিকগুলো সেখানে একটু অল্প ফাঁক করাই ভাল; তাহলে পাঁচটির জায়গায় ছ'টি

শিক সেখানে দিতে হবে। এ-উনানে তুমি পাঁচটি শিকই দাও অপর্ণা, তবে এমন হিসাব করে পর পর পাত—যেন ফাঁকগুলো ছোট বড় না হয়।

যে-ইট দু'খানি দুই পাশে খাড়া ক'রে পাতা হয়েছিল তার মাথায়—যেমন করে ছাদের কড়ি বসায়—সেইভাবে অপর্ণা একটি একটি করে শিকগুলি পাতল। পাতবার আগেই ইটের মাথায় কাদা-মাটী এক পোঁচ দেওয়া ছিল, এর ফলে শিকগুলি নড় চড় হ'বার সম্ভাবনা রইল না।

পাঁচটি শিক পর পর পাতা হলে বনমালা দেবী বললেন—দু-দিকের ইটের উপর যতটুকু স্থানে শিকগুলো পড়েছে, বেশ পুরু করে কাদা-মাটী চেপে চেপে দাও।—হ্যাঁ, এখন দু'ধারেই একখানা করে ইট এমন ভাবে পাত—নীচের দাঁড়-করানো ইট যেন ঠিক মাঝ খানটিতেই থাকে।

অপর্ণা বলল—বুঝতে পেরেছি, মাথার ইটখানা এক পেশে হয়ে না বসে—নীচের পাতা ইটের মাথার সঙ্গে উপরের ইটখানির মাথাটি যেন সমান-সমান হয়—এই ত?

বনমালা দেবী বললেন—হ্যাঁ, তুমি ঠিক বুঝেছ। তোমরাও কথাটা বুঝে নাও।

দুই পাশে ইট দুইখানি ঠিক মত পেতে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল—এবার কি করব?

বনমালা দেবী বললেন—দেখতে পাচ্ছ ত, সামনের দিকটা খালি রয়েছে, এখন উনানের এই মুখটি গড়তে হবে। এখানে ইটও একখানা দিলে চলে, কিন্তু তাতে উনান হয় ভারি। পাতলা টালি কিম্বা করগেট বা টিনের একটা পাত সামনের দিকে পেতে তার উপরে মাটী দিয়ে ঝিঁক তুলে নিলেই ভাল হয়।

রেবা বলল—শিকের সঙ্গে লোহার একটা পাতলা পাত ত এসেছে বন'দি, এই যে—

রেবা লোহার হাল্কা অথচ মজবুত পাতটি অপর্ণার দিকে আগাইয়া দিল। অপর্ণা বলল—এটা আছে জানি।

বনমালা দেবী বললেন—সামনের দিকে ওটি বসিয়ে দাও; এই রকম পাতলা পাতেই উনানের বুকটি বেশ মজবুত অথচ হাল্কা হয়।

উপরে পাতা দুই দিকের দুইখানি ইটের নীচে যেখানে শিক পাতা আছে—সামনের সেই দিকে লোহার পাতলা পাতখানি শিকের গায়ে গায়ে লাগিয়ে তার ওপর মাটী দিয়ে ভরাট করে উপরের ইট দুইখানির সমান করে ফেলল অপর্ণা। নীচের দিকে শুধু মুখটি খালি রইল।

বনমালা দেবী বললেন—দেখতে পাচ্ছ ত, মাথার উপরটা আর নীচে কোলের কাছে মুখটা শুধু খালি রইল। কয়লার আঁচ উঠবে উপর থেকে, আর হাওয়া চলাচলা করবে সামনের এই ফাঁক দিয়ে। এখন ফাঁক দুটি ছেড়ে সমস্ত উনানটি বেশ করে কাদা-মাটী দিয়ে লেপে তিনটি 'ঝিঁক' তুলে ফেল। তাহলেই উনানটি তৈরী হয়ে গেল।

উনানের ঝিঁক—হেনা জিজ্ঞাসা করল—উনানের উপরের ঐ ফাঁকটিকে বুঝি ঝিঁক বলে বন' দি?

বনমালা দেবী বলিলেন—না, ফাঁকটিকে ঝিঁক বলেনা; উপরের ঐ ফাঁকটুকু হচ্ছে উনানটির মাথা; এরই ভিতর দিয়ে ধোঁয়া আসে, আগুনের আঁচ উঠে। এখন ত দেখতে পাচ্ছ, উনানটির চারপাশ সমান রয়েছে; যদি এর উপরে কোন পাত্র বসাও, পাগড়ী বা টুপীর মতন সমস্ত মাথাটি চেপে বসবে—আলো বাতাস যাবার রাস্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে, তার ফলে ভিতরের আঁচও নিবে যাবে। এই জন্যে এই ফাঁকটির উপরে এমন ভাবে মাটি দিয়ে তিনটি সমান সমান ঢিপি উঁচু করে তুলতে হবে—পাক-পাত্র যাতে বেশ এঁটে সেঁটে বসে, আর ঐ তিনটে উঁচু ঢিপির ফাঁক দিয়ে আলো বাতাস চলাচল করতে পারে। এই ঢিপিই হচ্ছে—ঝিঁক।

অপর্ণা বলল—ঝিঁক ত তিনটে হয়; সামনে দু'টি, আর পিছনে একটি।

বনমালা দেবী বলিলেন—হ্যাঁ। তে-কাঠা দেখেছ ত, কাঠের তৈরী—জ্যামিতির ত্রিভুজের মত। এর উপরে হাঁড়ি কলসি বেশ বসে, স'রে পড়েনা। উনানের ঝিঁক তিনটেও ঠিক ঐ তেকাটার মত। এখন তুমি ঝিঁক তুলে ফেল অপর্ণা।

অপর্ণা ঝিঁক তুলতে লেগে গেল। পিছন দিকে ঠিক মাঝখানটিতে আর সামনের দিকে দুই পাশে শক্ত করে মাখা মাটির বলের মত বসিয়ে টিপে টিপে কোণাগুলি উঁচু করে তুলে দিল। তার পর পাতলা মাটী দিয়ে আর একবার আগাগোড়া সমস্ত উনানটি পলেস্তারা দিবার মত করে লেপে দিল।

উনান মজবুত করার প্রণালী—বনমালা দেবী বললেন—উনান যাতে মজবুত হয়, বেশী দিন টেঁকে, তার একটা প্রণালী তোমাদের বলছি শুনে রাখ।

(ক) প্রথম দিন নূতন উনানে রান্নার পব আঁচ নামিয়ে—পাতলা মাতগুড়ের সঙ্গে গোময় ও মাটী মিশিয়ে মাঝারী রকম ঘন করে উনানের সর্ব্বাঙ্গে লেপে দেবে। এর পর দেখবে উনান পাথরের মত শক্ত হয়েছে।

(খ) রান্না শেষ হলেই উনানের আঁচ নামিয়ে দেবে। পোড়া কয়লা-গুলো তুলে একটা পাত্রে আলাদা করে রাখবে। পরে এই কয়লাও কাজে লাগবে। জল ঢেলে কদাচ আঁচ নেবাবে না। রান্নার পর এইভাবে উনানটির পাট করলে যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, তেমনি অনেকদিন পর্য্যন্ত টিঁকবে। উনান হচ্ছে আমাদের রান্নাঘরের যন্ত্র বা মেশিন। তাই এর সম্বন্ধে এত কথা বলছি। আজ মীনাকে দিয়ে যেমন কাঠের উনান আর অপর্ণাকে দিয়ে কয়লার উনান তৈরী করালুম, আসছে পিকনিকের

দিন তোমাদের ভিতর থেকে ছুটি মেয়েকে ঠিক এমনি করে উনান পাততে হবে। সেদিন বোঝা যাবে, কে কতখানি কাজ শিখেছ। এখন থেকেই তোমরা তৈরী হয়ে থাকবে আর আজ যা দেখলে বা শুনলে সেগুলি মনে করে রাখবে। যদি কিছু জানবার থাকে, চুপ করে থেক না—জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে।

তোলা উনান—অলকা নামে একটি মেয়ে এই সময় প্রশ্ন করল—কিন্তু তোলা উনানের কথা ত কিছু বললেন না বন দি ?

বনমালা দেবী বললেন—বলব বইকি। এইজন্যই ত বালতির উনানটি আনা হয়েছে। আজ কাল তোলা উনানের চলন খুব হয়েছে। বাজারে এ জিনিসটি খুব বিক্রী হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা যদি তৈরী করবার প্রণালীটা শিখতে পার, বাড়ীতেই তৈরী করতে পারবে। তিন রকমে তোলা উনান তৈরী করা যায়।

(১) একখানা টালির উপর পাতলা ইট মাটী দিয়ে ছোট আকারের উনান পাতা।

(২) ছেঁদা ফুটো অকেজো বালতির উপর উনান পাতা।

(৩) ক্যানেস্তারা কেটে উনান তৈরী করা।

মাটী বা সানের উপরে যেমন করে কাঠের কিম্বা কয়লার উনান পাতা হয়েছে, টালির উপরেও ঐ ভাবে উনান পাততে হবে। এর সুবিধা এই—নাড়াচড়া করা বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া চলে।

বালতি বা টিনের উপর উনান গড়তে হলে সামনে তলার দিকে বিঘত পরিমাণ বাটালি দিয়ে পানের আকারে কেটে গর্ত্তের মতন করতে হবে। টিন বা বালতির আয়তন অনুসারে এই ফাঁকটির খানিক উপরে ছুদিকে পর পর এমন কতকগুলি ছিদ্র করবে, ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে লোহার

শিকগুলি পাতা যায় আর মাঝের ফাঁক খুব বেশী বা একেবারে কম না হয়। তবে তোলা উনানে বাইরে আগুন ধরিয়ে অনেকে রান্নাঘরের ভিতরে তুলে এনে থাকেন, কাজেই উনান যাতে খুব ভারি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিকগুলি একটু ঘেঁস ঘেঁস হলে কুঁচো কয়লা ব্যবহার করা চলে। তাতে আঁচও ভাল হয়, খরচ কম পড়ে, আর ভারও বেশী হয় না। শিক পাতার পর ভিতরে বাইরে মাটী দিয়ে লেপে নিয়ে উপরে ঝিঁক তুলে নিতে হয়। প্রথম জ্বালানীর পর মাটীর সঙ্গে মাতগুড় ও গোবর মিশিয়ে উনানের গায়ে পলেস্তারার মত প্রলেপ দিলে তোলা উনান খুব মজবুত হয়।

প্রীতি নামে একটি মেয়ে এই সময় জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বনদি, সব উনানেই দেখি সামনে নীচের দিকে গর্ত্ত একটা চাইই। কাঠের উনানে যেন ঐ গর্ত্ত দিয়ে কাঠ দিতে হয়, তাই গর্ত্ত না করলেই নয়। কিন্তু কয়লার উনানে কি বালতির তোলা উনানে ত কাঠের কোন পাট নেই, উপর থেকে ঘুঁটে কয়লা সাজিয়ে দেওয়া হয়। তবে এ-সব উনানে ঐ গর্ত্ত করবার কি দরকার ?

বনমালা দেবী হাসিমুখে বললেন—তোমার প্রশ্ন শুনে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। জ্বালানির কথা বলবার সময় এ কথা অবশ্যই বলতুম, কিন্তু যখন আগেই জিজ্ঞাসা করেছ, এর উত্তরটিও বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোন।—কোন বদ্ধ পাত্রের ভিতরে আগুন থাকেনা, নিবে যায়। কাঠ পাতা ঘুঁটে কয়লা কাগজ এগুলির মধ্যে আগুন জ্বালবার যথেষ্ট উপাদান থাকলেও অক্সিজেন নামে আর একটি উপাদানের সঙ্গে না মিশলে আগুন জ্বলে না। এই সহজ দাহ্য পদার্থটি বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে ; কাজেই কাঠে বা কয়লায় আগুন ধরাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সেখানে বাতাস চলাচলের পথ আছে কি না। এই পথটি রাখবার জন্যই উনানের সামনে নীচের দিকে গর্ত্ত আর উপরে তিনটি ঝিঁকের মাঝে ফাঁক রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। উপর

নীচে এই পথে বাতাস চলাচল করে বলেই কয়লার উনানের এমন বাঁধা আঁচ হয়। তোলা উনান, ষ্টোভ, কুকার প্রভৃতি পাক-যন্ত্র গুলিতেও এইজন্য বাতাস চলাচলের পথ পরিস্কার রাখতে হয়েছে। এখন ত বুঝতে পেরেছ উনানের নীচে সামনের দিকে কেন গর্ত্ত রাখতে হয়, ভিতরে পাতা শিকগুলোর মাঝে আর উপরে ঝিঁকের পাশে কেন ফাঁক থাকে? উনানের সামনের গর্ত্ত দিয়ে শিকের ফাঁক দিয়ে ঝিঁকের পাশ বেয়ে বাতাস অবাধে যাতায়াত করে। বাতাস ভিন্ন আমরা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারি না, উনানের আঁচের ব্যাপারেও তেমনি বাতাসের পথ খোলা রাখা চাইই।

উন্নত প্রণালীর উনান—কাঠের উনানই বল আর কয়লার উনানই বল, যে ধরণের উনান আমাদের রান্না ঘরে চলে আসছে, তাতে ঝিঁকের ফাঁক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ তাপের অপচয় হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই তাপকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে একই উনানের আঁচে একই সময়ে দুইটি পাত্রের সাহায্যে যাতে রন্ধন হতে পারে সেই প্রণালীতে উনান নির্ম্মাণের অনেকে অনেক রকম নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখনও এগুলি বেশ কার্য্যকর হয়নি। এই ধরণের উন্নত প্রণালীর উনান তৈয়ারী করতে হ'লে একই মুখ রেখে এক সঙ্গে দুইটি উনান গেঁথে তুলতে হবে। বাম দিকের উনানটি কয়লার উনান পাতবার প্রণালীতেই তৈরী হবে বটে, কিন্তু ঝিঁক তোলা হবে না। অর্থাৎ উনানের মাথাটি এমন করে লেপে সমান করা চাই, তার ওপর পাত্র চাপালে সমস্ত ফাঁকটুকু জুড়ে বসতে পারে, তলা দিয়ে একটুও আঁচ বাইরে না আসে। আর ডান দিকের উনানটি বামদিকের উনান অপেক্ষা অন্ততঃ আধ হাত বেশী উঁচু হবে এবং এটির যথারীতি ঝিঁক থাকবে। কিন্তু এর তলায় শিক না দিয়ে মাঝখানে শুধু একটি গর্ত্ত করতে হবে। এখন বামদিকের বিনা

ঝিঁকের উনানটির মাথার দিকে অর্থাৎ পাত্র বসালে তলাটি যে-পর্য্যন্ত নেমে আসে তারই ইঞ্চি খানেক নীচে ডান গায়ে একটি গর্ত্ত হবে। এই গর্ত্তের মুখে একটি লোহার চোঙ্গ এমন ভাবে বসান চাই যাতে তার একটি মুখ এই গর্ত্তে থাকে আর একটি মুখ ডান দিকের উঁচু উনানটির তলার গর্ত্তটির সঙ্গে মিলে যায়।

রান্নার সময় বাম দিকের উনানটিতে কাঠ-কয়লা ও পাথুরে কয়লা সাজিয়ে ধরাবার পর আঁচ উঠলেই তার মুখে পাত্র চাপিয়ে দাও। ঝিঁক না থাকায় আগুন নিবে যাবার কথা। কেননা, আগুন জ্বালবার উপাদান হলেই আগুন জ্বলেনা, বাতাসের সঙ্গে অক্সিজেন নামে যে দাহক পদার্থ থাকে জ্বালানির সঙ্গে তার সংযোগ হওয়া চাই—তবেই খপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। এই জন্যই বাতাস চলাচল হয় না এমন আবদ্ধ স্থানে আগুনের কাজ হয় না। তাই উনানের গায়ে মাথায় ঝিঁক তুলে তলার গর্ত্ত দিয়ে বায়ু চলাচলের পথ রাখতে হয়। কিন্তু এই নূতন প্রণালীর উনানে ঝিঁক না থাকলেও আগুন নিবেবে না এইজন্য যে হাঁড়ির একটু নীচে গর্ত্তের মুখে লাগানো চোঙ্গের ভিতর দিয়ে এই উনানের আঁচ ডান দিকের উঁচু উনানটির তলায় দিয়ে তার ঝিঁকের গা দিয়ে বেরুচ্ছে; এই সঙ্গে বাতাসও চলাচল করছে। এর ফলে বাম দিকের বেশী আঁচের উনানটির ঝিঁকহীন মুখে ভাত ডাল প্রভৃতি পাত্র চাপিয়ে ডান দিকের অল্প আঁচের ঝিঁক দেওয়া উনানটির মুখে এমন কিছু একই সঙ্গে চাপাতে পারা যায় পাক করতে যাতে খুব বেশী আঁচের প্রয়োজন হয় না।

(৩) উত্তাপ বা জ্বালানি ঃ—রান্না ঘরের মেশিন বা পাক-যন্ত্র যেমন উনান, এই যন্ত্রটিকে চালাবার উপাদান হচ্ছে তেমনি কাঠ বা কয়লা। আমাদের রান্না ঘরে এই তুটিই উনান ধরাবার পক্ষে দরকারী জিনিস। কাঠের উনান জালতে কাঠ, ঘুঁটে, পাতা প্রভৃতি ইন্ধনরূপে

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে সহর-অঞ্চলে কাঠ দুর্ম্মূল্য এবং রন্ধনের পক্ষে সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক নয় বলে কয়লার উনানেই রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু কয়লার উনান ধরাবার জন্য ঘুঁটে, কেরসিন বা ছেঁড়া কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়। শিকের উপর প্রথমে একখানি বা দুইখানি ঘুঁটে পেতে তার ওপর একটু কেরসিন তেল দিয়ে উপরে উপরে আরও কয়েকখানি ঘুঁটে সাজিয়ে নীচের তৈলসিক্ত ঘুঁটে খানিতে অগ্নি সংযোগ করেই তার উপর ধীরে ধীরে এমন ভাবে কয়লাগুলি দিতে হইবে যেন বেশী চাপ ঘুঁটেগুলির উপর না পড়ে। একটু পরেই ঘুঁটেগুলি জ্বলতে জ্বলতে উপরের কয়লাগুলিও ধরিয়ে দেবে।

কেউ কেউ কেরসিনের বদলে শিকের উপরে প্রথমে ছেঁড়া কাগজ বা পাটকাঠি প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থ পেতে তার ওপরে ঘুঁটে দিয়ে যথারীতি কয়লা সাজিয়ে রাখেন। তার পর এক খণ্ড কাগজ জ্বালিয়ে শিকের তলা দিয়ে পাতা কাগজ বা পাঠকাঠিতে আগুন ধরিয়ে দেন। ঘুঁটের অভাবে এইভাবে কাঠ পেতেও উনান ধরান চলে।

কিন্তু এই দু'রকম ব্যবস্থাতেই উনান ধরাবার সময় প্রচুর ধোঁয়া হয়ে থাকে। এই ধোঁয়া যাতে না হয় অথচ উনান সহজে শীঘ্র ধরে ওঠে বনমালা দেবী তাঁর ছাত্রীদিগকে সে সম্বন্ধে এইরূপ একটি নির্দ্দেশ দিয়েছেন :—

উনানের শিকের উপর বরাবর এক থাক কাঠের কয়লা সাজিয়ে আগে সেগুলো ধরিয়ে ফেল। মাঝের কয়লাখানি আগে ধরিয়ে যথাস্থানে রেখে বাতাস দিলেই কয়লাগুলো সমস্ত ধরে উঠবে। কাঠের কয়লার ওপরে আস্তে আস্তে ওপরে ওপরে পাথরে কয়লাগুলি সাজিয়ে দেবে। কাঠের কয়লার আঁচে পাথরে কয়লাগুলো বিনা ধোঁয়াতেই ধরে উঠবে। কাঠের কয়লার বদলে টিকে, গুল প্রভৃতিও এইভাবে নীচে দিয়ে কয়লা ধরানো যেতে পারে।

বাড়ীতে জ্বালানি তৈরীর সহজ উপায়—বনমালা দেবী তাঁহার ছাত্রীদের দিয়ে খুব সস্তায় এবং সহজে এই জ্বালানিটি তৈরী করিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়াছেন—কত সহজে ও অল্প খরচে এই জ্বালানি প্রস্তুত করা যেতে পারে। তাঁর নির্দ্দেশটি এইরূপ—

পাথুরে কয়লার গুঁড়া, করাতের গুঁড়া, পুকুরের পাঁক (অভাবে বাড়ীর ময়লা জলের ট্যাঙ্কের তলার মাটি কিম্বা বাজারের কেনা মাটি) এবং গোবর এই কয়টি পদার্থ সমানভাগে মিশিয়ে বেশ করে মেখে গুলের মত করে শুখিয়ে নেবে। এর পর শিকের ওপর কাঠ কয়লা পেতে এই গুল সাজিয়ে উনান ধরাবে। এর আঁচ খুব ভাল হবে আর খরচের দিক দিয়েও অনেক সুসার হবে।

বাষ্পের সাহায্যে রন্ধন প্রণালী—বাষ্পের সাহায্যে রন্ধন স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর ব'লে চিকিৎসকগণ এ ব্যবস্থার সমর্থন করে থাকেন। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় সর্ব্বপ্রথম দেশবাসীকে এই প্রণালীতে রন্ধনের সুবিধা দিবার জন্য তাঁর বিখ্যাত 'ইক-মিক-কুকার' বাজারে বার করেন। গোলাকার একটু উঁচু চোঙ্গের মধ্যে বাষ্পের উত্তাপে এই কুকারে এক সঙ্গে চারিটি বাটিতে চার প্রকার খাদ্য তৈরী হয়ে থাকে। চোঙ্গের নীচে পরিমাণ মত জল থাকে, আর সেই জলের উপর একটা আধারে বাটিগুলি পর পর সাজিয়ে উপরে ঢাকনা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে খুব ছোট একটি উনানও থাকে, তার ওপর চোঙ্গাটি চাপালে তার উত্তাপে চোঙ্গের জল ফুটে উঠে বাষ্প নির্গত হয়, আর সেই বাষ্পে চারিটি বাটির খাদ্যই এক সঙ্গে এক ঘণ্টার মধ্যে সুসিদ্ধ হয়ে থাকে। এই প্রণালীতে ভাতের ফেন গালবার প্রয়োজন হয় না, ফেন মরে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে যায় ব'লে ভাতের সারভাগ সমস্তই বজায় থাকে।

বাষ্পের সাহায্যে রন্ধনের একটি নূতন প্রণালী—বনমালা দেবী এই প্রণালীটি আবিষ্কার করে তাঁর ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন। আজকাল কুকারের দাম অনেক বেড়ে গেছে, সকলের পক্ষে কুকার কিনে রন্ধন করা সম্ভবপর নয়, তাই তিনি সহজ উপায়ে বাড়ীতেই কুকারের প্রণালীতে রন্ধনের যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেটি এই রকম :—

এলুমিনিয়ম, পিতল, লোহা বা গ্যালভানাইজের প্রস্তুত এমন একটি ড্রাম সংগ্রহ করতে হবে যার মধ্যে ভাতের ও ডালের ডেকচি উপরিউপরি বসানো যায়। ড্রামের ভিতর তলার দিকে ইঞ্চি দেড়েক উঁচু এবং দুই থেকে চার ইঞ্চি বেড়যুক্ত এমন একটি গোলাকার বা চৌকো লোহার আধার চাই, ডেকচিগুলি যার উপরে স্বচ্ছন্দে রাখা যায়। আর, ড্রামের মুখটি আগাগোড়া ঢাকা পড়ে এমন একটি ঢাকনাও চাই—যেন ফাঁক দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যেতে না পারে। লোহার একটা শক্ত পাতকে ঢাকার মত করে আধার করা চলে এবং একখানা বড় থালা দিয়ে ঢাকনার কাজ চলতে পারে।

এখন ড্রামের মধ্যে লোহার ঐ ছোট আধারটি বসিয়ে এমন আন্দাজে জল ঢালতে হবে যেন আধারটি ছাপিয়ে না উঠে। এবার ভাতের ডেকচিতে চাল দিয়ে তার ওপর ঠিক পাঁচ আঙ্গুল মেপে জল ঢালা চাই। অর্থাৎ চালগুলির উপর পাঁচ আঙ্গুল জল থাকবে। ডালের ডেকচিতে সাধারণত যে আন্দাজে জল দেওয়া হয় সেই আন্দাজেই জল দিলে চলিবে। চালের ডেকচির উপরে ডালের ডেকচিটি বসিয়ে তার উপরে এমন একটি ঢাকনা বা এলুমিনিয়মের সরা কিম্বা ডিস বসিয়ে দাও, যেটি ডালের ডেকচির ঢাকনার কাজ করে এবং সেই সরা বা ডিসের উপর ব্যঞ্জনের তরকারিগুলি ধুয়ে নুন হলুদ ও মসলা মেখে রেখে সিদ্ধ করে নেওয়া চলে। এর পর ড্রামের উপরে মাথার ঢাকনিটি বসিয়ে দিয়ে মৃদু আঁচের

উনানের উপর চাপিয়ে দাও। পূর্ণ এক ঘণ্টার মধ্যেই এই ড্রামের ভিতরের ডেকচির ভাত ও ডাল সিদ্ধ ও প্রস্তুত হয়ে যাবে। ডেকচির ভাতের ফেন ভাতের সঙ্গে মিশে ভাতগুলিকে খুব সারযুক্ত করবে। অতঃপর সিদ্ধ তরকারিগুলি তুলে সহজেই বিভিন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করা সম্ভবপর হবে।

কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে, ড্রামের জল এক ঘণ্টার মধ্যে মরে না যায়। কুড়ি মিনিটের পরই ড্রামের মুখ দিয়ে ধোঁয়ার আকারে অল্প অল্প বাষ্প বেরুতে থাকবে, যদি মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়, বুঝতে হবে ড্রামে জল নেই; তখন ঢাকনার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে খানিকটা জল ঢেলে দিতে হবে। এক ঘণ্টা পরে ঢাকনিটি সাবধানে খোলা দরকার, কারণ হঠাৎ অসতর্কভাবে খুললে ভিতরে সঞ্চিত উত্তপ্ত বাষ্প হাতে বা মুখে লাগতে পারে। ডেকচিগুলি সন্তর্পণে পর পর নামিয়ে নিতে হবে। এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করে সুবৃহৎ ও মূল্যবান কুকারের সুবিধা অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারা যায় এবং এই ভাবে রন্ধন করলে আহার্য্য সারযুক্ত ও পুষ্টিকর হয়ে থাকে।

রন্ধন অনুযায়ী উত্তাপ বা জ্বালের নির্দ্দেশ— জ্বালানি ও উত্তাপ সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন রান্না একই রকম উত্তাপ বা জ্বালে ঠিকমত সম্পন্ন হয় না। অবশ্য, কুকার বা ড্রামের বাষ্পের সাহায্যে যে রান্না হয় তার কথা আলাদা, কেননা বাষ্পের তাপ একই ভাবে থাকায় এই প্রণালীতে যে সব রান্না হয় সেগুলি সমান ভাবে সুসিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু উনানের রান্নায় পাকের বস্তু অনুসারে তাপের হ্রাসবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। যেমন—

ভাত ডাল মাংস রুটি প্রভৃতির জন্য চড়া আঁচ বা জ্বাল বরাবর সমান ভাবে আবশ্যক হয়।

খিচুড়ী, আমিষ বা নিরামিষ ব্যঞ্জন রাঁধতে এবং পায়স, হালুয়া প্রভৃতির জন্য মধ্যম আঁচ প্রয়োজন।

পোলাও, ভাজা প্রভৃতি মৃদু আঁচে ভাল হয়। মাংস, দম, পোলাও প্রভৃতি দমে বসাবার সময় মৃদু আঁচ একান্ত আবশ্যক। কয়লার উনানে আঁচ বেশী থাকলে উনানের মুখে লোহা বা করকেটের একটা পাত চাপা দিলে বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ হয় এবং উত্তাপ নেমে আসে।

জল—ইহা রন্ধনের একটি প্রধান উপাদান। এই জলের উপর রান্নার দোষগুণ বা ভাল মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে থাকে। রান্নার পূর্ব্বে তৈজস পত্র, উনান ও জালানি প্রভৃতির যেমন যোগাড় রাখতে হবে, সেই সঙ্গে জলও হাতের কাছে রাখা চাই। জলের দোষে রান্নাই যে শুধু খারাপ হয় তা নয়, স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত তাতে ক্ষুন্ন হয়ে থাকে এবং আমাদের অজ্ঞাতে দূষিত জলের সঙ্গে অনেক রোগ দেহের মধ্যে সংক্রমিত হবার সুযোগ পায়।

অনেকে অপরিস্কৃত অর্থাৎ ময়লা জলে আনাচ পত্র ধুয়ে পাক পাত্রে চড়িয়ে থাকেন। এ অভ্যাস ভাল নয়। প্রত্যেক জিনিসটি পরিস্কৃত জলে ভাল করে ধুয়ে তবে রন্ধনের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

কল বা টিউব ওয়েলের জল রন্ধন কার্য্যে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে সর্ব্বত্র এই সুযোগ না থাকায় কূয়া, পুষ্করিণী ও নদীর জল সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে সকল সময় এই সকল জলাশয়ের জল পরিস্কৃত থাকে না, নানা কারণে দূষিত হয়ে উঠে। রন্ধন বা পানের জন্য এই জল পরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ করে নিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। জলাশয়ের জল পরিস্কৃত করে নেবার প্রণালী এইরূপ :—

(১) পরিষ্কার কাপড়ে জল ছেঁকে নিতে হবে।

(২) জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে অল্প ফট্‌কিরির গুঁড়া দিয়ে পাত্রের জলটুকু কাষ্ঠদণ্ড বা ডালের কাঁটার দ্বারা বার কয়েক ঘেঁটে দেবে। ঘণ্টা দুই

পরে দেখতে পাবে জলের সমস্ত ময়লা পাত্রটির নীচে গিয়ে জমেছে। তখন উপরের পরিষ্কৃত জলটুকু আস্তে আস্তে তুলে নেবে।

(৩) জল ফুটিয়ে নিয়ে যদি এই ভাবে ব্যবহার করা যায়, তা হলে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও স্বাস্থ্যকর হবে।

ঋতু পরিবর্ত্তন বা সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হ'লে এবং বর্ষাকালে রন্ধন ও পানীয় জল এইভাবে পরিষ্কৃত ও ফুটিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

কোন কোন কূয়ার জলে ডাল মাংস প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না। এক্ষেত্রে জল ফুটিয়ে রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করলে এবং রন্ধনকালে পাত্রের মুখ বরাবর ঢেকে রাখলে অনেকটা সুফল পাওয়া যায়। মাছ মাংস বা তরি তরকারীর স্বাদের যেমন তারতম্য দেখা যায়, জলের সম্বন্ধেও এ রকম স্বাদের পার্থক্য হয়ে থাকে। সকল টিউব ওয়েল, কূয়া বা জলাশয়ের জলের স্বাদ এক রকম নহে। যে সকল জলাশয়ে সূর্য্যের তাপ ও চন্দ্রের আলো সমান ভাবে পড়ে, তাদের জল স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু হয়, স্বাস্থ্যবিদ্‌দের এই অভিমত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জল পরিষ্কৃত ও ফুটিয়ে নিলে বিস্বাদ জলও সুস্বাদু হয়ে থাকে।

ফুটন্ত জল যাবতীয় রান্নার পক্ষেই একান্ত উপযোগী। প্রত্যেক ব্যঞ্জনটি রন্ধন করবার সময় যে জলের প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেই সময় কাঁচা জলের পরিবর্ত্তে ফুটন্ত জল ঢেলে দিলে ব্যঞ্জনের স্বাদ বৃদ্ধি হয়, আর রন্ধনও অপেক্ষাকৃত দ্রুত সম্পন্ন হয়। মাংস, দম, ডাল, হালুয়া প্রভৃতিতে কাঁচা জল দিলে প্রায়ই বিকৃত হয়ে থাকে ; কিন্তু ফুটন্ত জলে এদের আকৃতি ও আস্বাদ আশানুরূপ হয়। সুতরাং রান্নার কাজে এই জলের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। জলটুকু যাতে পরিষ্কৃত ও শোধিত হয় এবং ব্যঞ্জনে ঢালবার সময় ফুটন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে সচেষ্ট থাকলে ক্রমে এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে।

খাদ্য-বিচার

খাদ্য-বিচার ও খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ—আমরা প্রত্যহ যে সকল জিনিস খেয়ে থাকি সেইগুলিই খাদ্য নামে পরিচিত। এই খাদ্য নানা ভাবে রস রক্ত মাংস প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের দেহে স্বাস্থ্য, লাবণ্য ও সামর্থ্যের সঞ্চার করে। খাদ্যই আমাদের স্বাস্থ্য এবং আয়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ আমাদের নিত্যকার খাদ্য যদি ভাল ও পুষ্টিকর হয়, আমাদের স্বাস্থ্যও সেই অনুপাতে উত্তম ও সবল হবে। আর খাদ্য খারাপ হলে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়বে। যার স্বাস্থ্য ভাল নয়, সে কখন দীর্ঘায়ু হতে পারে না ব'লে সুস্থ দেহে তাকে দীর্ঘজীবি হতে দেখা যায়। কাজেই আমাদের দেহের এই ভাল মন্দ অবস্থার গোড়াতেই রয়েছে খাদ্য। সুশিক্ষা যেমন মানুষকে সুসভ্য, বিদ্বান এবং মনকে উন্নত করে, সুখাদ্যও তেমনই দেহকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে, আয়ু বাড়িয়ে দেয়। এই জন্যই পিকনিক সমিতির প্রধান লক্ষ্য হচ্চে বালিকারা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে যাতে খাদ্য সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বা দোষগুণ বিচার করবার শিক্ষাও লাভ করতে পারে এবং প্রাত্যহিক আহারে পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচিত করে পরিজনদের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় হয়ে উঠে।

পিকনিক সমিতির বনমালা দেবী তাঁর বালিকা ছাত্রীদিগকে নিয়ে পিকনিকের সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। এক দিনের কথা বলছি। সেদিন সহরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে খুব ঘটা করে পিকনিক বা চড়িভাতির আয়োজন হয়েছে। পিকনিক সমিতির

অন্যান্য মেয়ে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা বালিকাদের এই সখের ভোজে যোগ দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্রীবৃন্দ ত আছেই, উপরন্তু বনমালাদেবী এবং তাঁর সহপাঠিনী সঙ্গিনীরা যে সকল বালিকাকে রন্ধন বিদ্যাটি হাতে-কলমে শিখিয়ে পাকা রাঁধুনী করে নিচ্ছেন, তারাও এই বিশেষ চড়িভাতিতে উপস্থিত হয়েছে। আগে থাকতেই স্থির হয়ে আছে, পিকনিকের সকল কাজ কর্ম্ম বালিকারাই হাতে হাতে করবে, শিক্ষয়িত্রীরা তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করবেন, আর ভুলচুক হলেই তখনি দেখিয়ে শুনিয়ে সতর্ক করে দেবেন। আরও স্থির হয়েছে, বনমালা দেবী পিকনিকের সময় খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের কিরূপ সম্বন্ধ, আর কেমন করে খাদ্যের বিচার করা যায়—সরলভাবে বালিকাদিগকে সে সব কথাও বুঝিয়ে দেবেন।

বালিকাদের মধ্যে যারা একটু বেশী কর্ম্মঠ, একটা না একটা কাজে লেগে গিয়েছিল। কয়েকটি বালিকা বঁটিতে তরকারি কুটছিল, কেউ কেউ মসলা বাটছিল, পাঁচ সাতটি বালিকা এক জায়গায় চক্রাকারে বসে চাল ও ডাল বাছছিল, একটু বেশী বয়সের কতিপয় বালিকা উঠানে মাছ কুটছিল। শিক্ষয়িত্রীরা ঘুরে ফিরে সকলের কাজ পরিদর্শন করছিলেন। এমন সময় বনমালা দেবী আস্তে আস্তে উঠে বড় হলঘরটির এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়ালেন সকলেই যাতে তাঁকে দেখতে পায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা ভাবলেন, এবার তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করবেন। কিন্তু বক্তৃতার বদলে তিনি হাতের মোড়কটি খুলে একটি শক্ত পদার্থ সকলের সামনে উঁচু করে তুলে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলত লক্ষ্মীরা, এ জিনিসটি কি?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকারা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল—গুড়।

বনমালা দেবী বললেন—ঠিক বলেছ তোমরা। সত্যই এটা গুড়,

রস শুখিয়ে গেছে তাই ইটের মতন শক্ত হয়েছে। একে ভেলি গুড় বলে। আচ্ছা, এখন বল ত, আমাদের পক্ষে এ জিনিসটি কি ?

বনমালা দেবীর ছাত্রী মীনা উত্তর দিল—খাদ্য।

বনমালা দেবী বললেন—বেশ। এবার তোমাকে বলতে হবে, আমাদের এই খাদ্যটির মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী কোন্ জিনিসটি বেশী আছে আর তার কি গুণ ?

মীনা বলল—আমরা এই খাদ্যটিকে গুড় বলি। এই গুড় থেকে হয় চিনি, তার আর একটি নাম শর্করা। আমাদের কতকগুলি খাদ্যের ভিতরে শর্করা খুব বেশী পরিমাণে থাকে, তাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে এই চিনি বা শর্করাকে শ্বেতসার বলা হয়। আর, শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যগুলিও এই জন্য 'শর্করা জাতীয়' খাদ্য বলে গণ্য হয়েছে। এই 'শ্বেতসার' শব্দটির ইংরিজী নাম হচ্ছে—"কার্বো-হাইড্রেট" (Carbohydrate) যে সকল খাদ্যে এই জিনিসটি বেশী থাকে অর্থাৎ যেগুলি শর্করাজাতীয় বা শ্বেতসার প্রধান, তাদের গুণ হচ্ছে—দেহের তাপ রক্ষা করা, আর কাজ করবার শক্তি বাড়ানো। কাজ করবার এই শক্তিকেই ইংরাজীতে আমরা 'এনার্জ্জি' বলি।

বনমালা দেবী বললেন—মীনার কথা তোমরা বুঝতে পেরেছ ত ? এই যে গুড়ের ডেলাটি দেখছ, শুধু খেতেই এটি মিষ্টি নয়, এর প্রধান গুণ হচ্ছে রক্তের দোষ নষ্ট করা। রক্ত নির্দোষ ও পরিষ্কার হ'লেই দেহের তাপ বজায় থাকে আর পড়াশোনা করবার বা কাজকর্ম্মে মন দেবার শক্তিও বাড়ে। আচ্ছা মীনা, এবার বল ত'—আমাদের জানাশোনা আর কোন্ কোন্ খাদ্যে এই দুটি গুণ আছে ?

মীনা বলল—চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, ছাতু, সাগু, আলু—এই সব খাদ্যেরও ঐ দুটি গুণ আছে। কেননা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে এই সব খাদ্যকে শর্করাজাতীয় বা শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য বলা হয়েছে।

সুশীলা নামে একটি মেয়ে এই সময় তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তা কি করে হবে? গুড়কে যেন চিনি বা শর্করাজাতীয় খাবার বলা হল, কেননা—গুড় মিষ্টি। কিন্তু চাল, ডাল, আটা, আলু, সাগু—এরা কি গুড়ের মত মিষ্টি যে শর্করাজাতীয় হতে যাবে?

বনমালা দেবী হাসতে হাসতে বললেন—এখন তোমার প্রশ্নটির উত্তর শোন:—আমরা যে-সকল খাদ্য খাই, তাদের কতকগুলির মধ্যে ছানার মত সারবান পদার্থ থাকে, কতকগুলির মধ্যে চিনি থাকে, কতকগুলির মধ্যে নূন থাকে, কতকগুলির মধ্যে তেল বা চর্ব্বি থাকে, কতকগুলির মধ্যে জল থাকে। আবার কোন কোন খাদ্যের মধ্যে এগুলির দু'-তিনটি জিনিসও থাকে, অর্থাৎ চিনিও আছে আবার সেই সঙ্গে হয় ত তেল-চর্ব্বিও আছে। খাদ্যের মধ্যে এই যে নূন চিনি চর্ব্বি জল প্রভৃতি পদার্থগুলি থাকে, বাইরে থেকে সব সময় জানা যায় না, কিন্তু খাবার পর পরিপাকের সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যে যে সার জিনিসটুকু থাকে তখনি সেটি রক্তের মধ্যে মিশে দেহের উপকার করে। এই-যে তুমি বললে—চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সাগু, আলু—এগুলি কি গুড়ের মতন মিষ্টি যে শর্করাজাতীয় হবে? এর ছোট উত্তর হচ্ছে—এই খাদ্যগুলি পরিপাক হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনিতে পরিণত হয়। আবার এই খাদ্যগুলির মধ্যে ডাল জিনিসটিতে চিনি ত আছেই, সেই সঙ্গে ছানাও থাকে। এইজন্য ডাল থেকে দুটো সার জিনিস এক সঙ্গে বেরিয়ে আমাদের দেহকে পুষ্ট করে।

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, কতকগুলি খাদ্যের মধ্যে চিনি থাকে বলেই যেন পরিপাকের পর তারা চিনি হয়ে যায় বুঝলুম। কিন্তু ছানা কি করে থাকে, সেটা ত বুঝতে পারছি না।

বনমালা দেবী বললেন—বুঝিয়ে দিচ্ছি এখনি। কোন্ কোন্ খাদ্যে

কি কি জিনিস আছে, আর এক-একটি সার জিনিস থাকার দরুন সেই খাদ্য কোন ভাগে গিয়ে পড়ে—এগুলি ভাল করে জানলে আর বুঝতে কষ্ট হবে না ; তখন তোমরা নিজেরাই যে কোন খাদ্যের নামটি শুনেই ঠিক করতে পারবে—সেই খাদ্যটির কি গুণ এবং কোন জাতীয় ; আর, তার মধ্যে যে সার বস্তুটি আছে সেটি কি। এখন মন দিয়ে শোন : আমরা প্রত্যহ যে সব খাদ্য আহার করি তাদের প্রত্যেকটির এক একটি বিশেষ গুণ বা ক্রিয়া আছে। যেমন :

কতকগুলি খাদ্য আমাদের শরীর গঠন করে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর খাদ্যগুলির ক্রিয়া হচ্ছে শরীরের মাংস গঠন করা, শিরা-উপশিরা এমন কি মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পুরন্ত করে তোলা। তাই এ কার্য্যের সহায়ক খাদ্যগুলিকে মাংস-গঠন-কারী খাদ্য বলা হয়। এর ইংরাজী নাম হচ্ছে—Flesh-forming খাদ্য। যে সকল খাদ্যের এই ক্ষমতা আছে, তারা হচ্ছে ছানাজাতীয় খাদ্য। ইংরাজীতে এদের 'প্রটিন' বলা হয়।

কতকগুলি খাদ্য শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে এবং কাজ করবার শক্তি দেয়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে এরা উত্তাপ-রক্ষাকারী খাদ্য ব'লে গণ্য। এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে—Heat-giving খাদ্য। শর্করা এবং চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যগুলির এই গুণ আছে।

কতকগুলি খাদ্য থেকে হাড় গড়ে উঠে, সেই সঙ্গে দেহে রক্ত সঞ্চার করে। এজন্য এই খাদ্যগুলির নাম হয়েছে—হাড়গঠনকারী। ইংরাজীতে বলে—Bone-making খাদ্য। লবণজাতীয় খাদ্যগুলির এই গুণ বা শক্তি আছে।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই কয় জাতীয় খাদ্য বিশেষ ভাবে গণ্য করা হয়েছে সত্য, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা দরকারী বিষয় মনে রাখতে হবে। ঐ যে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যগুলির (ছানা, চর্ব্বি ও

শর্করা এবং লবণজাতীয়) কথা আগেই বলা হয়েছে, ওদের সম্পর্কে আরও দুটি জিনিস চাই ; একটি হচ্ছে—জল। কারণ, শরীর শুধু খাদ্যেই রক্ষা হয় না, সেই সঙ্গে চাই—প্রচুর পরিমাণে জল। আর একটি হচ্ছে—খাদ্যপ্রাণ বা 'ভিটামিন।' ঐ তিন জাতীয় খাদ্য নির্ব্বাচন করবার সময় দেখা চাই—ওদের সঙ্গে এমন কিছু নেওয়া হয়েছে যাতে জলীয় অংশ যথেষ্ট পাওয়া যাবে, আর ঐ খাদ্যগুলিতে আবশ্যক মত 'ভিটামিন'ও আছে। এই 'ভিটামিন' জিনিসটিই হচ্ছে 'খাদ্যপ্রাণ'। অর্থাৎ মানুষের দেহে প্রাণ না থাকলে যেমন তাকে শব বলা হয়, খাদ্যেও তেমনি এই প্রাণশক্তি না থাকলে অসার বা অকেজো বলে গণ্য হয়। সে খাদ্য খেতে যত ভালই হোক না কেন, তাতে দেহের কোন উপকার হয় না। যেমন, চালের গুণ অনেক। চাল থেকে ভাত হয়, ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য, ভাত শর্করাজাতীয় খাদ্য ব'লে ভাত পরিপাক হলে তাতে দেহের তাপ বাড়ে, এনার্জ্জি আসে। কিন্তু ভাতের চাল যদি অনেকদিনের বস্তাপচা হয়, 'ভিটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ তাতে না থাকে, সে ভাত খেয়ে দেহের উপকার ত হয়ই না, বরং অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। এই জন্যেই আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, খাদ্য নির্ব্বাচন করবার সময় দেখতে হবে কোন্ কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণে 'ভিটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ আছে।

অনু নামে একটি মেয়ে খুব মনোযোগ দিয়েই কথাগুলি শুনছিল। সে এখন জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, 'ভিটামিন' কি তাহলে একটা আলাদা খাদ্য নয় ?

বনমালা দেবী বললেন—না, ভিটামিন আলাদা খাদ্য নয়, এটি হচ্ছে খাদ্যের প্রাণশক্তি। খাদ্যের মধ্যে এমন একটি সার বস্তু আছে, যার জন্য শরীর গড়ে ওঠে। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা খাদ্যের এই সারবান বস্তুটিকেই 'ভিটামিন' বলেছেন। তোমরা শুধু এই 'ভিটামিন'কে এই বলে ধ'রে

নিতে পার যে, এই বস্তুটি যে খাদ্যে থাকে না, সে খাদ্য যতই মুখরোচক হোক না কেন, তাতে দেহের কোন উপকার হয় না। কাজেই যে-সকল খাদ্যে বেশী রকম ভিটামিন আছে, সেই খাদ্যগুলিই আমাদের নিত্যকার আহারে গ্রহণ করতে হবে।

রেণুকা নামে একটি মেয়ে এই সময় বলল—দেখুন, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথাগুলি বড় গোলমেলে, বুঝতে ভারি কষ্ট হয়। আপনি এমন সোজা করে আমাদের বুঝিয়ে দিন—যাতে আমরা আমাদের নিত্যকার খাদ্যের দোষগুণ ধরতে পারি, আর সেই বুঝে খাদ্য ঠিক করি।

বনমালা দেবী বললেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ, আজ তারই প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য ভালভাবে বজায় রাখতে হলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথাগুলি শুধু মুখস্থ করলেই চলবে না, খাদ্য-বিচার সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই সাধারণ একটা জ্ঞান যাতে জন্মায় সেই চেষ্টাই করতে হবে। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ—পশু পক্ষী ইতর জন্তুরাও তাদের স্বাভাবিক প্রেরণা থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খুব ক্ষুধার্ত্ত জন্তুর সামনে যা-তা খাদ্য দিলেও তারা তা গ্রহণ করে না; আগে তারা শুঁকে দেখে যে, খাদ্যটি তাদের উপযোগী কি না। এই জন্যই দেখা যায়, যে-খাদ্য তাদের মনে ধরে না—শুধু শুঁকেই তাকে ত্যাগ করে, কদাচ আহার করে না। কাজেই খাদ্যের বাচ-বিচার সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা আরো বেশী তীক্ষ্ণ হওয়াই উচিত। এখন আমাদের নিত্যকার খাদ্যগুলির নাম করেই বলছি কোনটির কি গুণ, স্বাস্থ্য-রক্ষার দিক দিয়ে গৃহস্থ সংসারে কোন খাদ্যটির একান্ত প্রয়োজন।

শাক-সবজি—শাক-শবজি বলতে উদ্ভিদ থেকে যে সব খাদ্য উৎপন্ন হয় তাদের সবগুলিকেই বুঝতে হবে। শাক-পাতা, ডাল-ডাঁটা, ফুল মূল ফল পর্য্যন্ত উদ্ভিদের সব কিছুই শাক-শবজির মধ্যে পড়ে। যেমন, আমরা

সজনা গাছের কচি কচি পাতা শাকের মত ভেজে খাই, সজনার ফুলও মুখোরাচক খাদ্য, সজনার ডাঁটাও আমরা ভাতে দিয়ে ও চড়চড়ি করে খাই। ওল, কচু, মূলো প্রভৃতির মূলই প্রধান খাদ্য, শাক পাতা ডাঁটাও আমরা নানা রকম তরিবত করে রন্ধন করি। আলু, কড়াইশুঁটি, সিম, কপি, পলতা, হিংচে, নিমপাতা, থোড়, মোচা, বাঁধা কপি এ সবও শাক-সবজির অন্তর্গত। ফলকে অবশ্য শাক-সবজি বলে ধরা না হলেও উদ্ভিদ থেকেই যখন যাবতীয় ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর শাক-সবজির সমস্ত গুণ ফলে পাওয়া যায়, তখন ফলকেও এ পর্য্যায় ফেললে দোষের হয় না। কাঁচা কলা, পেঁপে প্রভৃতি যেমন আমাদেব ব্যঞ্জনের উত্তম উপাদান, তেমনি পরিপক্ক হলে পুষ্টিকর মুখরোচক ফলে পরিণত হয়। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা শাক-সবজি, ফল ও দুগ্ধকে একাধারে সম্পূর্ণ খাদ্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষাকর ঔষধ বলে গণ্য করে থাকেন। ফল ও দুধের কথা পরে বলব, এখন শাক-সবজি আর কাঁচা ফল—যেগুলি আমরা রন্ধন করে খাই, আগে তাদের কথাই বলি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে মেয়ের স্বাস্থ্য ভাল নয়, প্রায়ই তারা রোগা হয় আর দেহে লাবণ্যের অভাব দেখা যায়, এর প্রধান কারণ হচ্ছে রক্তহীনতা। তারা হয়ত বলবে,—'আমরা ত দিব্যি খাচ্চি দাচ্চি, নিত্য যা খাই—তা থেকেই ত দেহে রক্ত ও লাবণ্য সঞ্চার হবার কথা। তবুও কেন আমরা শুকিয়ে যাই আর দেহে গত্যি লাগে না?' এর উত্তরে আমি বলব—খাদ্য নির্ব্বাচনের দোষেই তোমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। তোমাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। আর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে যকৃতের কাজ ঠিক মত হয় না, ফলে নতুন রক্ত সৃষ্টিতে বাধা জন্মে, আর যেটুকু রক্ত হয় দেহের সব অংশে বেশ স্বাভাবিকভাবে চলাচল করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর কুফলও তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো—

একটু বেশী পরিশ্রম করলেই হাঁপিয়ে ওঠ, কোন বিষয়ে উৎসাহ লাগে না, মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এ-গুলি হচ্ছে কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ, যকৃতের কাজ ঠিক মত চলছে না।—কেন এ রকম হয় জান? শাক-সবজির দিকে তোমাদের বিতৃষ্ণাই হচ্ছে এর কারণ। আর কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে এই শাক-সবজি। এই জন্যই আমাদের দেশে একটা চলতি প্রচলন আছে—'শাকে বাড়ে মল।'

স্বাস্থ্যবিদ্‌রা বলেন, শাক-সবজির মধ্যে ছিবড়া জাতীয় জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে থাকাতে অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত কুপিত মল নরম ক'রে সহজে ঠেলে বার করে দেয়। নিত্য নিয়মিত ভাবে কোন না কোন শাক-সবজি আহার করলে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তা থেকে উৎপন্ন অনেক শক্ত শক্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এ ছাড়া শাক-সবজির আরও অনেক গুণ আছে। আমাদের দেহের রক্তে সময় সময় অম্লের ভাগ বৃদ্ধি পায়। রক্তে বেশী অম্ল জন্মালেই দেহের শক্তি কমে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ দেখা দেয়। কিন্তু নিত্য-নিয়মিতভাবে যারা শাক-সবজি খায়, তাদের রক্তে অম্ল জন্মাতেই পারে না। শাক-সবজি থেকে এমন একটা ক্ষার উৎপন্ন হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায় যে, তার তেজে অম্ল নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেহ রক্ষার জন্য ছানা, শর্করা ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য, লবণ, জল এবং ভিটামিন বা শ্রেষ্ঠ খাদ্যপ্রাণগুলির যাহা যাহা আবশ্যক—সে সমস্তই শাক-সবজির মধ্যে আছে। এই জন্যই আমাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও দেহকে পুষ্ট করতে, পরিপাকশক্তি সতেজ রাখতে, হাড় ও দাঁত গড়ে তুলতে, চোখের ব্যাধি নিবারণ করতে, শাক-সবজি একসঙ্গে আমাদের খাদ্য, পথ্য ও ঔষধের মত হিতকর।

ধনেশাক, চাঁপানটে ও গাঁদাল পাতার এত গুণ যে, নিত্য এদের ঝোল

খেলে মূল্যবান, 'কড্‌লিভার অয়েল' খাওয়ার অনেকটা ফল পাওয়া যায়। কডলিভার তেলে যে খাদ্যপ্রাণ থাকে, এই শাকগুলিতে তার তিন ভাগের এক ভাগ নিহিত আছে—পরীক্ষা করে তা জানা গিয়েছে। কচি নিমপাতা ও হিংচে শাক চোখের শক্তি বৃদ্ধি করে, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণে বাধা দেয়। পালং শাকের রক্ত বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা অদ্ভুত রকম। কলমি শাক, পুঁইশাক, লাউ ও কুমড়া শাক, কড়াই শাক, লোটুস শাক, বাঁধাকপির সবুজ পাতা—এদের প্রত্যেকটি পুষ্টিকর ও রোগ প্রতিষেধক। সজনা, লাউ, কুমড়া, পুঁই, নটে প্রভৃতির ডাঁটা, লাল শাক, গিমেশাক, প্রভৃতিতে প্রচুর 'ক্যালসিয়াম' থাকে। ছাঁচি বা সাদা কুমড়ার পাতা ডাঁটা ও কুমড়া প্রত্যেকটি 'ক্যালসিয়ামে' পূর্ণ। এই ক্যালসিয়াম আমাদের 'হার্ট' বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে চালু রাখে ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। তরকারি রূপে যে ফলগুলি আমরা রন্ধনে ব্যবহার করি, তাদের মধ্যে পেঁপে, ঢেঁড়স, সীম, গাজর, সালগম, বরবটি, আমড়া, টমেটো প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। যাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন, এই সব শাক-সবজি ও তরকারি তাদের নিয়মিত ভাবে খাওয়া উচিত।

করলা, মোচা, উচ্ছে, পেঁপে, পটল, বেগুন, আমড়া প্রভৃতি আনাজে এবং প্রত্যেক শাক-সবজির মধ্যে প্রচুর 'ফসফরাস' থাকে। আমাদের দেহরক্ষা ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে ফসফরাসের প্রয়োজন যথেষ্ট। সুতরাং শাক-সবজি ও আনাচ থেকে আমরা ফসফরাস পেতে পারি।

ওল, কচু, মূলো, গাজর, বিট, পিঁয়াজ, আলু এই সব মুলজ তরকারি বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব লবণের আধার স্বরূপ। আলু, কচু ও ওলের মধ্যে এত বেশী রকমের খাদ্যপ্রাণ আছে যে, শুধু এইগুলি আহার করেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা বলেন—খুব ছোট আলু এবং

যে আলুতে কলা বা অঙ্কুর ফুটেছে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তারা আবার অনিষ্টকর। সুতরাং রন্ধনের সময় আলু সম্বন্ধে এটা লক্ষ্য রাখা উচিত। এঁটেল আলুর চেয়ে বেলে আলুই বেশী পুষ্টিকর আর সুপাচ্য। আলুর খোসার ঠিক নিচেই তার খাদ্যপ্রাণ থাকে, এ-জন্যে খোসাশুদ্ধ আলু ব্যবহার করাই উচিত। খোসা থাকায় আলু ছিবড়া জাতীয় পদার্থরূপে কোষ্ঠপরিষ্কারেও সহায়তা করে। পিঁয়াজকেও পুষ্টিকর খাদ্য ব'লে গ্রহণ করা যায়। এর মধ্যে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে, ছানা শর্করা ও ধাতব লবণের অংশও পিঁয়াজে বিদ্যমান। তবে পিঁয়াজ জিনিসটি উত্তেজক ব'লে পরিমিত ভাবেই ব্যবহার করা ভাল। বড় পিঁয়াজ একটি কিম্বা ছোট পিঁয়াজ দু তিনটি কাঁচা, সিদ্ধ বা তরকারীর সঙ্গে প্রত্যেককে খেতে দিতে পারা যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে মাঝারী রকমের একটি পিঁয়াজই যথেষ্ট। যাদের কফ বেশী, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই শ্লেষ্মা জন্মায়, পিঁয়াজ তাদের পক্ষে ঔষধের মত হিতকারী। এ-ক্ষেত্রে পিঁয়াজ ব্যবহার করলে দেহ থেকে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসে, ঘাম হয়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর বেশ ঝরঝরে হয়। আবার যাদের ধাত কড়া, পিঁয়াজ জিনিসটি উত্তেজক ব'লে তাদের অনিষ্ট করে। কড়া মেজাজের মানুষ যাঁরা—পিঁয়াজ তাঁদের না খাওয়াই ভাল।

খাদ্যে শাক-সবজির প্রভাব—শাক-সবজির গুণের কথা মোটামুটি সবই বলা হল। এ থেকে তোমরা এই কথাগুলি রান্নার সময় সর্ব্বদা মনে রাখবে:

(১) ভাতে, ভাজায় বা তরকারিতে পাল্টাপাল্টি করে প্রত্যহ কোন না কোন শাক, ডাঁটা বা মূল ব্যবহার করবে।

(২) শাক-সব্জিতে যে খাদ্যপ্রাণ থাকে, তেল, ঘি, মাখন অর্থাৎ চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ ছাড়া সহজে গলে না। এই জন্যই পুরাকাল থেকে—

এ-যুগের ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের কথা প্রচার হবার অনেক আগে থেকেই ভাতে-ভাতের সঙ্গে তেল নুন মেখে খাবার ব্যবস্থা চলে আসছে। আমাদের সেকালের গৃহলক্ষ্মীরা এ-সব জানতেন। শাক-সব্জি ভাতে দিয়েই খাও, সিদ্ধ বা পুড়িয়েই খাও, তার সঙ্গে তেল বা ঘি দেওয়া চাইই। অনেকে ভাবেন, সিদ্ধ করে নুন মেখে শাক-সব্জি খাওয়াই ভাল—তাতে বেশী কাজ হয়। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা ঠিক নয়। শাক-সবজি যে-ভাবেই খাও না কেন, চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের সংযোগেই খাওয়া উচিত, তা সে তেল ঘি মাখন বা ভেজিটেবল প্রডাক্ট যাই হোক না কেন।

(৩) যদি এমনই বোঝ যে, সে দিনের খাদ্য-তালিকায় শাক-সবজির তরকারি রাঁধবার কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে অন্তত স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে শাক-সবজির একটা ঝোল কোন রকমে তৈরী করে খেতে দেবে। এর হাঙ্গামাও বেশী নয়। কিছু শাক-পাতা, তা সে দু তিন রকমের হলেও ক্ষতি নেই; ডাঁটা, দু চার টুকরা আলু, কপির পাতা, পটল, বরবটি, মুলো, টমেটো, শশা, বিট, গাজর, ছোলা, মটর, বেগুন, থোড়, মোচা, ঝিঙে, ডুমুর, সালগম প্রভৃতি শাক-সবজি ও আনাজগুলির যে কয়টি সংগ্রহ করতে পার, সিদ্ধ করে অল্প মসলা সংযোগে তেল বা ঘিয়ে সম্বরা দিয়ে নিরামিষ ঝোল বা 'ভেজিটেবল সুপ' করে প্রত্যেককে এক এক বাটি খেতে দেবে। জানবে—প্রচুর খরচপত্র করে যে সব উপাদেয় খাদ্য তৈরী করা হয়েছে, অল্প খরচে তৈরী এই শাক-সবজির সুপের খাদ্যপ্রাণ তাদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। শাক-সবজির এই জাতীয় একটি সাধারণ 'সুপ'কে তোমরা নিত্যকার খাদ্যে চালু রাখবে। আর মাথা খেলিয়ে শাক-সবজি, আনাজ ও মসলার অদল বদল করে প্রতি-দিনই স্বাদের দিক দিয়ে একটু নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করবে। ধর, কোন দিন একটু হিঙ ফোড়ন দিলে। কোন দিন বা আদা-মৌরি তেজপাতা

বেটে সম্বরা দিয়ে নতুন রকম আস্বাদ করলে। কোন দিন বা 'গোটা' মসলা দিয়ে সাঁতলে নিলে। হয়ত বা একদিন একটা পিঁয়াজ বেটে ঘিয়ে ভেজে সিদ্ধ তরকারি তাতে ঢেলে দিয়ে অল্প ফুটিয়ে স্বাদের রকম-ফের করা যেতে পারে।

(৪) শাক-সবজি কাঁচা অবস্থায় মাঝে মাঝে এক একদিন ভাত বা রুটির সঙ্গে খাবার ব্যবস্থাটা চালু করা উচিত। ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থাটিকে যদি নিত্যকার খাদ্যে পরিণত করতে পার ত আরো ভাল। সাহেবরা বেশী মাংস খান ব'লে তাঁরা প্রত্যহই কাঁচা শাক-সবজি ব্যবহার ক'রে থাকেন। বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য করেছ, সাহেবদের দেখাদেখি দেশী হোটেলেও চপ-কাটলেটের সঙ্গে শশা, গাজর, বিট, পিঁয়াজ প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় কুঁচিয়ে চাটের মত দেয়। ফলে মাংস ভোজনের জন্য কোষ্ঠবদ্ধতার আর আশঙ্কা থাকে না। এ-ছাড়া সাহেবরা কাঁচা শাক-সবজির একটা মুখরোচক খাদ্য চাটের মত প্রধান খাদ্যের সঙ্গে নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করেন। যখন যে শাক-সবজি ও আনাজপত্র পাওয়া যায়, ইংরাজীতে যেগুলি 'গ্রীণ ভেটিটেবল' অর্থাৎ সবুজ-সবজি নামে পরিচিত, তাদের সংযোগে এই কাঁচা তরকারি প্রস্তুত করা হয়। এই খাদ্য 'স্যালাড' নামে পরিচিত। আগে যে 'ভেজিটেবল সুপে'র কথা বলা হয়েছে, এটি তারই কাঁচা সংস্করণ আর কি! তোমরা মনে করলে এটিও তোমাদের খাদ্যে চালু করতে পার। ধর, দিনের খাবারে 'ভেজিটেবল সুপ' দিয়েছ, রাতের খাবারে 'স্যালাড'টিও চালিয়ে শাক-সবজির খাদ্যপ্রাণের আরও অনেকখানি অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দাও।

ভেজিটেবল সুপের মত ভেজিটেবল স্যালাড তৈরী করাও খুব সহজ এবং খরচও সামান্য। যেমন:

পালং শাক, লেটুস শাক, ধনে শাক, মুলো শাক, সরষে শাক,

(কুঁচিয়ে) ছোলা, মুগ, মটর, বরবটি, চিনাবাদাম (আস্ত কড়াই ভিজিয়ে কলা বা'র করা অবস্থায়), শশা, বিট, গাজর, মুলো, আদা, পিঁয়াজ, কপির কচি পাতা, টমেটো প্রভৃতি ছোট ছোট ও সরু সরু করে কেটে—এগুলির মধ্যে যে সময় যা পাওয়া যাবে—সমস্ত একত্র মিশিয়ে রাই সরিষা গুঁড়া, লবণ, মধু ও খাঁটি সরিষা তেল, মাখন বা অলিভ অয়েল দিয়ে চামচের সাহায্যে মাখামাখি করে এই স্যালাড তৈরী করা যায়। এতেও তোমরা মাথা খেলিয়ে বুদ্ধি খরচ করে স্যালাডের নতুন নতুন উপাদান ঠিক করতে পার। কাঁচা অবস্থায় কোন্ কোন্ শাক ও আনাজ এই ভাবে তৈরী করলে খেতে মুখরোচক হয় অথচ যেগুলি খুব নরম ও স্বাস্থ্যকর—নিজেরাই সেগুলি পরীক্ষা করে নির্ব্বাচন করতে পার।

আমাদের দেহ গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে শাক-সবজি ও আনাজপত্র যে কত উঁচুদরের খাদ্য, আর এই পুষ্টিকর খাদ্যকে উপেক্ষা করা যে কত বড় অন্যায়, তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এখন থেকে শাক-সবজির গুণের কথা মনে রেখে রান্নার ব্যবস্থা ও খাদ্যের তালিকা স্থির করতে হবে।

ফল—এটিও উদ্ভিদজাত খাদ্য। কাজেই, শাক-সবজির পরেই ফলের কথা বলা চাই। শাক-সবজির অধিকাংশ গুণই ফলে বিদ্যমান। শাক-সবজির মত ফলেরও রোগ প্রতিরোধের শক্তি যথেষ্ট এবং ফলের রস রক্তের অম্ল বিষ নষ্ট করে। আমাদের দেহে অম্লের ভাগ বৃদ্ধি পেলেই নানা রকম রোগের আবির্ভাব হয়ে থাকে। ক্ষারজাতীয় পদার্থই অম্লবিষ নিবারক। শাক-সবজি ও ফলের প্রধান গুণ হচ্ছে এরা ক্ষারধর্ম্মী, অর্থাৎ এদের রসে ক্ষারজাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় তার প্রভাবে দেহ থেকে অম্ল বিষ মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এর ফলে, দেহ নীরোগ ও সুস্থ হয়ে ওঠে। ছানা, শর্করা ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যাংশ ফলে প্রচুর পরিমাণে

থাকায় এবং উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণের জন্য কেবল ফল খেয়েই জীবন ধারণ করা যায়।

স্বাস্থ্যবিদরা বলেন যে, দুগ্ধের অভাবে বা দুগ্ধ হজম না হ'লে, সে ক্ষেত্রে কমলা লেবুর রস পান করতে দিলে সঙ্গে সঙ্গে হজম হয় এবং রোগীর পক্ষে ঔষধ ও পথ্যের কাজ করে। খুব সুমিষ্ট কমলার রস সাগু ও বার্লির সঙ্গে মিশিয়ে রোগীকে খেতে দিতে পারা যায়। সাধারণ অবস্থায় কমলার রস খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং সবটুকুই দেহের কাজে লাগে। কমলার আরও একটি গুণ হচ্ছে—অগ্নিমান্দ্য দূর করে ক্ষুধা উৎপন্ন করা। এমন কি, যে সব শিশু শৈশবে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত, দুগ্ধ পরিপাক করতে অসমর্থ্য, তাদের বয়স অনুসারে আধ আউন্স থেকে দু আউন্স কমলালেবুর রস খেতে দিলে স্তন দুগ্ধের কাজ করে—শিশুদেহ দিব্য গড়ে ওঠে। বাতাপি লেবুও কমলার মত উপকারী। কমলার অভাবে সুমিষ্ট বাতাপি লেবুর রসেও ঐ সব গুণ পাওয়া যায়।

সুস্থ শরীরে ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষে পাতি কাগজি প্রভৃতি টক লেবুর রসও খুব উপযোগী। লেবুর অম্লরস আশ্চর্য্য ভাবে রক্তের অম্লত্ব নষ্ট ক'রে থাকে।

আম জাম আনারস আঙ্গুর প্রভৃতির রসও পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী। সুপক্ক আম অন্ততঃ দু ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তার রস পান করলে সহজে পরিপাক হয়। দুগ্ধের সঙ্গে মিশিয়ে আমের রস পান করলে একটি সম্পূর্ণ ও উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়।

আপেল ফলটিও একাধারে ঔষধ ও পথ্য। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং পাকস্থলীর পক্ষে আপেল অত্যন্ত উপকারী। সকালে ও বিকালে খালি পেটে একটি করে আপেল খেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পাওয়া যায়। আপেলের অভাবে সকরকন্দ বা রাঙা আলু এই ভাবে ব্যবহার করলেও অনেকটা উপকার হয়।

বিকালের দিকে এক গ্লাস টমেটোর রসে অল্প চিনি ও এক চামচ গব্য ঘৃত বা মাখন মিশিয়ে নিয়মিত রূপে পান করলে কডলিভার অয়েলের মত উপকার পাওয়া যায়।

সুপক্ক কলার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ যেমন বেশী, তেমনি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, লৌহ ও তাম্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করবার এবং হাড় ও রক্ত গড়ে তোলবার পক্ষে এর উপযোগিতাও যথেষ্ট। দুধের সঙ্গে পাকা কলা ও সেই সঙ্গে অল্প ভাত বা রুটি মেখে খেলে দেহগঠনের পক্ষে আবশ্যক সব কিছু সারবস্তুই পাওয়া যায়। আম যেমন জলে ভিজিয়ে রেখে খেলে সুপাচ্য হয়, কলার সম্বন্ধেও এই রকম একটা নির্দেশ আছে। সদ্য পরিপক্ক সুশ্রী হরিদ্রাবর্ণের কলাই সাধারণতঃ দুষ্পাচ্য হয়ে থাকে, কিন্তু এই পক্ক অবস্থার পর কলার খোসায় যখন কাল কাল দাগ পড়ে, বোঁটাটির উপরে হাত পড়লেই আপনা-আপনি খসে আসে—তখন বুঝবে যে ফলটি ঠিক সুপক্ক হয়েছে। এই অবস্থায় কলার ভিতরের শ্বেতসারটুকু শর্করাতে পরিণত হয়। এখন এই দাগধরা কলা খোসা ছাড়িয়ে শুধুই খাও আর দুধভাত বা রুটির সঙ্গে মেখেই ব্যবহার কর, সহজে পরিপাক হবে।

খুব মিষ্ট কলা হলে তার মধ্যে যে চিনি বা শর্করা আছে তাই যথেষ্ট, সাধারণ চিনির দরকার হয় না। ফলের চিনি, আর সাধারণ চিনিতে গুণের অনেক তফাত। সাধারণ চিনি পরিপাক হতে সময় লাগে, কিন্তু ফলের মধ্যে যে চিনি থাকে, খাবার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

বেলও কোষ্ঠ পরিষ্কারক ফল। কিন্তু কলার মত বেলকেও সুপাচ্য করা যায়। পাকা বেল সিদ্ধ করে যদি ব্যবহার কর, তখন আর হজম করতে বিলম্ব হবে না। কাঁচা বেল পুড়িয়ে বা সিদ্ধ ক'রে গুড়ের সহিত

নিয়মিত ভাবে খেলে দুর্ব্বল পাকস্থলীর পক্ষেও পরিপাক করা কঠিন হয় না।

কতকগুলি শুষ্ক ফলও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যেমন—কিস-মিস, খেজুর, বাদাম, কুল, আখরট, খোবানি, মনোক্কা, আমসত্ত প্রভৃতি। শুকনো ফল বিকৃত হলেও এদের মধ্যে চিনির অংশ সম্পূর্ণ বজায় থাকে। এগুলি জলে ভিজিয়ে রাখলে টাটকা ফলের মতই হয়। কিসমিস মোনক্কা বাদাম আখরোট আমসত্ত কুল প্রভৃতি শুকনো অবস্থায় অল্প জলে দশ বারো ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তার পর ব্যবহার করবে। খোবানি ও বিলাতী ডুমুর আরও চার পাঁচ ঘণ্টা বেশী ভিজিয়ে রাখবে। ভেজাবার আগে শুকনো ফলগুলি গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারলে খুব ভাল হয়। যে জলে ফল ভিজাবে, সেটুকু ফেলে না দিয়ে ফলের সঙ্গেই খাবে, কিম্বা তরকারিতে দেবে। কেননা ফলের মধ্যে যে সারবান খাদ্য থাকে তার কিছু অংশ ঐ জলের সঙ্গে মিশে যায়। এই সব শুকনো ফলের মধ্যে চিনির ভাগ এত বেশী থাকে যে, চিনির পরিবর্ত্তেই এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শুকনো ফলের মধ্যে বাদাম সব চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য। ছানা, চর্ব্বি, শর্করা এবং ছিবড়া ও লবণ জাতীয় পদার্থগুলি এতে এমন ভাগে আছে যে ভাত, রুটি ও মাংসের দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। ব্যবহারের পূর্ব্বে বাদামকে ভিজিয়ে রাখা চাই; তার পর উপরের খোসা তুলে মিহি করে বেটে জলে গুলে ছেঁকে নিয়ে অল্প মিষ্টির সঙ্গে খাওয়া উচিত।

বাদামের দাম বেশী ব'লে সকলের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু বাদামের সব গুণগুলি আছে অথচ দামে সস্তা এমন কয়টি জিনিসও বাদামের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—আখরোট, চীনাবাদাম, নারিকেল। এগুলিও বাদামের মত ভিজিয়ে বেটে খাওয়া উচিত। বাদামের মত এগুলিও দুষ্পাচ্য বটে, কিন্তু সহজেই সুপাচ্য করে

নেওয়া যায়। এগুলি যদি মিহি করে বেটে মসলার মত তরকারির সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তরকারিতে মাখন বা ঘিয়ের মতই কাজ করে।

আখরোট, চিনাবাদাম ও নারিকেল কাঁচা, ভেজে বা সিদ্ধ ক'রে খেলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। মুড়ি বা চিঁড়া ভাজার সঙ্গে এগুলি যদি খুব চিবিয়ে খাওয়া যায় তখন সহজে হজম হয়ে থাকে। মুড়ির সঙ্গে ঝুনা নারিকেল চিবিয়ে খেলে অম্ল রোগ সারে। এর কারণ হচ্ছে—নারিকেলের মধ্যে যে ক্ষারপদার্থ আছে দেহের অম্ল তাতে নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য নারিকেলের দুধও অম্লরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাবের জলেও এই গুণ যথেষ্ট আছে। খাবার এক ঘণ্টা পরে একটি ডাবেব জল পান করলে অম্ল নষ্ট হয় ও পরিপাকশক্তি বাড়ে।

আম, জাম, কমলা, কলা, আপেল, ন্যাসপাতি, ফুটি, তরমুজ, পিয়ারা, শশা, আনারস, আঙ্গুর, কিসমিস, খেজুর প্রভৃতি ফলে ছানা ও চর্বি জাতীয় খাদ্যাংশ কম থাকে। সুতরাং যদি ফলের উপরেই নির্ভর করতে হয়, তাহলে এই ফলগুলিরর সঙ্গে বাদাম জাতীয় ফল অর্থাৎ বাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম ও নারিকেল—এগুলির কোন না কোনটি ব্যবহার করা উচিত। কারণ, বাদামজাতীয় ফলগুলিতেই ছানা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। অন্যান্য ফলে ছানা ও চর্বির অংশ সাধারণত খুব কমই পাওয়া যায়। ফলের সঙ্গে দুগ্ধ অত্যন্ত উপযোগী ও সহকারী খাদ্য।

যে সব ছেলে মেয়ে খুব রোগা, ভাল ভাবে খাওয়া দাওয়া ক'রেও যাদের দেহে মাংস লাগে না, ঔষধে কোন ফল হয় না, অভিভাবকদের উচিত—অন্যান্য খাদ্যের ভাগ কমিয়ে ফলের ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া। তখন বুঝতে হবে, এদের দেহে চর্বির অভাব হয়েছে। কিন্তু চর্বিবৃদ্ধিকর অন্য পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্তে বেশ বাঁধা ধরা নিয়মে যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাকা কলা (কলার বোঁটাটি ধরলেই খসে পড়ে ও খোসায় দাগ পড়েছে—এমন

ভাবে পাকা) ঝুনা নারিকেল বাটা, আর দুধ খেতে দেন, দেখবেন কত শীঘ্র তাদের দেহের উন্নতি হয়েছে। এর উপর যদি বাদাম আখরোট খেজুর কিসমিস খাওয়াতে পারা যায় সে ত ভালই। কিন্তু গৃহস্থ সংসারে অল্প ব্যয়ে যাতে সম্ভব হয় অথচ কাজ পাওয়া যায়—সেইজন্যই পাকা কলা, নারিকেল আর দুধের কথাই বলা হয়েছে। আবার, যে সব ছেলে মেয়ে খুব মুটিয়ে উঠছে, বুঝতে হবে তাদের দেহে চর্ব্বির ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় বাদামজাতীয় ফলগুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য ফলগুলি যদি অদল বদল করে খাওয়ানো যায়, তাহলে এই ফলাহারেই তাদের দেহ ক্রমে ক্রমে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এত গুণ এই ফলের।

শস্যজাত খাদ্য—ধান, গম, কলাই, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য থেকে চাল, আটা, সুজি, ডাল, বার্লি, ছাতু প্রভৃতি যে সব খাদ্য তৈরী হয়ে থাকে তাদের প্রত্যেকটিই পুষ্টিকর। শরীরগঠনের উপযোগী ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে এই সব খাদ্যে আছে। চালের মধ্যে আছে ছানা জাতীয় বস্তু ৮ ভাগ, চর্ব্বি-জাতীয় বস্তু ২ ভাগ, চিনি জাতীয় বস্তু ৮০ ভাগ, আর জল ২ ভাগ। ভাত, মুড়ি, চিঁড়ে, খই প্রভৃতি খাদ্যে চালের গুণ বজায় থাকে।

গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতিতে আছে ছানা জাতীয় বস্তু ১২ ভাগ, চর্ব্বি জাতীয় ২ ভাগ, আর চিনি ৭৪ ভাগ। আটা ময়দা সুজি, বার্লি, ছাতু প্রভৃতি খাদ্যে এই গুণ থাকে।

ডালের মধ্যে কোন্ কোন্ ডালে কি রকম বস্তু আছে সেগুলিও জেনে রাখা ভাল। মুগের ডালে—ছানা জাতীয় বস্তু আছে ২৪ ভাগ, চিনি জাতীয় ৫৩ ভাগ, চর্ব্বি জাতীয় ২ ভাগ, লবণ ২ ভাগ, জল ১০ ভাগ। মাসকলাই ও মুসুর ডালে আছে—ছানা ২৫ ভাগ, চর্ব্বি ৩ ভাগ, চিনি ৫৫ ভাগ, নূন ৩ ভাগ, জাল ১০ ভাগ। ছোলার ডালে আছে—ছানা

১১ ভাগ, চর্ব্বী ৪ ভাগ, চিনি ৯ ভাগ, নূন ৩ ভাগ, জল ১০ ভাগ। অড়হর ডালে আছে—ছানা ২২ ভাগ, চর্ব্বি ৩ ভাগ, চিনি ৫৪ ভাগ, নূন ৫ ভাগ, জল ১০ ভাগ। মটর ও খেঁসারি ডালে আছে—ছানা ২৩ ভাগ, চর্ব্বি ২ ভাগ, চিনি ৬০ ভাগ, নূন ২ ভাগ, জল ১১ ভাগ।

শস্যজাত খাদ্যগুলি যে কত পুষ্টিকর, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের ভাগ দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়। তোমরাও ভাগগুলি দেখে হিসাব করে রাঁধবার ব্যবস্থা করতে শিখবে।

দুগ্ধজাত খাদ্য—দুধও আমাদের একটি প্রধান খাদ্য। শরীর রক্ষার পক্ষে যা কিছু সারবস্তুর প্রয়োজন শুধু দুধেই তা পাওয়া যায়। এইজন্য স্বাস্থ্যবিদ্‌রা দুধকে একটি সম্পূর্ণ ও আদর্শ খাদ্য বলেছেন।

মাছ মাংস ডিম—খাদ্য হিসাবে এই তিনটির উপকারিতা বড় কম নয়। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ খুব বেশী থাকে ব'লে এগুলি পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। নিয়মিত ভাবে মাছ খেলে চিন্তাশক্তি বাড়ে, মাংসপেশী শক্ত হয়, দৃষ্টিশক্তিও প্রখর হয়ে থাকে। মাছের মধ্যে খুব বেশী ফরফরাস থাকায় মস্তিষ্কের পক্ষেও খুব উপকারী। ডাল এবং ভাতের পর মাছই বাঙ্গালীর প্রধান স্বাস্থ্যকর খাদ্য। মাছের উপযোগিতা খাদ্য হিসাবেও প্রচুর। প্রাচ্য মতে মাছ বলকারক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, এবং ব্যায়ামশীল, ভ্রমণকারী ও মস্তিষ্ক-জীবিদের পক্ষে উপকারক। মৎস্যভোজীরা কখন বায়ুরোগে আক্রান্ত হন না। প্রতীচ্য মতে মৎস্য ভোজনে চিন্তাশক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, স্নায়বিক শক্তি বাড়ে, মাংসপেশীগুলি শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। মাংস ভোজনের গুণগুলির সবই মাছের মধ্যে পাওয়া যায়। এই জন্যই মাছ বাঙ্গালীর আদর্শ খাদ্য বলে গণ্য হয়েছে।

মাংস সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিদ্‌রা বলেন, দুধ ঘি ও জল এই তিনটি জিনিসে

দেহরক্ষার উপযোগী যে পরিমাণ খাদ্য প্রাণ থাকে, শুধু মাংসের মধ্যেই সে সমস্ত পাওয়া যায়। তবে মাছ মাংস ডিম—স্বাস্থ্যরক্ষক ও পুষ্টিকর হলেও মাত্রা বুঝে খাওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যবিদ্‌রা বলেন, বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তি দিনে দুটি ডিম খেতে পারেন। বালক বালিকারা এই হিসাবে একটা করে ডিম খেতে পারে। স্বাস্থ্য-বিদ্‌দের মতে দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত অভ্যাস থাকলে ছেলে মেয়েরা একটি করে ডিম যদি খায় অনিষ্ট হবেনা, বরং দেহের উন্নতিই হবে। এক পোয়া মাংস খেলে যে উপকার হয়, দুটি ডিম খেলেও সেই উপকার পাওয়া যায়। ডিমে ছানা ও চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট আছে—ডিমের কুসুমেই এই অংশ বেশী থাকে ব'লে সাদা অংশটির চেয়ে এই অংশটি বেশী পুষ্টিকর। যেদিন ডিম খাবে, সেদিনকার খাদ্যে মাছ মাংস না থাকলেই ভাল হয়। ডিমের সঙ্গে দুধ হজম হয়, কিন্তু মাংসের সঙ্গে ডিম গুরুপাক হয়ে থাকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ডিম খেলে দুটি খাদ্যই সহজে হজম হয়ে যায়। নেবুর রসে ডিমের কুসুম মিশিয়ে খেলে যেমন শীঘ্র হজম হয়, তেমনি মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ে।

কাঁচা ডিম বেশী উপকারী ও অতি শীঘ্র হজম হয়। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিমও সুপাচ্য। সিদ্ধ বা ব্যঞ্জনে পাক করা ডিম গুরুপাক হয়ে থাকে।

আমাদের নিত্যকার খাদ্যগুলির সম্বন্ধে—কার কি গুণ, তার মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া গেল। রাঁধবার সময় তোমরা গুণের হিসাব করে পাল্টাপাল্টি করে এই সব খাদ্য রাঁধবে। আমাদের খাদ্য তালিকাকে কেঁটে ছেঁটে এমন করে তৈরী করতে হবে যাতে প্রত্যেক খাদ্যটি মুখরোচক হয় আর প্রত্যেক খাদ্যে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকে। আর একটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রত্যেক খাদ্যটি আমরা গ্রহণ করছি আমাদের দেহ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে। এমন বাড়াবাড়ি কিছু থাকবে

না—যাতে খাবার পর আইঢাই করতে হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। ভেবে চিন্তে খাদ্য বিচার ক'রে তোমরা রাঁধতে পারবে ব'লেই আমি আজ তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যগুলিকে পরিচিত করে দিলাম। আমাদের সাধারণ খাদ্যগুলির সঙ্গে চেনাশোনা হ'লে রান্না তখন সহজ হবে আর বিভিন্ন রান্নার ব্যাপারেও কাজে লাগবে।

মেয়েদের পিকনিকের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগকে এইভাবে বিভিন্ন খাদ্য-বস্তুর সহিত সুপরিচিত করে বনমালা দেবী খুব সহজভাবে যে সকল রান্নার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন, রন্ধন-প্রসঙ্গে তাদের উল্লেখ করা হ'ল।

রান্নার প্রসঙ্গে প্রত্যেক জিনিসটির কথা যেমন সুন্দর ও সহজভাবে তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, তেমনই নানারকম খাদ্য এবং খাদ্যের উপকরণ প্রস্তুত করবার প্রণালীগুলিও হাতে-ধ'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেগুলি এমন ভাবে প্রকাশ করা হ'ল—যা'তে তোমাদের বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। রান্নার সঙ্গে চাল-ডাল, তরি-তরকারি, মাছ-মাংস, বাটনা-মসলা প্রভৃতি ঝাড়া-বাছা, ধোয়া-সিদ্ধ বা ভাজা-ভুজির সম্বন্ধে তিনি যে-সকল শিক্ষা দিয়াছেন, তাদের প্রত্যেকটি পরীক্ষা করা, তাঁর পিক-নিকের ছাত্রীদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া প্রণালী। তোমরাও পরীক্ষা করলে যেমন প্রফুল্ল হবে, তেমনই অনেক নূতন বিষয় শিখতেও পারবে।

মেয়েদের পিকনিক

রন্ধন-প্রসঙ্গ

রন্ধনের উদ্দেশ্য ও গুণ—আমাদের স্বাস্থ্য ও দেহরক্ষা যেমন খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তেমনই তৈল ঘৃত লবণ মিষ্ট ও মসলাদি সংযোগে খাদ্যের আস্বাদ বৃদ্ধি করবার জন্যই রন্ধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কাঁচা অবস্থায় যে-সব খাদ্য আমরা গ্রহণ করতে পারি না, রন্ধনের গুণে সেই সব খাদ্যই আহারকালে আমাদিগকে প্রচুর তৃপ্তি দান করে। রন্ধনের আর একটি গুণ হচ্ছে—কাঁচা খাদ্যের মধ্যে যে-সব স্বাস্থ্যহানিকর জীবাণু থাকে, রন্ধনের ফলে আগুনের উত্তাপে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া, খাদ্যের ভিতরকার কঠিন অংশটুকুও সিদ্ধ হয়ে চর্ব্বণোপযোগী এবং সুপাচ্য হয়। উপরন্তু বহু বিশ্রী বস্তুও রন্ধনের গুণে সুশ্রী ও সুস্বাদু আহার্য্যরূপে ভোক্তার উপভোগ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এই রন্ধনের উপরেই আহার-জনিত তৃপ্তি বা অতৃপ্তি অনেকটা নির্ভর করে। এই সব কারণে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই রন্ধনে অভ্যস্ত এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রন্ধন সম্বন্ধে এক একটি বিশিষ্ট ধারা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তাকেই পাক-প্রণালী বলে থাকি।

রন্ধনের দোষ—রন্ধনের এই সব গুণের কথা স্বীকার করেও স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ সেই সঙ্গে কতকগুলি দোষেরও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, রন্ধন করা খাদ্য দুষ্পাচ্য হয়; আলু, পিঁয়াজ, পেঁপে, কপি, কড়াইশুঁটি, মুগ, টমেটো, নেবু, জাম, কামরাঙ্গা, পাকা লঙ্কা প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যের 'ভিটামিন' অধিক তাপসহ নয় ব'লে, রন্ধনে তাদের গুণ বা শক্তি কমে যায়। খাদ্যকে মুখরোচক করবার লোভে অতিরিক্ত মসলা দিয়ে খাদ্যকে গুরুপাক করে তোলা হয়। রন্ধন করা খাদ্য বেশীক্ষণ পড়ে থাকলে তার গুণ নষ্ট হয়, আর ব্যাধির জীবাণু-গুলি সহজেই রন্ধন করা খাদ্যের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পায়।

রন্ধনের দোষগুলি দূর করবার উপায়—রন্ধনের এই ত্রুটিগুলি যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা অস্বীকার করাও যায় না। কিন্তু সব খাদ্য যখন কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে না, রন্ধন না করে উপায় যখন নেই, তখন আমাদের রন্ধন-ব্যবস্থাকে উন্নত এবং বিজ্ঞানসম্মত করতে পারলেই রন্ধনের ঐ সব ত্রুটি দূর হবে; চেষ্টা আর অভ্যাস করলেই এটা সম্ভব হতে পারে। কি উপায়ে রন্ধন-ব্যবস্থাকে নির্দোষ করে রন্ধনের গুণগুলি কাজে লাগানো যায় সেই কথাই বলছি। সেই উপায়টি হচ্ছে কতকগুলি প্রচলিত পুরাতন ব্যবস্থার সংস্কার। অর্থাৎ যে নিয়মে বরাবর আমরা আমাদের খাদ্যগুলি ব্যবহার করে আসছি, তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন। যেমন :

(১) তরি-তরকারিগুলির খোসা যেভাবে ছাড়িয়ে আমরা রন্ধন করে থাকি, স্বাস্থ্যবিদ্‌দের মতে এ ব্যবস্থা ঠিক নয়। তাঁরা বলেন, তরি-তরকারিগুলির সার পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ থাকে তাদের খোসার মধ্যেই। অথচ আমরা এদের খোসাটি এমন ভাবে ছাড়িয়ে সাফ করে নিই যে তার চিহ্নটুকুও না থাকে। ফলে, খোসার সঙ্গেই জিনিসটির

সারাংশ বেরিয়ে যায়। এই অভ্যাসটি ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ কাঁচা তরি-তরকারিগুলির খোসা না ছাড়িয়ে, খুব ভাল করে ধুয়ে নিয়ে রান্নার জন্যে কুটতে হবে। তবে এমন কতকগুলি আনাজ আছে, যাদের খোসার কতকটা না ছাড়ালে সত্যই অসুবিধা হয়, যেমন—ইচোড়, মোচা, কচু, ওল, কাঁচকলা, থোড় প্রভৃতি। এসব আনাজের খোসা না ছাড়ালে চলেনা। তবে ইচোড়, কাঁচকলা, কচু, ওল প্রভৃতির গায়ের খুব শক্ত আবরণটুকুই শুধু সন্তর্পণে ছাড়িয়ে নেবে। আলু, পটল, বেগুন, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, উচ্ছে, করলা, পেঁপে, কোয়াস প্রভৃতি তরকারির খোসা ছাড়াবার অভ্যাসটি একবারে ছাড়তে হবে। এদের মধ্যে যে সকল আনাজের খোসা কিছু বেশী কঠিন, সেগুলি বরং বঁটির উল্টো পিঠে ঘসে চেঁচে নেবে।

(২) তরকারিগুলি তেলে ভেজে ব্যঞ্জন রাঁধবার যে প্রথা বরাবর চলে আসছে, স্বাস্থ্যবিদ্‌দের মতে সেটা ঠিক নয়। তাঁরা এসম্বন্ধে বলেন—শাক সবজি বা তরি-তরকারি গরম তেলে ভাজাভুজি করার ফলে তাদের আসল খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং অনেক তেল ঘি খরচ করে আমরা খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে তাকে যেমন দুষ্পাচ্য করে তুলি, তেমনি তার সার অংশটুকু নষ্ট করে ফেলি। এ অবস্থায় তরি-তরকারি না ভেজে ভাপে সিদ্ধ করে যদি তেল নূন মসলা যোগে রাঁধা যায়, তাতে তরকারির ভিতরকার সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশই বজায় থাকবে, খাদ্যও সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর হবে। তারপর, তরি-তরকারিগুলিতে খোসা থাকার দরুণ, আহারের সময় বাধ্য হয়েই ভালো করে চিবিয়ে তার রসগ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটিও হিতকর।

(৩) তরি-তরকারির মত ডালের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সাধারণতঃ ডালের খোসা তুলে ফেলে ডাল ভেজে রন্ধন

করি। স্বাস্থ্যবিদ্‌দের মতে এ ব্যবস্থাও ভাল নয়। তরি-তরকারির খোসার মত ডালের খোসার সঙ্গেও সারবস্তু মিশে থাকে। আকাঁড়া চালের মত আকাঁড়া ডাল (অর্থাৎ শক্ত খোসা থেকে ডাল ছাড়িয়ে ভেঙ্গে তৈরী করে নেবার পর ডালের ওপরে যে পাতলা খোসা থাকে সেটা শুদ্ধ) খাদ্যে ব্যবহার করা উচিত। আর ভেজে রাঁধবার প্রথাও ত্যাগ করতে হবে।

(৪) মাংসের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। না ভেজে মাংসের জলেই মাংসকে সিদ্ধ করে নিলে, তার গুণ সম্পূর্ণ বজায় থাকে।

উপরে যে উপায়গুলি বলা হল, এগুলি হচ্ছে আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত রান্নার প্রণালী। ইংরেজরা স্বাস্থ্যকর সহজপাচ্য আহার্য্যে অভ্যস্ত বলেই, তাঁদের রান্নাবান্না সাধারণতঃ এই প্রণালীতেই হয়ে থাকে। এই জন্যেই খাওয়া সম্বন্ধে একটা প্রবচন আছে—ইংরেজরা বাঁচবার জন্যেই খায়।

কাজেই একথা জোর করেই বলা যেতে পারে যে, খাদ্যের দ্বারা দেহকে সুস্থ আর জীবনকে দীর্ঘ করতে হলে, আমাদের রাঁধবার ধারা এবং খাবার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হবে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত রন্ধনে ভাজাভুজি চলবে না, মসলার বাহুল্য থাকবে না। খাদ্যের স্বাদটুকুই এখানে বড় কথা নয়, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা করাই এখানে প্রধান লক্ষ্য।

প্রত্যেক খাদ্যটি এখানে ভাজার বদলে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এ অবস্থায় খাদ্যগুলি ভাপে সিদ্ধ করে নেওয়া উচিত; তাতে ব্যঞ্জনের আস্বাদ বাড়বে, খরচ কম হবে, সময়ের সাশ্রয়ও পাওয়া যাবে। এই ধরণের ভাপে সিদ্ধ রন্ধনের কথা খাদ্য-বিচার অধ্যায়ের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। এখানে আর একপ্রকার প্রণালীর উল্লেখ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত রন্ধন-প্রণালী

আনাজগুলি বেশ করে ধুয়ে ডুমো-ডুমো করে কুটে ফেল। খোসা মোটেই ছাড়াবে না। তবে এমন কোন আনাজ যদি থাকে—যার খোসা খুব শক্ত, শুধু বঁটির পীঠে আস্তে আস্তে তার উপরের পুরু ত্বকটি ঘসে বা চেঁচে নিতে পার। শাকগুলিও বেছে ধুয়ে কুঁচিয়ে ফেল। এখন ভাতের হাঁড়ির সরাটির ভিতরে শাক ও কোটা আনাজগুলি সাজিয়ে একখণ্ড পরিষ্কার ও শক্ত কাপড়ে সরা শুদ্ধু বেঁধে রাখ। এর পর উনানে ভাত চড়িয়ে ঐ আনাজ বাঁধা সরাটি ভাতের হাঁড়ির মুখে উপুড় ক'রে চাপা দাও। হাঁড়িতেও এমন পরিমাণে জল দেবে ফেন না গালতে হয় অথচ চালগুলি সিদ্ধ হয়ে যায়। হাঁড়ির চালের উপর ৫।৬ আঙ্গুল জল থাকে—এই আন্দাজে দিলে ঐ জলেই ভাত সিদ্ধ হবে, ফেনও মরে যাবে। ভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে উপরের আনাজগুলিও তার ভাপে সরাতে সিদ্ধ হয়ে উঠবে। এর পর সরা থেকে শাক ও আনাজগুলি নামিয়ে অনায়াসে এবং অল্প সময়ে ব্যঞ্জন রেঁধে নেওয়া চলে।

তরি-তরকারিগুলি আগে থেকেই সুসিদ্ধ হয়ে থাকে ব'লে, ব্যঞ্জন রাঁধবার সময় হালকা মসলা ব্যবহার করা উচিত। কারণ, তরকারিগুলি ত আর বেশী সিদ্ধ করবার প্রয়োজন হবে না। এখানে বাটা মসলার চেয়ে গুঁড়া মসলা বা কারী পাউডার অল্প পরিমাণে ব্যবহার করাই ভাল। তাতে ব্যঞ্জনের স্বাদ বাড়ে এবং সুপাচ্য হয়।

রোগীর পক্ষে কিম্বা সঙ্কটকালে এই প্রণালীর রন্ধনের উপযোগিতাও

প্রচুর। ভোক্তাদের রুচি অনুসারে চালের সঙ্গে আলু, পেঁপে, কচু, কাঁচকলা, রাঙ্গাআলু, কাঁটালবীচি, প্রভৃতি কুঁচিয়ে দিয়ে বর্ত্তমানের সঙ্কট অবস্থায় চালের পরিমাণও কমিয়ে নেওয়া যায়, অথচ এই প্রণালীতে রাঁধা ভাত খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হবে।

না-ভেজে এইভাবে আনাজশুদ্ধ ভাত এবং সিদ্ধ তরি-তরকারির ব্যঞ্জন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত ব'লে রোগী শিশু ও পেটরোগা ব্যক্তিদের পক্ষে পথ্যের মত যেমন হিতকর, সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিদেরও তেমনি স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু ভাজাভুজির পাঠ তুলে দিয়ে এই প্রণালীর রন্ধন যে সর্ব্বত্র চালু হয়ে যাবে, এমন আশা করা যায় না। ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনের কাজ সুরু করতে হয়। এই রন্ধন-প্রণালীই চালাতে হবে, পুরাতন প্রণালী চলবে না—এখনই জোর ক'রে এ-কথা বলা চলে না। তাহলে ত রন্ধন-প্রণালীর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, বাঙ্গালীরা সুরু থেকেই কি-রকম ভোজন-বিলাসী! পুরাকালের কাব্য-সাহিত্য থেকেও বাঙ্গালীর ভূরিভোজের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু তরিবত করে নানা রকম খাদ্য রন্ধনের ব্যবস্থা থেকেই আমাদের খাদ্য-সাহিত্যে চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় শব্দগুলির উৎপত্তি হয়েছে। বহুদিনের প্রথা দূর করা সহজ কথা নয়। তবে তোমরা মনে করলে ক্রমে ক্রমে আমাদের আহার ও রন্ধন-পদ্ধতির ধারা বদলে তাকে বাহুল্য বর্জ্জিত করতে পারো। ভাজা-ভুজি বা মুখরোচক খাদ্যগুলি একেবারে তুলে দেবার চেষ্টা না ক'রে বিজ্ঞান-সম্মত রান্নার সঙ্গে অল্প সল্প চালাতে হবে। সেই সঙ্গে বেছে বেছে আমাদের সৌখীন খাদ্যগুলিকেও যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যকর, সহজসাধ্য ও নূতনতর প্রণালীতে তৈরী করে মুখ বদলানোর উপাদানরূপে যোগান দিতে হবে। বিজ্ঞান-সম্মত সাদা-সিধা আহার্য্যের সঙ্গে যদি সৌখীন পাক-প্রণালী-সম্মত

এক একটি নূতন খাদ্য প্রত্যহ থাকে, তাহলে ভোজনবিলাসী ভোক্তাও তৃপ্তি পাবে, আর এইভাবে আহারের বাহুল্যতা ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসবে। তাই বাছা বাছা সহজসাধ্য সৌখিন খাদ্যগুলিও বাড়ীতে প্রস্তুত করবার প্রণালী বনমালা দেবী তাঁর পিকনিক পার্টির মেয়েগুলিকে শিখিয়ে দিতে ত্রুটি করেন নি।

রন্ধনের মসলা

বলা বাহুল্য যে, মশলার গুণেই খাদ্যের গৌরব বাড়ে। অখাদ্যও মসলার সংযোগে সুখাদ্যে পরিণত হয়। তাছাড়া মসলা থেকে পাচক-রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য সুপাচ্য হয়ে থাকে। মসলার উপর রন্ধনের স্বাদ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মসলার তারতম্যে একই তরকারির আস্বাদের পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে। কাজের বাড়ীতে অনেক সময় দেখা যায় যে, ভাড়াটে পাচকদের দিয়ে কর্ম্মকর্ত্তা নানাপ্রকার ব্যঞ্জন তৈরী করিয়েছেন, কিন্তু কুমড়ার ছক্কা থেকে ডাল ডালনা মুড়ি-ঘণ্ট কালিয়া দম প্রভৃতি প্রত্যেকটির আস্বাদ হয়েছে একই রকম। কোনটির স্বাদে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আবার এমনও হয়—খুব সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে হয়ত পাঁচটি পদ রান্না হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যঞ্জনটির বর্ণ আলাদা, আর আস্বাদও প্রত্যেকটির এক এক রকম। এইখানেই রাঁধুনীর কৃতিত্ব। কিন্তু এর মূলে রয়েছে মসলা নির্ব্বাচনের কৌশল। এই মসলা দেবার কৌশলটি জানা থাকলে ভোক্তার কাছে কোন ব্যঞ্জনই একঘেয়ে লাগেনা—একই ব্যঞ্জনের স্বাদ এক একদিন এক এক রকম করা যেতে পারে। স্বাদের এই তারতম্য অনেকটা ফোড়নের

ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন মসলার ফোড়ন দিয়ে তরকারির স্বাদের পরিবর্ত্তন করা যায়।

ফোড়নের মসলা—লঙ্কা (কাঁচা ও শুকানা), জিরা, মরিচ, কালজিরা, মেতি. মৌরি, রাঁধুনি, গরম মসলা (ছোট এলাচ, লবঙ্গ ও দালচিনি), তেজপাতা, রাই সরিষা, হিঙ্গ, পিঁয়াজ, রশুন।

তরকারি অনুসারে পাত্রে তেল বা ঘি চড়িয়ে পেকে উঠলে ফোড়নের মসলা (হামানদিস্তায় অল্প থেঁতো করে) ছেড়ে দিতে হবে। একটু পরে চড়বড় করে উঠলেই রাঁধা ব্যঞ্জন ঐ পাত্রে ঢেলে দিয়ে বার দুই নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেবে অথবা অন্য পাত্রে ঢেলে ঢাকা দিয়ে রাখবে।

মসলা-পরিচয়—লঙ্কা, হলুদ, জিরা, সা-জিরা, কালজিরা, কাল-মরিচ, সাদা-মরিচ, ধনে, সরিষা, মৌরি, রাঁধুনি, মেতি, তিল, পোস্ত, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, দালচিনি. লবঙ্গ, জৈত্রি, জোয়ান, জায়ফল, জাফরান, তেজপাতা, আদা, আমআদা, পিঁয়াজ প্রভৃতি।

বাটা মসলা—ব্যঞ্জনের জন্য সাধারণত মসলা শিলে বেটে নেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে লঙ্কা ও হলুদ এই দুটি মসলা পৃথক ভাবে বাটা হয়; বাকি সাধারণ মসলাগুলি যেমন—জিরা, মরিচ, ধনে, চন্নুনি বা রাঁধুনি, পোস্ত, সরিষা প্রভৃতি অনেকে একত্রই বেটে নেন। কেউ বা পোস্ত ও সরিষা আলাদা আলাদা বেটে রাখেন।

গুঁড়া মসলা বা কারী পাউডার—আজকাল অনেকে গুঁড়া মসলা ব্যবহার করে থাকেন। সাহেবদের রন্ধনে গুঁড়া মসলাই বরাবর চলে আসছে। গুঁড়া মসলার ঝঞ্ঝাট কম। পরিমাণমত গুঁড়া মসলা গরম জলে ঘন করে গুলে নিলে বাটা মসলার মতই হয়ে থাকে।

'গোটা' মসলা—রন্ধন-সংক্রান্ত যাবতীয় মসলা এবং আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত ঔষধ পর্য্যায়ভুক্ত মসলাগুলির সংযোগে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই মসলা

শুকতা, মাছের ঝাল, ঝোল প্রভৃতি ব্যঞ্জনে এবং রোগীর ব্যঞ্জনের জন্য সম্পূর্ণ মসলারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গোটা মসলার উপাদান—লঙ্কা, হলুদ, জিরা, মরিচ, ধনে, সরিষা, মৌরি, রাঁধুনি, মেতি, তিল, পোস্ত, জোয়ান, জৈত্রি, জায়ফল, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, শুঁট, বচ, জটামুখি, শৈলজ, একাঙ্গি, তাম্বুল, পিপুল, বৃচকিদানা, গিলা, আমলকি, হরিতকি, বয়ড়া, চন্দন, গোলাপকুঁড়ি, যষ্টিমধু, খস—এইগুলি পরিমাণমত নিয়ে ঝেড়ে বেছে পরিমিত উত্তাপে এক একটি করে আলাদা আলাদা ভেজে শিলে বা মেসিনে গুঁড়িয়ে এই বিখ্যাত মসলাটি তৈরী করতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মসলাটির পরিমাণ, ভাল মন্দ এবং ভাজা-ভুজির ওপর এর গুণাগুণ নির্ভর করে।

'গোটা'-মসলার ব্যবহার-প্রণালী—নিরামিষ ও আমিষ শুকতো সাধারণ মসলা-সংযোগে যে-ভাবে রাঁধেন, তেমনি সুসিদ্ধ হবার পর ঝোলশুদ্ধ আনাজগুলি একটি পাত্রে ঢেলে রেখে কড়াটি মুছে উনানে চাপাও। তাতে এক পলা তেল দাও। তেল পেকে উঠলে এই মসলা এক চামচ ফোড়ন দিয়ে তুলে-রাখা ব্যঞ্জনটুকু সমস্ত কড়ায় ঢেলে দাও। এর পর সামান্য একটু নেড়ে-চেড়ে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখ। **উচ্ছে চড়চড়ি** সিদ্ধ হয়ে জল মরে এলে তার ওপরে এই মসলা পরিমাণ মত ছড়িয়ে দিয়ে বেশ ভাজাভাজি করে নামিয়ে নেবে। **মাছের ঝাল** সিদ্ধ হয়ে জল মরে কাই-কাই মত হ'লে তার ওপরে এক পলা সরিষার তেল ছড়িয়ে দিয়ে পরিমাণ মত গোটা দিয়ে বার দুই উলটে পালটে নেড়ে-চেড়ে নামিয়ে নেবে। **গোটার ঝোল** করতে হলে আলু ও মাছ অল্প ভেজে সুসিদ্ধ করে ঝোল শুদ্ধ তুলে রাখবে। তার পর কড়ায় তেল চড়িয়ে এই মসলা ফোড়ন দিয়ে তোলা তরকারি ঢেলে

দিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে নামিয়ে নেবে। চিংড়ি, ইলিস প্রভৃতি ভাতে দিয়ে বা সিদ্ধ করে খোসা কাঁটা ছাড়িয়ে সরষের তেলের সঙ্গে এই মসলা মেখে খেতে দেবে। চাল ভাজা, মুড়ি, ডাল কড়াই ভাজা, গরম ও পান্তা ভাতে সরিষা তেল ও এই মসলা মেখে খেতে খুব মুখরোচক হয়। চার পাঁচ জনের খাদ্যে এক থেকে দু চামচে পর্য্যন্ত এই মসলা ব্যবহার করা চলে। খাবার সময় পরিমাণ মত নূন মিশিয়ে নিতে হয়। এই মসলার প্রধান গুণ হচ্ছে পরিপাক শক্তি বাড়িয়ে তোলা, আর খাদ্যকে সুস্বাদু ও সুপাচ্য করা।

গুঁড়া মসলা বা কারী পাউডার—শুকনা লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরা, গোলমরিচ, সরিষা, শুঁট, ছোট এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ, এবং পোস্তদানা—সাধারণত এইগুলিই গুঁড়া মসলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মসলাগুলি পরিমাণ মত ঝেড়ে বেছে রোদে শুকিয়ে মিহি করে গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিতে হয়। শিশিতে ছিপি এঁটে রাখলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। বিলাতী কারী পাউডারে ছোট এলাচ, ডালচিনি ও লবঙ্গর পরিবর্ত্তে Allspica নামে এক প্রকার শুষ্ক ফল দেওয়া হয়। কিন্তু এই ফল এখন দুষ্প্রাপ্য। তরকারীতে দেবার সময় গুঁড়া মসলা গরম জলে গুলে ব্যবহার করাই ভাল।

তরল মসলা—ব্যঞ্জনকে বিশেষ আস্বাদযুক্ত করতে হলে এই মসলা তৈরী করে নিতে পারা যায়। কিন্তু এটি ব্যয়সাধ্য। যথা: শুকনা লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরা, সা-মরিচ, তেজপাতা, পোস্ত, ছোট এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রি, আদা, (রুচি থাকলে অল্প পিঁয়াজ ও রশুনের কয়েকটি কোয়া মাত্র) এগুলি পরিমাণ মত মিশিয়ে ভিনিগার বা সির্কায় বেটে ‘অলিভ-অয়েলে’ ভেজে বোতলে বা কাঁচের জারে ভরে রাখবে। খুব পাতলা যেন না হয়, কৌটার জমানো দুধের মত ঘন ঘন হবে।

পাঁচ ফোড়ন—মেতি, মৌরি, জিরা, রাঁধুনি এবং কালজিরা এই পাচটি মসলা পরিমাণমত মিশিয়ে নিলে পাচফোড়ন হয়। ব্যঞ্জন সাঁতলাবার সময় এই মসলা তপ্ত তেলে ফোড়ন দিতে হয়। ফোড়নে গরম মসলাও ব্যবহৃত হয়। তরকারি বিশেষে তখন এগুলিকে থেঁতো করে নেওয়া উচিত। তেজপাতা, হিং, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতিও ফোড়নের কাজে চলে।

ব্যঞ্জনভেদে মসলার উপযোগিতা—কোন্ কোন্ মসলা কোন্ কোন্ বিশেষ ব্যঞ্জনের পক্ষে উপযোগী, কোন্ মসলাটি কি-ভাবে দিলে তরকারির স্বাদ ও গুণ বাড়ে—জেনে রাখা উচিত। বনমালা দেবী এক একটি 'পিকনিকে' এগুলি ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন ঃ

জিরা—বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বাটনা ও ফোড়নের মসলা। অড়হর, কাঁচামুগ ও ছোলার ডালে নামাবার কিছু পূর্ব্বে জিরা বেটে গরম জলে বা ঘিয়ের সঙ্গে গুলে ঢেলে দিলে সুস্বাদু ও সুপাচ্য হয়। কাঁচা আম ও ফলসার সরবতে জিরে ভেজে গুঁড়িয়ে দেবে। এর গুণ হচ্ছে—অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক। **সা-জিরে**—পলান্নের অন্যতম মসলা। কপির তরকারির প্রধান মসলা সা-জিরে। ঘিয়ে বা শুকনা কড়ায় ভেজে গুঁড়িয়ে নামাবার আগে কপির ব্যঞ্জনে দিতে হয়।

কালজিরা—ঝালের ঝোল, খেসারি মটর ও মসুরি ডালে কালোজিরার ফোড়ন দিলে সুস্বাদু হয়। যে সব মাছের আঁশ নেই—যেমন বোয়াল, ধাঁই, ট্যাংরা, সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি—কালজিরার সঙ্গে আদা বেটে মাছগুলি মাংসের মত কসে নিলে কিম্বা ফোটবার মুখে গরম জলে গুলে দিলে তরকারির স্বাদ ও গুণ বর্দ্ধিত হয়। কালজিরা—অগ্নিদীপক, বলকর, শ্লেষ্মানাশক, পিত্ত ও আম দোষ নিবারক।

কাল মরিচ—যে সব মাছে আঁসটে গন্ধ বেশি, নূনের সঙ্গে মরিচ গুঁড়ো মাখিয়ে রাখলে আঁসটে গন্ধ দূর হয়। আদার সঙ্গে মরিচগুঁড়ো সংযোগ করলে ডিমের আঁসটে গন্ধ থাকে না। মরিচের গুণে—কফ ও বায়ুনাশক, অগ্নিদীপক। শুকনা মরিচ পিত্তকর, কিন্তু পাকে পিত্ত নাশ করে।

সা-মরিচ—এই মরিচগুলি দেখতে সাদা-সাদা। তাই যে-সব ব্যঞ্জনের রং সাদা হয়ে থাকে—কাল মরিচ এবং লঙ্কা হলুদের স্থলে জিরার সঙ্গে এই মরিচ বেটে দেওয়া হয়। কাল মরিচের চেয়ে অল্প তীব্র ব'লে রোগীর ব্যঞ্জনে সা-মরিচের ঝাল দেওয়া হয়। সা-মরিচ—বিষরোগ ও নেত্ররোগ নাশক।

পিপুল—এই জিনিসটি ঝাল হলেও এর তীব্রতা অল্প ব'লে রোগীর এবং প্রসবের পর প্রসূতির ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তৈলাক্ত পাকা মাছের ব্যঞ্জনেও পিপুল মরিচের সঙ্গে মিশিয়ে বেটে দেওয়া হয়। পিপুল —পাচক, অগ্নিদীপক, ভেদক, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় বিনাশক।

ধনে—জিরা মরিচের সঙ্গে অনেকে ধনেও দুটি মিশিয়ে এক সঙ্গে বেটে ব্যঞ্জনে ব্যবহার করেন। ধনে বাটার একটা গুণ হচ্ছে, বেটে ব্যঞ্জনে দিলে শীঘ্র ব্যঞ্জন ঘন হয়। পাতলা ঝোল ঘন করতে হলে পিটুলির চেয়ে ধনে বাটা দেওয়া উচিত। কেউ কেউ একটু তেল বা ঘিয়ে গোটা ধনেগুলি ঈষৎ কষে নিয়ে তার পর গুঁড়িয়ে শিশিতে ভরে রাখেন। এই গুঁড়া ব্যঞ্জনে দিলে স্বাদ ভাল হয়। ধনে—পাচক, অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিকর ও ধারক।

মৌরি—কড়ায়ের ডাল এবং কচুরিতে আদা ও কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে বেটে ব্যবহার করলে খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়। মৌরি—পাচক, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক, অগ্নিমান্দ্য ও বমনেচ্ছা নিবারক।

মেথি—উচ্ছে করেলা পলতাদি সংযোগে তিক্ত ডালে কোন কোন ব্যঞ্জনে—যেমন পলতার ডানলা, পাকা রুই মাছের ঝোল প্রভৃতিতে—শুকনো লঙ্কা ও জিরার সঙ্গে মেথি ফোড়ন দেওয়া চলে। মেথি অগ্নিদীপক ও রুচিপ্রদ।

রাঁধুনি—এর অন্য নাম চন্ননি। পাচফোড়নের মসলা। কচু ও মাছের ঘণ্টে বিশেষতঃ ভেটকি মাছের ঘণ্টে রাঁধুনি বেটে সাঁতলাবার সময় দিলে স্বাদ ও গুণ বাড়ে। রাঁধুনি—কফ ও বায়ু নাশক, বলকর ও রুচিকারক।

হিং—কড়ায়ের ডাল এবং এক জাতীয় কচুরির বিশিষ্ট উপাদান। মৌরি, আদা ও কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে হিং বেশ মিশ খায়। আলুর দম, অড়হর ও ছোলার ডাল রান্নার পর শুধু হিং ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নিলে তার আস্বাদ খুব মুখরোচক হয়। হিং বিভিন্ন ব্যঞ্জনেই ব্যবহার চলে। এর গুণ হচ্ছে পাচক ও রুচিকারক। সাধারণতঃ হিং ফোড়নেই দেওয়া হয়। কেউ কেউ ঘিয়ে ভেজে ফোড়ন দেন, অনেকে গরম তেলে বা জলে গুলে সাঁতলাবার সময় ব্যঞ্জনে ঢেলে দেন। ঘিয়ে বা শুক্না কড়ায় হিং ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে ফোড়নে ব্যবহার করাও হয়।

পিঁয়াজ ও রসুন—এই তুটিই অত্যন্ত বলকারক এবং উপকারী মসলা। পিঁয়াজ আজকাল আনাজের সামিল হয়ে গেছে। পিঁয়াজ নানাভাবে ব্যবহার করা চলে। পিঁয়াজের সঙ্গে রসুন সামান্য পরিমাণে দিলে পিঁয়াজের গুণ আরও বৃদ্ধি পায়, গন্ধ ও স্বাদ গাঢ়তর হয়। পিঁয়াজ সিদ্ধ করে বা তেলে ঘিয়ে ভেজে নিয়ে, এমন কি অর্দ্ধসিদ্ধ এবং কাঁচা অবস্থাতেই অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত উগ্রগন্ধবিশিষ্ট ব'লে রসুন এভাবে ব্যবহার করা যায় না, আর উচিতও নয়। কোন ব্যঞ্জনে রসুন দিতে হলে অল্প ঘিয়ে রসুনের কয়েকটি

কোয়া ছাড়িয়ে উপরের শক্ত খোসা ফেলে দিয়ে নরম শাঁসগুলি অল্প থেঁতো করে ভেজে নেবে। বেশ লালচে রঙ হলে রসুনের খিঁচগুলো ছেঁকে ফেলে দিলেই ভাল হয়। ঐ ভাজা ঘি-টুকুই ব্যঞ্জনে ব্যবহার করবে। যেখানে এক পো পিঁয়াজ ব্যঞ্জনের জন্য নেওয়া হবে, একটা রসুন থেকে গুটি চারেক কোয়া নিলেই রসুনের কাজ হবে। মাছের আঁসটে ও পেঁকো গন্ধ রশুনের সাহায্যে দূর করা যায়। মাছ কুটে রসুন বাটা মেখে রাখলে কিম্বা তেলে রশুন ভেজে সেই তেলে মাছ ভাজলে ঐ গন্ধ আর থাকেনা। পিঁয়াজ ও রসুন—বলকারক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, পাচক, সারক, কণ্ঠ-শোধক, রক্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক। এই দুটি জিনিসের এতগুলি গুণ। দোষ হচ্ছে, পিত্ত বৃদ্ধি করে।

আদা—বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বিশেষ অনুষঙ্গ। বেগুন পোড়ার সঙ্গে আদার কুঁচি প্রশস্ত। কোন ব্যঞ্জনে কসবার সময়, আবার কতকগুলি নামাবার আগে আদা বাটা দিলে স্বাদ ও গন্ধের উৎকর্ষ হয়। চাটনি, আচার ও মোরব্বার প্রধান উপকরণ আদা। আদার রসে হিং ভিজিয়ে রাখলে পিঁয়াজের মত গন্ধ হয়। ব্যঞ্জনে ঐ রস দিয়ে পিঁয়াজের গন্ধবিশিষ্ট করা যায়।

সরিষা—পাঁচফোড়নের মসলা না হলেও অনেকে ছোট রাই সরিষা অল্প পরিমাণে পাঁচফোড়নের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। শাক, অম্বল, ছেঁছকি প্রভৃতিতে সরিষা ফোড়ন রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে শুকতায় (গোটা মসলার অভাবে) সরিষা ভেজে ভেঙ্গে ফোড়ন দেওয়া হয়। ছেঁছকি নামাবার সময় সরিষা বাটা দিয়ে মাখামাখি করে নিলে ছেঁছকির স্বাদ বাড়ে। ঝোলে মসলার সঙ্গে সরিষা বাটা গুলে দেওয়া চলে। শুকতোয় আদা বাটার সঙ্গে সরিষা বেটে গুলে দিলে

সুস্বাদু হয়। মাছের ঝালে অন্যান্য মসলার সঙ্গে সরিষা বাটা ব্যবহার করা হয়। চালতা, আমড়া, কাঁচা তেঁতুল, ইলিশ মাছ প্রভৃতির অম্বলে সরিষা বাটা একটা অপরিহার্য্য মসলা। অম্বল ফোটবার সময় সরিষা বাটা দিতে হয়। ওল ভাতের প্রধান উপকরণ সরিষা বাটা। সরিষা—কফ বাত নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক, কিন্তু রক্তপিত্তকারক।

লঙ্কা—ব্যঞ্জনের প্রধান মসলা বললে অত্যুক্তি হয় না। লঙ্কা ভিন্ন বাঙ্গালীর ব্যঞ্জন হয় না। লঙ্কার বদলে কালমরিচ ব্যঞ্জনে দিলে ঝাল হয় বটে, কিন্তু লঙ্কার কাজ তাতে হয় না, ব্যঞ্জনের বর্ণও খোলে না। লঙ্কা রোগ প্রতিষেধক, বাতঘ্ন, রুচি ও বলকারক এবং চর্ম্মরোগ নিবারক। **কাঁচা লঙ্কায়** প্রচুর পরিমাণে 'ভিটামিন' বা খাদ্য প্রাণ থাকে। অড়হর, মটর ও খেসারী ডালে, সিদ্ধ ও পোড়ায়, সরিষাবাটা সংযুক্ত ব্যঞ্জনে এবং ইলিস মাছের সম্পর্কে কাঁচা লঙ্কা ব্যবহৃত হয়। **শুকনো লঙ্কা** মুগের ডাল, কালিয়া এবং চাটনিতে প্রশস্ত। উড়িষ্যায় লঙ্কা বিচির সঙ্গে সরিষা মিশিয়ে ব্যঞ্জনে ফোড়ন দেওয়া হয়। এরই নাম—হাঁড়ি ফোড়ন। মসলায় লঙ্কা পরিমিতরূপে ব্যবহার করা উচিত। অতিরিক্ত লঙ্কার ঝাল ব্যবহার করলে পরিপাক শক্তির হানি হয়ে থাকে। প্রায় সব রকম ডালেই কাঁচা লঙ্কা অভাবে শুখনা লঙ্কা ফোড়ন দেওয়া হয়। শাক ভাজা, ছেঁছকি ও চড়চড়িতে শুখনা লঙ্কার ফোড়ন দিলে আস্বাদ ভাল হয়।

হরিদ্রা—প্রচলিত ভাষায় হলুদ বলা হয়। এই জিনিসটি ছেঁছকি, থোড়ের ডালনা, ঝিঙ্গা কাঁকুড়ের ডালনা, লাউএর রায়ভা এবং পেঁপের ডালনা ছাড়া আর সব ব্যঞ্জনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হলুদ মাছের আঁসটে গন্ধ দূর করে। ইলিশ ছাড়া আর সব মাছ কুটে ধুয়ে নূন হলুদ মাখিয়ে

রাখলে মাছে নুন বসে এবং আঁসটে গন্ধ দূর হয়; লঙ্কার মত হলুদও ব্যঞ্জনের বর্ণকারক এবং রোগ প্রতিষেধক।

তেজপাতা—কড়াইশুঁটি, আলুপটল ও ওলের ডালনায় বেটে দিলে ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয়। ডাল, ঝোল, ডালনা, ঘণ্ট এবং আমিষ ব্যঞ্জনে তেজপাতা ফোড়ন অপরিহার্য্য। গরম মসলা না পড়লে অনেকেরই মন খুঁত খুঁত করে। কিন্তু সঙ্কটকালে বা গরম মসলার অভাবে তেজপাতা চন্দনের মত বেটে নিয়ে যেভাবে গরম মসলা দেওয়া হয় সেই ভাবে ব্যবহার করলে ব্যঞ্জনের স্বাদের বিশেষ তারতম্য হয় না। ইহা অরুচি ও কফ বায়ু নাশক।

গরম মসলা—ছোটএলাচ, লবঙ্গ ও দালচিনি সাধারণতঃ 'গরম মসলা' নামে পরিচিত। কতকগুলি ব্যঞ্জনে গরম মসলার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। ছোলা ও মুগের ডালে. ডালনা, ঘণ্ট, দম, কালিয়া, খিচুড়ি, পলান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে গরম মসলা ব্যবহার করা হয়। মুগের ডালে অনেকে শুধু ছোটএলাচ ফোড়ন দিয়ে থাকেন। কই মাছের ব্যঞ্জনে লবঙ্গ বাটা দিলে তার আস্বাদ অত্যন্ত রুচিকর হয়।

জায়ফল ও জৈত্রী—কোর্ম্মা ও কারিতে জায়ফল অন্যান্য মসলার সঙ্গে বেটে দিলে খুব মুখরোচক হয়। ঘৃতপক্ক মিষ্ট ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্নে ব্যবহৃত হয়।

বড়এলাচ—মিষ্টান্নে ব্যবহৃত হয়।

জাফরাণ—এর অন্য নাম কেশর ও কুঙ্কুম। সুপ, কাবাব, পলান্ন, খিচুড়ি, কারী প্রভৃতিতে হলুদের স্থলে ব্যবহৃত হয়। ঘন দুধ, ক্ষীর বা দধিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে জাফরাণের রং খোলে, তখন বেশ করে গুলে ব্যঞ্জনে মিশিয়ে দিতে হয়।

পোস্তদানা ও তিল—এ দুটিও বেটে ব্যঞ্জনের সঙ্গে মসলা

রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পোস্ত ও তিল উভয়ই খুব পুষ্টিকর। তিলবাটা নিম ঝোল ও কোন কোন ডালনায় দেওয়া হয়। পোস্ত বাটার সংযোগে বড়া, শুকতো, ঘণ্ট প্রভৃতি ব্যঞ্জনের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। দুই এক চামচ আলো চাল ভিজিয়ে সেই সঙ্গে পোস্তদানাগুলি বেটে নেওয়াই ভাল। লাউ কুমড়া ও অমৃতমানের পাতায় মুড়ে নুন ও লঙ্কা সংযোগে পোস্তবাটা পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে স্বতন্ত্র খাদ্য প্রস্তুত হয়।

মসলা নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ প্রণালী—মসলা নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ-প্রণালীর উপর ব্যঞ্জনের বর্ণ,আস্বাদ ও উপকারিতা নির্ভর করে। ব্যঞ্জনের জন্য মসলা বেটেই নাও কিম্বা গুঁড়াই কর—আগে মসলাগুলি বেছে পরিস্কার করে নিতে হবে। এক ঘটি দুধে একবিন্দু চোনা পড়লে যেমন দুধ বিকৃত হয়, মূল্যবান সুগন্ধ মসলার মধ্যে যদি একটি ইঁদুরনাদি বা আরশুলার ডিম থাকে—সে মসলা দেওয়া সমস্ত ব্যঞ্জনও বিস্বাদ হয়ে যায়। কাজেই, খুব সন্তর্পণে মসলাগুলি বেছে বেটে বা গুঁড়িয়ে নেবে। ভাগে একটু কম বেশী হলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু বাছা না হলে সবই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মসলা বাটতে হলে অল্প জলে ভিজিয়ে রাখলে সহজে বাটা যায়। বাটনায় খিঁচ যেন না থাকে, চন্দনের মত মিহি হওয়া চাই। গুঁড়া করতে হলেও আগে মসলাগুলি বেছে রোদে বা আগুনের অল্প তাপে তাতিয়ে নেবে, তারপর মিহি করে গুঁড়িয়ে কাপড়ে ছেঁকে নেবে। বাটা মসলা ভাল করে চাপা দিয়ে এবং গুঁড়া মসলা শিশি বা জারে ভরে ছিপি এঁটে রাখবে।

বাটা মসলা তরকারি জ্বালে চড়িয়ে কসবার মুখেই ভাল করে মিশিয়ে দিতে পার। তাহলে মসলা তরকারির সঙ্গে বেশ ভাজাভাজি হবার সুযোগ পাবে।

গরম মসলা যদি বেটে ব্যবহার করতে চাও, ব্যঞ্জন উনানে চড়াবার

পরে অল্প জলে বেটে নিয়ে একটি পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখবে। আর যদি গুঁড়িয়ে নাও, শক্ত কাগজ বা শিশির মধ্যে এমনভাবে রাখবে যেন হাওয়া না লাগে। ব্যঞ্জন হয়ে এলে উনান থেকে নামিয়ে ব্যঞ্জনে গরম মসলা দিয়ে ব্যঞ্জন-পাত্র ঢাকা দিয়ে রাখবে।

ব্যঞ্জনের বর্ণ খুব উজ্জ্বল করতে হলে পাত্রে তেল বা ঘি চড়িয়ে আদাবাটা ছেড়ে দেবে। আধা ভাজা হয়ে এলে তাতে অল্প চিনি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বাটা বা গুঁড়া মশলা অল্প জলে গুলে ঐ ভাজার ওপর আস্তে আস্তে ঢেলে দেবে। কিছুক্ষণ ভাজাভাজির পর জল দেবে। ফুটে উঠলে ভাজা আনাজ ও মাছ ছেড়ে দেবে। পিঁয়াজ দিতে হলে আগে ভেজে তুলে রাখবে, আনাজ ও মাছ দেবার খানিক পরে ব্যঞ্জনে নুন দেবার সময় ঢেলে দেবে।

খাদ্য-সম্ভার

শর্করাজাতীয় খাদ্য (কার্ব্বো-হাইড্রেট)

ধান গম যব জই ভুট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যজাত এবং আলু মিষ্টআলু কচু, ওল কাঁচকলা প্রভৃতি সমপর্য্যায়ভুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যগুলি রন্ধনোপযোগী করিবার ব্যবস্থা ও প্রণালী।

এদের রাসায়নিক উপাদান—আগেই বলা হয়েছে এগুলি শর্করাজাতীয় খাদ্য। এই সকল খাদ্যের মধ্যে যে শ্বেতসার (starch) আছে, সে সমস্তই চিনিতে পরিণত হয়ে আমাদের দেহের তাপ বাড়িয়ে কর্ম্মশক্তি সঞ্চার করে। তাই, এই জাতীয় খাদ্যগুলির রাসায়নিক উপাদান পরীক্ষার পর স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ শর্করা বা চিনি জাতীয় খাদ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। খাদ্যের ভিতরকার starch বা শ্বেতসার এবং চিনি প্রভৃতি সারবান পদার্থগুলিকেই ইংরাজীতে 'কার্ব্বো-হাইড্রেট' বলা হয়ে থাকে। ডাল জিনিসটি যদিও শস্যজাত খাদ্য এবং তাতে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা আছে সত্য, কিন্তু ডালে মাছ মাংসের মত ছানা বা প্রটিনের ভাগ থাকায় খাদ্য-বিজ্ঞান অনুসারে ডালকে ছানাজাতীয় বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই শস্যজাত হয়েও ডাল মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি পুষ্টিকর আমিষ খাদ্যের দলে (ইংরাজীতে যাকে 'প্রটিন' বলা হয়) স্থান পেয়েছে। সুতরাং আমরাও 'প্রটিন' বা ছানাজাতীয় খাদ্য রন্ধনের অধ্যায়ে ডালের উল্লেখ করব। এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। বনমালা দেবী পিকনিকের সময় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে শর্করাজাতীয় খাদ্যগুলি যেমন আমাদের দেহের তাপ বৃদ্ধি করে, তেমনই চর্ব্বি বা মাখনজাতীয়

খাদ্যগুলিরও এই গুণ আছে। ঘি, মাখন, তেল, চর্ব্বি প্রভৃতি স্নেহ পদার্থগুলিই 'চর্ব্বি (fat) জাতীয়' ব'লে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে চিহ্নিত। কাজেই শর্করাজাতীয় খাদ্যগুলির সঙ্গে এই তৈলাক্ত খাদ্যগুলির সংযোগে গুণ বা শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের দেহযন্ত্রগুলি কর্ম্মক্ষম থাকে। এজন্য রান্না করবার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে, রান্না করা খাদ্যের প্রাণই হচ্ছে এই তৈলময় স্নেহদ্রব্যগুলি—ঘি, তেল, মাখন, চর্ব্বি, ডিমের কুসুম প্রভৃতি।

ধান থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য

ধান আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান কৃষি-সম্পদ। ধানই ভেজে খই হয়; ধান থেকে চাল ও চিঁড়ে প্রস্তুত হয়; পল্লীগ্রামের মেয়েরা সযত্নে ধানের পাট শিক্ষা করে। ধান থেকে কি করে খই হয়, চাল হয়, চিঁড়ে হয়—সহরের মেয়েদেরও জেনে রাখা উচিত।

ধানভেজে খই করবার প্রণালী—প্রথমে ধানগুলি ঝেড়ে বেছে অল্প জল মাখিয়ে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বিছিয়ে দিতে হয়। পাড়াগাঁয়ে মাটির মেঝেই এর পক্ষে প্রশস্ত। সহরে সিমেণ্টের মেঝের উপরে ভিজে 'ন্যাতা' বুলিয়ে ধান মেলে দেওয়া চলে। এইভাবে আধঘণ্টা আন্দাজ রেখে ধানের গায়ের জল মরে গেলে ভাজবার উপযুক্ত হবে। ধান ভাজবার জন্য মাটির পাত্রই প্রশস্ত। বাজারে ভাত রাঁধবার জন্য যে তোল হাঁড়ি পাওয়া যায় সেই হাঁড়ির একদিকের খানিকটা ভেঙ্গে ধান চাল ভাজবার 'খোলা হাঁড়ি' করে নিলে ভাজার পক্ষে সুবিধা হয়। এর অভাবে লোহার কড়াতেও ধান চাল ভাজা চলে। ধান চাল ভাজবার জন্য এক গোছা নারিকেল কাঠি হাতখানেক লম্বা

অবস্থায় ঝাঁটার মত বেঁধে নেবে; বাঁধন অবশ্য আল্‌গা হবে। একে 'কুঁচি' কাঠি বলে। খোলা থেকে এই 'কুঁচি' দিয়ে ধান ভাজা, খই, চাল ভাজা বা মুড়িগুলি টেনে টেনে নীচে ফেলতে হয়, সমস্ত ভাজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খোলা উনানেই থাকবে।

ভাজবার প্রণালী—পাত্রে বালি দিয়ে উনানের আঁচে চড়াও, জ্বাল একটু কড়া হবে। বালি বেশ তেতে উঠলে সেই তপ্ত বালির ওপর অল্প অল্প ধান ছেড়েই কুঁচি কাঠি দিয়ে নাড়তে থাকবে। একটু পরেই ধানগুলি যেই চড়বড় করে খই হয়ে ফুটে উঠবে, তখন ঐ কুঁচি দিয়েই টেনে টেনে নীচে সামনের দিকে ফেলবে। সেখানে একটা চ্যাটাই বা কোন পাত্র পেতে রাখতে পার। ভাজা শেষ হলে খোসাশুদ্ধ খইগুলি চালুনিতে ঝাড়লে খোসাগুলি তার ছিঁদ দিয়ে গলে পড়ে যাবে। তখন খইগুলি পাত্রে ভরে মুখ বন্ধ করে রাখবে। ধানের এই খোসাগুলিকে খৈছাড়া বলে। এগুলিও কাজে লাগানো চলে। কুলায় ঝাড়বার পর যে ভারি ধানগুলি থাকবে, সেগুলি ঢেঁকি বা হামান দিস্তায় কুটে আস্তে আস্তে ঝেড়ে নেবে। খোসাগুলো উড়ে গিয়ে যে গুঁড়া অংশ থাকবে, সেগুলি চালভাজার গুঁড়া; তার সঙ্গে নারকেল কুরা, গুড় ও মরিচ গুঁড়া মেখে নাড়ুর মত পাকিয়ে একটি পুষ্টিকর মুখরোচক জল খাবার করা যায়। পল্লী অঞ্চলে এই নাড়ুর নাম—**ভোন্দো**। খৈএর অবশিষ্ট খোসাগুলির সঙ্গে কয়লার গুঁড়া আর মাটি মিশিয়ে যে গোলা তৈরী হবে, তার আঁচ বেশ জোর হয় আর ধানের খোসা থাকার শীঘ্র ধরে।

কণকচূড় ও শঙ্খচূড় ধানের খই খুব ভাল হয়।

ভুট্টা, জৈ—প্রভৃতি শস্যের খই এই প্রণালীতেই হয়ে থাকে।

খইএর মুড়কি—চিনি ও গুড়ে মুড়কি তৈরী করা হয়।

আজকাল চিনি দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং গুড় দিয়েই মুড়কি করা ভাল। সাদা চিনির চেয়ে গুড় যে শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত খাদ্যবিদ্‌রা একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত ডাঃ বেণ্টলী সাহেব যখন এদেশে স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, মুক্তকণ্ঠে তিনি গুড়ের গুণকীর্ত্তন করে বলতেন—সাদা চিনির চেয়ে গুড় অনেকাংশে ভাল। তাঁর মতে সাদা ময়দা আর সাদা চিনি দেখতে ভাল হ'লেও একেবারে অন্তঃসারশূন্য। এইজন্য মেয়েদের পিকনিকে বনমালা দেবী এই সব নজির দেখিয়ে তাঁর ছাত্রীমহলে গুড়কেই চালু করেছেন। তা বলে চিনির রসে মুড়কি করবার প্রণালী যে শেখাননি তা নয়। প্রণালী দুয়েরই প্রায় সমান।

মুড়কি করতে হলে প্রথমে খইগুলিকে ঝেড়ে বেছে নিতে হবে। খইগুলি বেশ ফুলো ফুলো টাটকা ঝরঝরে হলে মুড়কিও সেই রকম হবে। রসে ফেলে পাক করবার আগে খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে খইগুলি মেখে নিলে মুড়কির স্বাদ ভাল হয়। যে পরিমাণ খই, তার সিকি পরিমাণে চিনি বা গুড় নিতে হবে। ধর, আধসের খই নিয়েছ মুড়কি করবার জন্যে; এখানে গুড় বা চিনি নিতে হবে ঠিক দুসের। এই চিনি বা গুড়ে সমপরিমাণ জল দিয়ে একটি পাত্রে জ্বালে বসাও। জলটুকু ম'রে রস ঘন হয়ে এলে ফোঁটা কয়েক তুলে দুই আঙ্গুলে টিপে যদি দেখ চিটে-ধরা গোছের অর্থাৎ আটা আটা মত হয়েছে, তখন পাক-পাত্র নামিয়ে ফেল। এখন ঐ পাত্রের গায়ে অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে খন্তা বা কাঠের তাড়ুর দ্বারা নাড়তে থাক। এই ভাবে নাড়া বা ঘোঁটাকেই বলে 'বিচ মারা।' এর পর খইগুলি অল্প অল্প করে ঐ রসে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তাড়ু দিয়ে মাখাতে থাক। এরই ফাঁকে মাঝে মাঝে পাত্রের চারধারে সামান্য পরিমাণে দুটি দুটি ময়দা ছড়িয়ে মাখামাখি করে নিলে মুড়কিগুলি গায়ে গায়ে মিশবে না, বেশ ঝরঝরে হবে। এখন অল্প ঘি,

সুঁট চূর্ণ, ছোটএলাচ গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া প্রভৃতি রুচি অনুসারে মিশিয়ে আরও সুস্বাদু করে নিতে পার।

শুধু চিনি দিয়ে মুড়কি করতে হলে সমপরিমাণ জলের সঙ্গে চিনি জ্বালে বসিয়ে রস করে নিতে হবে।

চিনির সঙ্গে গুড় মিশিয়ে রস করতে হলে চিনিতে সের করা আধ-পো গুড় মিশিয়ে এর অর্দ্ধেক জলে গুলে জ্বালে চড়াবে রসের জন্যে।

গুড়ের মুড়কিতে বারো আনা ভাগ মাত বা ঝোলা গুড়ের সঙ্গে সিকি ভাগ দানা অর্থাৎ সারগুড় মিশিয়ে জ্বালে চড়ালে আর জল দিতে হয় না। তবে মাতগুড় একটু বেশী ঘন হলে অল্প পরিমিত জল দেওয়া চলে।

শুধু সারগুড়ের মুড়কিতে গুড়ের রস করবার জন্যে সের করা এক-পো থেকে আধসের জল দিতে হবে।

খুব সাদাসিধা বা সহজ উপায়ে পাতলা গুড়ের মুড়কি করতে হলে একটা পাত্রে পাতলা গুড় জ্বাল দিয়ে আটা আটা হয়ে এলে নামিয়ে রাখবে। একটু ঠাণ্ডা হলে ঐ গুড় অল্প অল্প করে—অপর একটি পাত্রে তেল-মেখে-রাখা-খইগুলির উপর ছড়িয়ে তাড়ু দিয়ে নাড়তে থাকবে, আর মাঝে মাঝে চারপাশে দুটি দুটি ময়দা ছড়িয়ে মাখামাখি করে দেবে। এরপর সুঁটের গুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে নেবে।

খই-নাড়ু—চিনি বা গুড়ের রসে রসের সিকি পরিমাণ বাছা খইগুলি মিশিয়ে তাড়ু দিয়ে অনবরত নাড়তে থাক। যখন দেখবে খইগুলি গুঁড়িয়ে রসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে চিট ধরেছে, তখন কড়া নামিয়ে অল্প পরিমাণে গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দেবে। পরে সুঁট ও গরম মসলার গুঁড়া মিশিয়ে তাড়ু দিয়ে নাড়তে থাকবে। বেশ মিশে হাত-সওয়া মত হয়ে এলে নাড়ু পাকিয়ে চিনি মাখিয়ে নেবে।

খই-মণ্ড—ফুটন্ত জলে প্রয়োজনমত খই ছেড়ে দাও। পাঁচ ছয়

মিনিটের মধ্যেই খইগুলি গলে যাবে। তখন একখণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে অল্প চিনি ও নেবুর রস মিশিয়ে খেতে দেবে।

খইয়ের ক্বাথ—জল অল্প গরম করে প্রয়োজনমত খইগুলি ভিজিয়ে দেবে। গলে যাবার মত হলে, চটকে একখণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নেবুর রস ও চিনি মিশিয়ে খেতে দেব।

খইমণ্ড ও ক্বাথ রুগ্ন শিশু ও রোগীর বলকারক পথ্য। সুস্থ শরীরেও মুখরোচক খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে।

খইয়ের মোয়া—চিনি বা গুড়ের রস চিট ধরে এলে নামিয়ে বিচ মেরে রসের পরিমাণমত খই দিয়ে নাড়তে থাকবে। বেশ মাখামাখি হয়ে এলে অল্প ঘি এবং গরম মসলা চূর্ণ মিশিয়ে গোল গোল করে পাকিয়ে নেবে। পাকাবার সময় হাতে একটু ঘি মাখিয়ে নেবে।

ধান থেকে মুড়ির চাল তৈরী করবার প্রণালী—ধানগুলি ঝেড়ে বেছে অল্প জলে ভাপিয়ে নাও। অর্থাৎ হাঁড়িতে অল্প জল দিয়ে ধানগুলি ঢেলে দেবে। তলার জল ফুটে হাঁড়ির মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুতে থাকলে আরও মিনিট দশেক রেখে তার পর একটা মাটি বা কাঠের একটা বড় গামলায় ভাপানো ধানগুলি ঢেলে দাও। উত্তাপ মরে এলে ধানগুলির উপর ঠাণ্ডা জল এমন পরিমাণে ঢালা চাই—ধানগুলি ডুবে থাকে। চার দিন এইভাবে ভিজবে, কেবল প্রত্যহ গামলার জল পালটে দিতে হবে। পঞ্চম দিনে পাত্র থেকে ভিজা ধানগুলি ছেঁকে নিয়ে একটা বড় হাঁড়িতে চাপিয়ে উনানে অল্প আঁচে বসাও। ছাঁকবার সময় অল্প দল্প যে জল ধানের সঙ্গে হাঁড়িতে পড়বে তা ছাড়া আর আলাদা জল দেবে না। খানিক পরে চারপাশ দিয়ে যখন ভাপ বেরুতে থাকবে এবং ধানের মুখগুলি ফেটে ফেটে এসেছে দেখবে, তখন নামিয়ে নিয়ে 'তাপে বাতে' শুখিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ খুব কড়া

রোদে শুখালে ভানবার সময় চাল ভেঙ্গে যাবে। ঝিমে রোদের তাপে ও গরম বাতাসে ধানগুলি শুকিয়ে নেওয়াই নিয়ম। এবার ঢেঁকিতে ভেনে নিলেই মুড়ির চাল তৈরী হল। এই প্রণালীতে তৈয়ারী চালে মুড়ি খুব বড়, নরম ও সুস্বাদু হয়। স্থান বিশেষে—ধানগুলি সিদ্ধ করে ধানের মুখ ফাটা ফাটা হলে নামিয়ে অন্য পাত্রে দশ বারো ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তার পর ছেঁকে ভাপিয়ে নিয়ে তাপে-বাতে শুখাবার পর ভেনে নেওয়া হয়।

মুড়ির চাল থেকে মুড়ি ভাজবার প্রণালী—চালগুলিতে অল্প জল ছড়িয়ে পরিমাণমত নুন মেখে তিজেল জাতীয় বড় হাঁড়িতে মাঝারী আঁচে উনানে বসাও। তখন একটা মোটা কাঠি দিয়ে অনবরত নাড়াচাড়া করতে থাক। যখন ভাজাভাজি হয়ে চালগুলি পিট্‌পিট্ করে উঠবে ও সোঁধা সোঁধা গন্ধ বেরুবে, সেই সময় দু'চারটে চাল দাঁতে চাপলে যদি চিঁড়ের মতন চিপটে যায়, বুঝবে চাল তৈরী হয়েছে। পরে এই চাল খোলায় তপ্ত বালিতে দিয়ে 'খুঁচি' দিয়ে ভাজলেই মুড়ি হবে।

ধান থেকে চিঁড়া তৈরীর প্রণালী—ধানগুলি ঝেড়ে বেছে গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে অন্ততঃ ১০।১২ ঘণ্টা। এর পর ছেঁকে তুলে নিয়ে তাপে বাতে শুখিয়ে ঢেঁকিতে কুটে নিতে হবে। কোটা ধানগুলি ঝেড়ে নিলেই চিঁড়ে হবে।

খই মুড়ি চিঁড়ার গুণ—বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বায়োকেমিক্যাল বিভাগ থেকে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে, খই, মুড়ি, চিঁড়া প্রভৃতি শস্যজাত প্রত্যেক খাদ্যটিতে বিস্কুট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 'বি' ভিটামিন আছে। বি-ভিটামিনের অভাবে চর্ম্মরোগ, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতা এর উপর যথেষ্ট

নির্ভর করে। সেইজন্য বনমালা দেবীর নির্দ্দেশে মেয়েদের পিকনিকে বিস্কুটের বদলে খই, মুড়ি, চিঁড়াই জলযোগের খাদ্য রূপে নির্ব্বাচিত হয়েছে। এক এক দিন এক একটি জিনিস নূতন নূতন উপাদান যোগে উপাদেয় করে খাবার ব্যবস্থা আছে। উপাদানগুলি হচ্ছে নারিকেল, গুড়, ছোলা, চিনাবাদাম, শশা, পিঁয়াজ, আদা-কুঁচি, কাঁচা লঙ্কা এই সব। চিঁড়া, মুড়ি, খই পাল্টাপাল্টি করে ভেজে নেওয়া হয় যেমন, অনুপানগুলিও তেমনি এক একদিন এক এক রকম হয়ে থাকে। কোনদিন হয়ত নারিকেল কুরে নেওয়া হ'ল, কোন দিন বা নারিকেলের শক্ত শাঁসগুলি কুঁচিয়ে প্রধান খাদ্যটির সঙ্গে মিশিয়ে তার স্বাদে নূতনত্ব আনা হল, কোনদিন বা নারিকেল ভেজে নেওয়া হল। ছোলা, কড়াই, চিনাবাদামও এমনি ভেজে, সিদ্ধ করে বা কাঁচা অবস্থাতেই খাদ্যের সাথী করা হয়। এই সঙ্গে গম এবং যবের আরও দুটি খাদ্যকেও মেয়েদের পিকনিকে জলখাবারে চালু করা হয়েছে। তাদের কথা যথাস্থানে পাবে।

চিঁড়ার চাকতি—মুড়কির রস যেভাবে তৈরী করবার কথা বলা হয়েছে, রসটুকু সেই ভাবে চিটচিটে হয়ে এলে পাকপাত্র নামিয়ে একটা বিড়ের উপরে রাখ। রসের পরিমাণ মত ভাজা চিঁড়ে ঐ তপ্ত রসে ফেলে ক্রমাগত তাড়ু বা খুন্তি দিয়ে নাড়তে থাক। হাত সওয়া মত হয়ে এলে হাতে একটু ঘি মাখিয়ে রসাক্ত চিঁড়াগুলি হাতের তেলোয় চেপে চেপে ইচ্ছামত চাকতির আকারে এক এক খানি করে গড়ে ফেল।

চিঁড়ার চিত্তহরণ—এটি সৌখিন খাদ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ। প্রস্তুত প্রণালীও একটু শক্ত। প্রথমে চিঁড়াগুলি জলে ভিজিয়ে দাও। ফুলে উঠলে জল থেকে ছেঁকে তুলে ছানার সঙ্গে শিলে বেটে নাও।

যে পরিমাণ চিঁড়া, ছানার পরিমাণ তার অর্দ্ধেক হলেই হবে। এখন ছানা যতটুকু নিয়েছ, তার অর্দ্ধেক নাও ভাল আটা বা ময়দা (বনমালা দেবী ময়দার স্থলে কিন্তু বিশুদ্ধ আটার ব্যবস্থা দেন)। ধর, ছানা এক পো নিলে, ময়দা বা আটা চাই আধ পো। আটাগুলি ময়ান দিয়ে মেখে তারপর ঐ চিঁড়া ও ছানার মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে খুব ভাল করে খেসে মাখ। এবার লুচির নেচির মত আকারে একটু চ্যাপ্টা করে গ'ড়ে প্রত্যেকটির উপরে কাঠি দিয়ে বা খন্তির মুখ দিয়ে চার পাচটি বিঁধ করে ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ফেল। ঘণ্টা তিনেক পরে তুলে পরিবেষণ করবে।

চিঁড়ের কচুরি—এর উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী প্রায়ই উপরে লিখিত খাদ্যটির মতই। পার্থক্য টুকু এই প্রকার :—খোয়া ক্ষীর ভেঙ্গে তার সঙ্গে ছোট এলাচগুঁড়া, অল্প চিনি, বড় এলাচ দানা, কিসমিস, পেস্তাচূর্ণ ও দুফোঁটা গোলাপী আতর মিশিয়ে খুব ভাল ক'রে থেসে থেসে পূরটি আগে তৈরী করে রাখবে।

চিঁড়ের মণ্ডের লেচিগুলি ঠুলির মত করে তাতে ঐ পূর দিয়ে কচুরীর মত আস্তে আস্তে বেলে ঘিয়ে ভেজে নেবে। এই ভাজা জিনিসটিই হচ্ছে—চিঁড়ের কচুরী। ইচ্ছা করলে একে রসেও ফেলতে পার। তখন হবে—রস-বড়া।

চিঁড়ালুর মোহনপুরি--প্রয়োজনমত চিঁড়া ফুটন্ত জলে দাও। অল্পক্ষণ পরে জলটুকু ফেলে দিয়ে চিঁড়াগুলি একটি পাত্রে ঢেলে রাখ। এর আগে চিঁড়ার পরিমাণমত রাঙ্গা বা সকরকন্দের মিষ্ট আলু সিদ্ধ করে এবং পূরটি প্রস্তুত করে রাখবে। এখন চিঁড়ার সঙ্গে সিদ্ধ আলু একসঙ্গে চটকে মেখে ঠুলি তৈরী কর; ঐ ঠুলির মধ্যে তৈয়ারী পূর (নারিকেলকুরা চিনি বা গুড়ে পাক করে

এবং ক্ষীর পেস্তা বাদাম কিসমিস প্রভৃতি মিশিয়ে কিম্বা গোলাপী আতর এবং পেস্তা বাদাম কিসমিস যুক্ত ক্ষীর ছানার পুর) দিয়ে খোলটি মুড়ে ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ফেল। ঘণ্টা দুই পরে খাবার উপযুক্ত হবে।

চিঁড়ে-কমলা—উপকরণ: দুধ /১৷৷০, মিছরি /৷৵০, উৎকৃষ্ট চিড়া /৵০, খোয়া ক্ষীর /৷০, পাঁচটি কমলা লেবু, কিসমিস আধছটাক, পেস্তা ও বাদাম আধ ছটাক, ছোট এলাচ ছয়টি, ঘি ও সামান্য নুন। প্রস্তুত প্রণালী:—পেস্তা বাদামগুলিকে ভিজিয়ে সরু সরু করে কেটে রাখ, লেবুর খোসা আর বিচি ছাড়িয়ে কেবল ভিতরের দানাগুলিকে নিয়ে একটা কাচ বা কলাইয়ের পাত্রে রাখ। চিঁড়াগুলি ভাল করে বেছে ঘি মাখিয়ে আর একটা পাত্রে রাখ। উনানে একটা পাত্রে একপোয়া জল গরম করে তাতে দুধ আর চিঁড়াগুলি ঢেলে দাও। চিঁড়া সিদ্ধ হয়ে গেলে মিছরি, খোয়াক্ষীর আর সামান্য একটু নুন দাও। বেশ ঘন হয়ে এলে নামিয়ে কিসমিস, বাদাম ও পেস্তাগুলি ঢেলে দাও। অল্প গরম থাকতে নেবুগুলি মিশিয়ে হাতা দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাক। তারপর এলাচ গুঁড়া ছড়িয়ে দাও।

ধান থেকে ভাতের চাল প্রস্তুত প্রণালী—আমরা সাধারণত দু রকম চাল ব্যবহার করে থাকি। আতপ ও সিদ্ধ। ধান থেকেই এই দুই জাতীয় চাল তৈরী করা হয়। চাল তৈরী করবার প্রণালীও তোমাদের জেনে রাখা উচিত।

আতপ চাল তৈরী করবার প্রণালী -প্রথমে ধানগুলি ঝেড়ে-বেছে চট বা চাটাই পেতে তার উপরে বিছিয়ে দিয়ে প্রখর রোদের তাপে শুখিয়ে নিতে হয়। মাঝে মাঝে ধানগুলি উলটে-পালটে দেওয়া চাই। রোদের তাপ অনুসারে শুখাবার সময় নির্ভর করে। ভাল রোদ পেলে একদিনেই ধান শুখিয়ে নেওয়া যায়। ধান ঠিক শুখিয়েছে

এবং ঢেঁকিতে ভেঙ্গে নেবার মত হয়েছে কিনা জানবার জন্যে গুটি কতক ধান চট থেকে তুলে অল্প পিষতে হবে। তাতে যদি দেখা যায় দানাগুলি না ভেঙ্গে গোটা গোটা আছে, ধান ঠিক মত শুখিয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়, ধানগুলি খুব বেশী শুখিয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। এমনি, ধান রগড়ালে বা অল্প পিষলে যদি দানা না বার হয়, বুঝতে হবে যে এখনো ঠিক মত শুখায় নি। যাই হোক, ধান ঠিক মত শুখিয়েছে বুঝলে ঢেঁকিতে ছেঁটে বা 'ভেনে' নিলে যে চাল তৈরী হবে, তাকেই আতপ বা আলো চাল বলা হয়। ঢেঁকির সাহায্যে ধান থেকে চাল তৈরী করার প্রণালীকে ধান 'ভানা' 'ছাঁটা' বা 'কোটা' বলা হয়। ধান ভানবার সময় গড় থেকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ভাঙ্গা ধান তুলে কুলোয় করে ঝেড়ে পুনরায় গড়ে দিলে চালগুলির কুঁড়ো ছেড়ে যায় এবং বেশ পরিষ্কার ও ঝর ঝরে হয়।

সিদ্ধ চাল তৈরী করবার প্রণালী—এই চাল সিদ্ধ করে নেবার দু-রকম প্রণালী আছে। কতকগুলি ধান একবার সিদ্ধ করে শুখিয়ে ঢেঁকিতে দেওয়া হয়। আবার কতকগুলি দুইবার সিদ্ধ করে ভানবার উপযুক্ত করে নেওয়া হয়। এ জন্য এই প্রণালীতে প্রস্তুত চালকে 'দু' সিদ্ধ'ধানের চাল বলা হয়। মোটা ধানগুলিই এভাবে দুবার সিদ্ধ করা হয়ে থাকে।

আতপ চাল তৈরী করবার জন্য ধান ভিজাতে বা সিদ্ধ করতে হয় না। সিদ্ধ চালের ধানগুলি—ধানের প্রকৃতি বুঝে ১২ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ভিজিয়ে রেখে তার পর সিদ্ধ করা হয়ে থাকে। সরু ধান সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় একটা বড় গামলায় ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে জ্বালে চড়াতে হয়। প্রথমে ভিজা ধানগুলি গামলার জল থেকে ছেঁকে ছেঁকে সিদ্ধ করবার হাঁড়িতে ভরতে হবে। ছেঁকে তোলবার সময় ধানের সঙ্গে

অল্প অল্প যে জল উঠবে, ঐ জলেই ধানগুলি সিদ্ধ হবে। এক সঙ্গে বেশি ধান সিদ্ধ করতে হলে, উপরের হাঁড়ির নীচে মুখভাঙ্গা আর একটা হাঁড়িতে ভিজে ধানগুলি ঐ ভাবে ভর্ত্তি করে বসালে দুটো হাঁড়ির ধানগুলি এক সঙ্গেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। সিদ্ধ হতে থাকলে ভাপ বার হতে থাকে। এরপর উপর থেকে ধানগুলি যেই ঝরে ঝরে পড়বে, তখনই বুঝতে হবে ধান সিদ্ধ হয়েছে। তখন নামিয়ে চট বা চাটাই পেতে বা শুখনা খটখটে জায়গাতে ধানগুলি মেলে দিয়ে রোদে শুখিয়ে নিতে হয়।

ধান ঠিকমত শুখিয়েছে কিনা জানতে হলে দুটি ধান দাঁতে চেপে পরীক্ষা করতে হয়। যদি দাঁতের চাপে ধান চিঁড়ের মত চেপ্টে যায়, বুঝতে হবে ধানগুলি ঠিক শুখিয়েছে। তখন ঢেঁকিতে ছেঁটে যে চাল তৈরী করা হয় তাকেই আমরা সিদ্ধ চাল বলি।

আর যে সব মোটা ধান দু'সিদ্ধ করে চাল তৈরী হয়, সেগুলিকে প্রথমে না ভিজিয়ে হাঁড়িতে অল্প জল দিয়ে ভাপিয়ে নিতে হয়। তার পর গামলার জলে এক রাত্রি ভিজিয়ে রেখে (বেশী মোটা ধান হলে পুরা একদিন থেকে দেড়দিন পর্য্যন্ত) তার পর যথারীতি ছেঁকে হাঁড়িতে সিদ্ধ করে ঢেঁকিতে ছাঁটার পর চালগুলি কুলোয় শুখিয়ে ঢেঁকিতে ছেঁটে নিতে হয়। এই ধানের চাল 'দু'সিদ্ধ' নামে পরিচিত। ছাঁটার পর ঢেঁকির গড় থেকে তুলে চালগুলি কুলোয় করে ঝেড়ে নিতে হয়।

চালের ক্ষুদ—ধানের কোন অংশই ফেলা যায় না। ঢেঁকিতে ছাঁটার পর ভাঙ্গা ধান কুলায় ঝাড়লে ধানের যে খোসাগুলি আগে উড়ে পড়ে, তাকে বলা হয়—তুষ। তার পর ধূলার মত যেগুলি পড়ে, তাকে বলে কুঁড়ো। তুষ কাঠের জালে বা কয়লার গোলায় দেওয়া চলে ; মাটির সঙ্গে মেখে ঘরের দেওয়াল তুললে মাটি শীঘ্র ফাটে না। কুঁড়া গৃহপালিত পশুদের পুষ্টিকর খাদ্য। কুঁড়া কাঠখোলায় ভেজে মাছধরার উত্তম চার

তৈরী করা হয়। চাল ঝেড়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়ে, সেগুলিই হচ্ছে চালের ক্ষুদ। এই বস্তুটি খাদ্য হিসাবে শুধু যে পুষ্টিকর তা নয়, রাঁধতে পারলে এই ক্ষুদকে চমৎকার মুখরোচক খাদ্যে পরিণত করা যায়।

একবার হয়েছে কি, কলেজের একটা সভায় এই ক্ষুদের কথা উঠতে বড় ঘরের কতকগুলি মেয়ে নাক সিঁটকে বলেন—'ক্ষুদ হচ্ছে পশুর খাদ্য, মানুষ কি-সুখে ক্ষুদ রেঁধে খেতে যাবে?' এঁর পাল্টা উত্তরে বনমালা দেবী মেয়েদের এক পিকনিকে কলেজের ঐ মেয়েগুলিকে নিমন্ত্রণ করে নিজের হাতে ক্ষুদের তৈরী দু'তিন রকম সুখাদ্য খাইয়ে তাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেদিনকার পিকনিকে বনমালা দেবীর হাতের তৈরী 'ক্ষুদের জাউ' এমনি উপাদেয় হয়েছিল যে, বড় ঘরের ঐ মেয়েগুলি এক বাক্যে বলেছিলেন—সত্যিই, এ যে অমৃত! তখন বনমালা দেবী বলেন—শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের রাজভোগ উপেক্ষা করে বিদুরের ঘরে গিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই অমৃতই ভোজন করতেন। বিদুর নিত্যই এই ক্ষুদ স্বহস্তে পাক করে খেতে অভ্যস্ত ছিলেন।

চাল ও ভাত—আমাদের রন্ধনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ চাল, আর এই চাল থেকেই সর্ব্বপ্রধান খাদ্য ভাত প্রস্তুত হয়ে থাকে। আবহমান কাল থেকে বাঙ্গালী ভাত খেয়েই মানুষ হয়েছে। এই ভেতো বাঙ্গালীর বাহুর শক্তি এবং মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করেছে। কিন্তু কালক্রমে খাদ্যের দিক দিয়েও বাঙ্গালীর দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে, গৃহজাত খাদ্যপ্রাণযুক্ত বিশুদ্ধ চালের স্থলে কলে ছাঁটা সুশ্রী মসৃণ চাল বাঙ্গালীর রান্না ঘরে প্রবেশ করে। ফলে জাতির মেরুদণ্ডে পড়ে ব্যাধির প্রচণ্ড আঘাত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, চিন্তাশীল মনীষীরা অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর আবিষ্কার করতে সমর্থ্য হন যে, জাতির প্রধান খাদ্য যে চাল ও ভাত তাতেই ঘুণ ধরেছে; বাঙ্গালীকে

বাঁচতে হলে এখন থেকে তাদের প্রচলিত খাদ্যের ধারা বদলাতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আক্ষেপ করে বলেছেন—'আমাদের প্রধান খাদ্যটির প্রাণবস্তু রান্নাঘরের নর্দ্দমা দিয়ে গড়িয়ে যায়!' অর্থাৎ ভাতের সারাংশ যে ফেন, আমরা তা গেলে নর্দ্দমায় ঢেলে দিই। দেশমান্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বাস্থ্যবিদ্‌রাও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের এই মহামনীষীর কথায় সায় দিয়ে বাঙ্গালীকে সতর্ক করে দিলেন—অন্নের প্রাণশক্তি হচ্ছে ফেন, তাকে ত্যাগ করা হবে না। আমাদের খাদ্য-তালিকার পরিবর্ত্তন করবার প্রয়োজন হয়েছে। চালই যখন আমাদের প্রধান খাদ্যবস্তু, তখন কি উপায়ে চাল ব্যবহার করলে সাশ্রয় হবে এবং সেই সঙ্গে চালের সারবস্তু খাদ্যরূপে গৃহীত হতে পারে তার উপায় করতে হবে। স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে চেয়ে মেয়েরা যদি কলের অকেজো ছাঁটা চালকে বিদায় দিয়ে দেখতে বিশ্রী আঁকাড়া চালকে তাঁদের রান্নাঘরে বরণ করে নেন—তাহলেই জাতির দুর্দ্দিন ঘুচবে। তাঁরা আঁকাড়া চাল সম্বন্ধে পরীক্ষা-সিদ্ধ যুক্তি দেখালেন—আঁকাড়া চাল খেতে সুস্বাদু, প্রাণশক্তি পূর্ণ, এর উপরের লাল রঙ্গের আবরণটি বজায় থাকে ব'লে ভাতগুলি কর্কশ হয়, আর সেজন্য ভোক্তা চিবিয়ে খেতে বাধ্য হওয়াতে হজমের ব্যাঘাত ঘটেনা; আঁকাড়া চালের ভাত খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, অল্প ভাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়াতে পরিমাণে চালও কম লাগে, ধান থেকে ভানবার সময় কেবল তুষটি ছাড়ান হয় ব'লে এই চাল উৎপন্নও বেশী হয়, এই চালের ভাত কর্ম্মশক্তি বাড়ায় এবং পরিশ্রমে বাধ্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে—এই চাল দরিদ্র কৃষকদের ভোজ্য বলেই তারা শক্তিশালী এবং পরিশ্রমী।

পিকনিকের মেয়েরা প্রত্যেকেই বনমালা দেবীর উপদেশে আঁকাড়া চালের ভক্ত হয়ে পড়েছে। তাই, মহাযুদ্ধের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আঁকাড়া

মোটা চালের ভাত ফেন শুদ্ধ তারা রাঁধে আর অভ্যাসের গুণে খেয়েও হজম করতে পারে।

কিন্তু আঁকাড়া চালের ভক্ত হলেও পিকনিকের মেয়েরা সব রকম চালের ভাত রাঁধবার শিক্ষা তাদেয় পাকা শিক্ষয়িত্রী রাঁধুনীটির কাছে পেয়েছে। তিনি বলেন—ভাতই যখন আমাদের প্রধান খাদ্য, তখন খুব সতর্ক হয়ে এই প্রধান খাদ্যটি রাঁধবার সব রকম প্রণালীই শেখা চাই। তাই তিনি হাতে ধরে প্রত্যেক মেয়েটিকে ভাত রাঁধতে শিখিয়েছেন।

ভাত রান্নার প্রণালী—প্রচলিত ছড়ায় আছে—

চাল দেবে যত তত, জল দেবে তার তিন মত।
ফুটলে পরে ভাতে কাটি, তার পরে দিবে জ্বালে ভাটি॥

ছড়াটার সোজাসুজি মানে হচ্ছে, যে পরিমাণ চাল তার তিন গুণ জল দিয়ে ভাত চড়াবে। ভাত ফুটে উঠলে তবে কাটি দেবে, জ্বালও সেই সঙ্গে কমিয়ে দেবে।

ভাত রাঁধবার আগে চালগুলি ভাল করে ঝেড়ে বেছে ধুয়ে নেবে। আলো চালের ভাত রাঁধতে হলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখবে। সিদ্ধ চাল আঁকাড়া হলে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়। চালে কাঁকর থাকলে একটা বড় পাত্রে চালগুলিকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে বেশি জলে ধুয়ে অন্য পাত্রে তুলে রাখবে। তাতে কাঁকর পাত্রের তলায় পড়ে থাকবে।

হাঁড়িতে জল দিয়েই অনেকে চাল ছেড়ে দেন। কিন্তু জল ফুটে উঠলে চাল দেওয়াই ভাল। বিশেষতঃ আলো চাল রাঁধতে হলে ফুটন্ত জলেই চালগুলি ঢেলে দেবে, আর ভাত সিদ্ধ হয়ে এলে, নামাবার আগে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে চারপাশে অল্প ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাঁড়ির কানাদুটি ন্যাতা দিয়ে চেপে ধরে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে নামিয়ে নেবে। এতে আলো চালের ভাতগুলি বেশ ঝরঝরে হয়।

ভাতের হাঁড়ির মুখের ঢাকনাটি অল্প একটু ফাঁক করে রাখবে। তাহলে জল ফুটতে আরম্ভ করলে ফেনের সঙ্গে চালের ময়লা অংশ উতলে ঐ ফাঁক দিয়ে বাইরে পড়বে। ভাত ফুটে উঠলে দু একবার কাটি বা হাতা দিয়ে অল্প নেড়ে চেড়ে দেবে। এর পর মাঝে মাঝে হাতা বা খন্তি করে দু একটি ভাত তুলে টিপে দেখবে সুসিদ্ধ হয়েছে কি না।

সমান জ্বালেই ভাত সুসিদ্ধ হয়, তখন একটি ভাত টিপে দেখেই হাঁড়ির সমস্ত ভাতের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। ভাতের জ্বাল মৃদু বা কমবেশী যাতে না হয় পাত্রের সর্ব্বাংশে সমান উত্তাপ পড়ে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। জ্বালের তারতম্য হলে ভাত 'টিপ-চেলে' হয়; অর্থাৎ কতক বেশী সিদ্ধ, কতক অল্প সিদ্ধ, আবার কতক বা গলে যায়। এ ভাত অব্যবহার্য্য হয়ে থাকে এবং খেলে হজম করা কঠিন হয়।

ভাত নামাবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। যদি দেখ যে, নামাবামাত্রই ভাত পরিবেষণ করবে, তাহলে সুসিদ্ধ করেই নামিয়ে নেবে। আর যদি দেখ, কিছু পরে পরিবেষণ করলে চলবে, সে অবস্থায় সুসিদ্ধ না করে একটু শক্ত রেখে ভাত নামাবে। কারণ, হাঁড়ির মধ্যে যে তপ্ত ভাত রয়েছে, তারই বাষ্পের তাপে হাঁড়ি শুদ্ধ ভাত সুসিদ্ধ হয়ে উঠবে।

যদি ফেন গালবার একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে সিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেন গেলে ফেলা চাই, নতুবা ফেনের মধ্যে থেকে সমস্ত ভাত গলে পাঁকের মত হয়ে যাবে। উনান থেকে সন্তর্পণে ভাতের হাঁড়িটি নামিয়ে এমন কোন পাত্রের উপর কাত করে দেবে যাতে ফেনটুক সমস্তই তার মধ্যেই পড়ে। কারণ, ঐ ফেনই ভাতের সারাংশ। অল্প ঘি, নুন ও নেবু মেখে ঐ পরিত্যক্ত ফেনকে পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত করা যায়।

ফেন না গেলে ভাতগুলি শুকনা ও ঝরঝরে করে রাঁধাই বর্ত্তমানে

স্বাস্থ্য-সম্মত রন্ধনের প্রণালী বলে গণ্য হয়েছে। এই ভাতই পুষ্টিকর এবং বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক।

ফেন না গেলে ভাত রাঁধবার প্রণালী—হাঁড়িতে এমন আন্দাজে জল চড়াবে যে, চালগুলি সেই জলে ঢেলে দিলে চালের উপরে অন্তত চার পাচ আঙ্গুল জল থাকবে। হাঁড়ির মুখটি বন্ধ থাকবে, মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেবে। যখন দেখবে ফেন মরে এসেছে, ভাতগুলি অল্প শক্ত আছে, হাঁড়ির তলায় জল না থাকায় চিড় চিড় করে একটা শব্দ হচ্ছে, সেই সময় হাঁড়ি শুদ্ধ ভাত নামিয়ে মুখের ঢাকনাটি শক্ত করে দু হাতে চেপে ধরে জোরে বার দুই ঝাঁকানি দিয়ে কিছুক্ষণ এই ভাবে রাখবে। একটু পরেই দেখবে ভাত দিব্য ঝর ঝরে হয়েছে। এভাবে রাঁধতে প্রথম প্রথম দু একদিন অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু পরে এমন অভাস হয়ে যাবে যে, জলের আন্দাজ করতে আর বেগ পেতে হবে না। তবে ফেন শূন্য এই ভাত বেশীক্ষণ ফেলে রাখলে শক্ত হয়ে যাবে, যতশীঘ্র সম্ভব খেয়ে নেওয়া চাই।

ভাতে ভাত—ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন তরকারি ও দাল সিদ্ধ করে নেবার ব্যবস্থাকে ভাতে ভাত বলা হয়। ভাতে সিদ্ধ করা তরি-তরকারিগুলি কাঁচা তেল, নুন, কাঁচালঙ্কা ও অল্প মসলা সংযোগে ভাতের সঙ্গে খেতে শুধু যে মুখরোচক তা নয়, তৈলাক্ত স্নেহময় উপকরণগুলির সংযোগে ভাতের খাদ্যপ্রাণ আরো উদ্দীপিত হয়ে আমাদের দেহে শক্তি সঞ্চার করে। পাল্টা-পাল্টিভাবে নিম্নের পুষ্টি-কর খাদ্যগুলি ভাতে দিয়ে ভাতের সঙ্গে ভোজন করা উচিত। যথা: আলু, রাঙ্গা ও সকরকন্দ আলু, ওল, কচু, পটল, ঝিঙ্গে, বেগুন, কাঁচকলা, ঢেঁড়স, বরবটি, উচ্ছে, কাঁঠালবিচি, মুলো, কপি, কড়াইশুঁটি, আম, আমড়া, চালতা, কুমড়া, লাউ, পেঁপে, কোয়াস, কামরাঙ্গা; হিংচে

প্রভৃতি শাক-সবজির ডগা; সজিনার ডাঁটা, মোচা, মুগ মসুর, মটর, খেসারী প্রভৃতি ডাল; পোস্ত দানা, ডিম, কৈ, ইলিস ও চিংড়ি মাছ প্রভৃতি।

ভাতে সিদ্ধ করা জিনিসগুলি সাধারণতঃ তেল নুন মেখেই ভাতের সঙ্গে খাবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আবার কয়েকটা জিনিস একত্র মিশিয়ে খেলে স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি পায়। কতকগুলি মেখে তেল ছাড়াও অপর কিছু মসলা দিলে অধিকতর রুচিকর হয়। যেমন:

আলুর সঙ্গে উচ্ছে গিমে শাক ফুল কপি প্রভৃতি মেখে নিলে খুব মুখরোচক হয়। একদিন আলু-উচ্ছে, একদিন বা আলুর সঙ্গে গিমে শাক ভাতে, কোনদিন বা আলু-ফুলকপি-কড়াইশুঁটি ভাতে একত্র মেখে খাওয়া যেতে পারে। শেষের মিশ্র ভাতে তিনটি সরসে তেল ও গোটা মসলা মেখে নিলে খুব মুখরোচক হয়।

বেগুন ভাতের সঙ্গে কড়ায়ের ডালের বড়ি বেশ মিশ খায়। সরসের তেল, কাঁচালঙ্কার কুঁচি, আদার কুঁচি ও নুন—এই কটি হচ্ছে মাখবার উপকরণ।

ওল ভাতের সঙ্গে সরিষা বাটা, সরিষা তেল ও কাঁচা লঙ্কা প্রশস্ত। ওলের মুখচুলকানো দোষ থাকলে ওল চাকা চাকা করে কেটে শুখিয়ে নিলে, কিম্বা তিল বাটা মেখে ঘণ্টা খানেক রেখে তারপর ভাতে বা ডালে সিদ্ধ করতে দিলে বা রাঁধলে তখন ওল মুখে লাগে না।

হিংচে-শাক ভাতের সঙ্গে নারিকেল কুরা, সরিষা তেল ও নুন একান্ত উপযুক্ত উপকরণ। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে এই 'ভাতে' জিনিসটি প্রতিষেধক ঔষধের মত হিতকর।

মোচাভাতে সরিষা তেল, সরিষাবাটা ও নুন সংযোগে মেখে নিলে সুস্বাদু হয়।

ডিম ভাতের সঙ্গে সরিষার তেল, নূন ও মরিচগুঁড়া প্রশস্ত এবং হিতকর।

কৈমাছ, ইলিস মাছের পেটি এবং খোসা ছাড়ানো গলদা বা বাগদা চিংড়ি মাছ ভাতের তাপে এই প্রণালীতে সিদ্ধ করে নেবে: ভাত হয়ে গেলে হাঁড়ি থেকে তুলে সিদ্ধ মাছগুলির সঙ্গে সরিষা তেল, নুন, সরিষাবাটা ও কাঁচালঙ্কাবাটা মেখে কোন পাতলা বাটিতে ভরে বাটিটি ভাত রান্নার পর গরম ভাতের মধ্যে কানা পর্য্যন্ত চেপে বসিয়ে ভাতের হাঁড়ির মুখটি ঢাকা দাও। তারই তাপে বাটির মাছ সিদ্ধ হবে। ভাতে দেবার আগে মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে নুন মাখিয়ে এমন ভাবে রাখা চাই যাতে জল টুকু সব ঝড়ে পড়ে। চিংড়িমাছ-ভাতের সঙ্গে সরিষা তেল ও গোটা মসলা মাখলে খুব মুখপ্রিয় হয়।

ভাত ভাজা—উপকরণ: ভাত, ঘি বা তেল, তেজপাতা, জিরা, মরিচগুঁড়া, আদা কুঁচি, পিয়াজ কুঁচি, নুন, চিনি, কিস্‌মিস, কাঁচা লঙ্কা, পরিমাণমত জিরা এবং গরম মসলা। কিস্‌মিসগুলো ভিজিয়ে এবং গরম মসলা থেঁতো করে রাখবে। প্রস্তত প্রণালী: পাত্রে আন্দাজমত ঘি বা তেল চড়িয়ে তাতে জিরা, মরিচগুঁড়া, তেজপাতা, আদা পিঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা বেশ করে ভাজাভাজি করে আস্তে আস্তে ভাতগুলি ঢেলে দাও। ভাতে যদি ডেলা বেঁধে থাকে ঢালবার সময় সেগুলি ভেঙ্গে ঝরঝরে করে পাত্রে দেবে। তারপর মসলার সঙ্গে ভালো করে উলটে পালটে মাথামাখি করে ভাজতে থাক। লক্ষ্য রাখবে যেন লাল হয়ে না যায়। নাড়তে নাড়তে বেশ ঝরঝরে হয়ে এলে পরিমাণমত নুন, অল্প চিনি, ভিজানো কিসমিস ও থেঁতো করা গরমমসলাগুলি ভাতে ছড়িয়ে

দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেবে। গরমমসলা মেশাবার সময় অল্লাধিক ঘি দিতে পারলে আরো ভাল হয়। এই প্রণালীতে তৈয়ারী ভাজা ভাত খেতে বেশ মুখরোচক, এমন কি ঘিয়ের পরিমাণ বেশী না হলেও পোলাওএর মত সুস্বাদু হবে। দ্রষ্টব্য : ভাত বেশী হলে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে তুলে রেখে—পরে উক্ত প্রণালীতে ভেজে নিলে সেগুলি নষ্ট ত হবেই না, বরং একটা নূতন ধরণের খাদ্যে পরিণত করা যেতে পারে। এই প্রণালীতে সকালের ভাত রাত্রিকালে এবং রাতের রান্না ভাত দিনমানে ব্যবহার করা চলে। তবে সখ করে যদি ভাজা ভাত এই প্রণালীতে ভাজতে চাও, ভাতের ফেন না ফেলে অর্থাৎ পরিমিত জলে ভাত সিদ্ধ ও ঝরঝরে করে এই প্রণালীতে ভাজবার ব্যবস্থা কর। বলা বাহুল্য, তার স্বাদ আরও ভাল হবে।

ভাতের সব্‌জি পোলাও—উপকরণ : পুরাণো সরু চাল (পেশোয়ারী বা বাশমতী) আধ সের, কুঁচানো ফুলকপি এক পোয়া, আলু কুঁচি আধ পোয়া, মটরশুঁটি এক পোয়া, ঘি আধ পোয়া, কিস্‌মিস, গরমমসলা, কাঁচা লঙ্কা, পিঁয়াজ-কুঁচি, ধনেশাক, নুন, হলুদ, চিনি, তেজপাত, জিরা, মরিচ প্রভৃতি পরিমাণমত। প্রস্তুত প্রণালী : চালগুলি এমনভাবে সিদ্ধ কর ভাতগুলি বেশ ঝরঝরে হয়। ফেন গেলে ফেলে দেওয়া বা ফেন না গেলে পরিমাণমত জলে সিদ্ধ করে ভাতগুলিকে ঝরঝরে করে নেওয়া—যেটি সুবিধাজনক বুঝবে তাই কর। একটি চুপড়ি বা কোন পাত্রে ভাতগুলি ঢেলে ফেল। এক সঙ্গে আলু ও কপি-কুঁচিগুলি আলাদা আলাদা ভেজে পৃথক করে রাখ। এখন পাত্রে ঘি টুকু চড়িয়ে প্রথমে পিঁয়াজকুঁচিগুলি ভেজে ফেল, তার পর কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, মটরশুঁটি, ধনেশাক-কুঁচি ঐ সঙ্গে দিয়ে নাড়তে থাক। এই সময় এক চিমটে নুন শাকগুলির ওপর ছড়িয়ে দাও। বেশ ভাজাভাজি হলে,

হলুদ বাটা, তেজপাত, জিরা, মরিচ ও গরমমসলা (থেঁতো করে) ওতে মিশিয়ে দাও, এর পর অল্প নেড়ে-চেড়ে ভাতগুলি আস্তে আস্তে ঢালতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের মসলাগুলির সঙ্গে খুন্তি দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। ভাতগুলি সব ঢেলে মিশিয়ে দেবার পর কপি ও আলুকুঁচি—আগে যেগুলি ভেজে রেখেছ, ঐ সঙ্গে ঢেলে দিয়ে পরিমাণমত নুন চিনি ও কিস্‌মিস দিয়ে দু'একবার নাড়া-চাড়া করে পাত্রের মুখটি ভাল করে চাপা দিয়ে তপ্ত কয়লার উপর দমে বসিয়ে রাখ।

সব্‌জি পোলাও তৈয়ারীর এইটি খুব সহজ ও সাদাসিধা প্রণালী।

ভাতের পোলাও—উপকরণ: সরু চালের ভাত, ঘি (পরিমাণমত), তেজপাতা, ডিম, নুন, চিনি, আলু ও নারকেল কুঁচি, তেজপাতা, ছোট এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ (শেষের তিনটি অল্প থেঁতো করে রাখবে), কিস্‌মিস ও গুঁড়া বা বাটা মসলা (হলুদ, লঙ্কা, মরিচ ও জিরা) পরিমাণমত।

প্রস্তুত প্রণালী: ফেনটুকু না গেলে ভাতগুলি যদি সুসিদ্ধ ও ঝরঝরে করে নিতে পারে ত ভালই, নতুবা ফেন গেলে একটা পাত্রে এমনভাবে মেলে দেবে যে বেশ ঝরঝরে হয়। যে-পরিমাণ ভাত নেবে, সেই আন্দাজে মসলা-পাতি গুছিয়ে নাও। হলুদ, লঙ্কা, জিরা-মরিচ গুঁড়িয়ে বা বেটে রাখ। আলু ও নারিকেল খুব ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে আগে থাকতে ভেজে রাখ। ডিমগুলি ভেঙ্গে তরলাংশ কোন এনামেলের পাত্রে ঢেলে অল্প দুধের সঙ্গে ফেটিয়ে রাখ। কিস্‌মিসগুলিও ভিজিয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে ফেল। চিনি, নুন আন্দাজমত, আর গরমমসলা ও তেজপাতাগুলির উপর গোটা দুই ঘা দিয়ে অল্প থেঁতো করে হাতের কাছে রাখ।

এবার মৃদু আঁচে হাঁড়িটি বসিয়ে ঘি চড়িয়ে দাও। ঘি তৈরী হলেই

তাতে তেজপাতা ও গরমমসলাগুলি ফোড়ন দাও; একটু নেড়ে-চেড়ে বাটা বা গুঁড়া মসলাগুলি অল্প জলে গুলে ঢেলে দাও। বেশ ভাজাভাজি হলে ভাতগুলি আস্তে আস্তে ঢেলে দিয়ে এমন সন্তর্পণে ভাজতে থাক যেন ভেঙ্গে তালগোল পাকিয়ে না যায়। এর পর ভাজা আলু ও নারবেল-কুঁচিগুলি ঐ ভাতের সঙ্গে দাও। খানিকক্ষণ ভাজাভাজির পর দুধে ফেটানো ডিমটুকু ঢেলে দিয়ে ভাতগুলির সঙ্গে মাখামাখি করতে থাক বেশ ধীরে ধীরে। অল্প নাড়াচাড়ার পর নূন, চিনি ও কিস্‌মিস দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজাভাজি কর। লক্ষ্য রাখ, যেন তলা ধরে না যায়। নামাবার আগে অল্প ঘি ও ছোটএলাচ চূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দু'চারবার নেড়ে-চেড়ে নিলে আরও ভাল হবে।

ভাতের চপ—উপকরণ: সুসিদ্ধ ভাত, আদা কুঁচি, গরম-মসলাগুঁড়া, ময়দা—ভাতের সিকি পরিমাণ; অর্থাৎ ভাত এক পোয়া হলে ময়দা চাই এক ছটাক) কিসমিস, পেস্তা, ঘি, নূন, চিনি ও অল্প মরিচগুঁড়া। প্রস্তুত প্রণালী: সুসিদ্ধ ভাতগুলি বেশ করে চটকে মেখে তার সঙ্গে পরিমাণ মত ময়দা মিশিয়ে মণ্ডের মত করে থেসে ফেল। এর পর আদাকুঁচি, মরিচ, গরম মসলা গুঁড়া, নূন ও চিনি মিশিয়ে আর একবার মেখে নাও। এখন ঐ মণ্ড থেকে এক একটি লেচির মতন করে তার ভিতরে কিস্‌মিস ও পেস্তার পূর দিয়ে চপের আকারে বেঁধে ঘিয়ে বা তেলে ভেজে নাও। দুপীঠ লালচে করে ভেজে নেবে।

এটি হল খুব সাদাসিধা ধরণের ভাতের চপ। বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই, অথচ খেতেও মুখরোচক। ইচ্ছা করলে ভাতের মণ্ডের সঙ্গে মাছের গুঁড়ো মিশিয়ে কিম্বা পূরে মাছ দিতে পার। তাহলে মাছগুলি সিদ্ধ করে বা অল্প ভেজে—কাঁটা ছাড়িয়ে ভেঙ্গে নিতে হবে। পূরে দিতে হলে কড়ায় ঘি চড়িয়ে অল্প দধি বা টমেটোর রস, আদা বাটা,

পিঁয়াজ বাটা, গরম মসলা, মরিচগুঁড়া ও কিস্‌মিসগুলির সঙ্গে ভাঙ্গা মাছগুলি মিশিয়ে ভাজাভাজি করে নিতে হবে। সেই পূর চপের মধ্যে দেবে। আর মণ্ডের সঙ্গে মাছ দিতে হলে মাছগুলির কাঁটা ছাড়িয়ে মিহি করে বেচে নেবে।

চিঁড়া সিদ্ধ করে এই ভাবে চিঁড়ার চপও তৈরী করে নিতে পার। উপকরণ ও প্রণালী ভাতের চপেরই মতন।

উদ্বৃত্ত বা বাসি ভাত গরম করার প্রণালী—তৈরী ভাতের কতিপয় খাদ্য পরিচয়ের পর উদ্বৃত্ত বাসি ভাত টাটকা ভাতের মত খাবার যোগ্য করে নেবার দুটি প্রণালী এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

ধর, সকালের রান্না ভাত উদ্বৃত্ত হয়েছে কিম্বা রাত্রির ভাতও সব খরচ হয়নি—এ অবস্থায় ভাতগুলি ফেলে না দিয়ে খাবার যোগ্য করে নেওয়া উচিত। অবশ্য, আগে দেখতে হবে ভাতগুলি বিকৃত হয়ে গেছে কিনা। তাহলে সে ভাত আর কাজে লাগানো উচিত নয়। কিন্তু যত্ন করে রাখলে ভাত বিকৃত হয় না বা এলিয়ে পড়ে না।

যে ভাতগুলি উদ্বৃত্ত হয়েছে—পরিমাণমত জলের সঙ্গে মিশিয়ে উনানে চাপিয়ে দাও। বেশ ফুটে উঠলে যেমন করে ফেন গালা হয় সেই ভাবে ভাতের মাড়টুকু ঝরিয়ে ফেল। ভাতগুলি বেশ নরম ও ঝরঝরে হবে।

আর যদি দেখ, যে ভাতগুলি উদ্বৃত্ত আছে তাতে অপর বেলায় কুলাবে না, আরও ভাতের প্রয়োজন ; সে অবস্থায় ঐ ভাতের উপর আরও যতটা প্রয়োজন হতে পারে সেই আন্দাজে চাল নিয়ে যথারীতি ধুয়ে সেই চালের সঙ্গেই ভাতগুলি এক সঙ্গে হাড়ির জলে দিয়ে ফুটতে দাও। ঐ চালের সঙ্গেই ভাতগুলি ফুটতে থাকবে, আর সুসিদ্ধ হলে নূতন ভাতের

সঙ্গে দিব্যি মিশে যাবে। ফেন গালার পর দেখবে দিব্যি নরম ও ঝরঝরে হয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও এই মিশ্রিত ভাত ক্ষতিকর হবে না।

ভাতের গোলাপী পোলাও—উপকরণ: পেশোয়ারী চাল ।/॥০, চিনি ।/॥০, ঘি ।/৵০, জাফরাণ, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস ও গরম মসলা পরিমাণ মত। সামান্য গোলাপ জল। প্রস্তুত প্রণালী:—চালগুলিকে ধুয়ে পরিমাণ মত জল দিয়ে হাঁড়িতে করে উনানে চাপাও। চালগুলি সিদ্ধ হলে ফেন গেলে একটা চুবড়িতে রাখ। জাফরাণগুলি গোলাপ জল দিয়ে একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখ। বাদাম পেস্তার খোসা ছাড়িয়ে মিহি করে কাট। উনানে হাঁড়ি চাপিয়ে ঘি ঢাল। চিনিটুকু সব ভাতের সঙ্গে হাঁড়িতে ঢেলে নেড়ে চেড়ে দাও। পেস্তা বাদাম কিসমিস আর গরম মসলা দিয়ে মাঝে মাঝে নাড়তে থাক। লক্ষ্য রাখ যেন তলা না ধরে যায়। ভাত ঝরঝরে হলে জাফরাণ ও গোলাপ জল দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে অন্য একটি পাত্রে রাখ। ফেন না গেলেও ভাত তৈরী করে নিতে পার পোলাওর জন্য।

গম-জাত খাদ্য-সম্ভার

গম—ধানের পরেই গমের কথা এসে পড়ে। ধান যেমন আমাদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য চাল বা ভাতের মূল উপাদান, গমও তেমনই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শ্রেষ্ঠ খাদ্য ময়দা আটা ও সুজির উপাদান। রুটি, পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, লুচি, পুরি, পরেটা প্রভৃতি প্রত্যেকটির মূলে রয়েছে এই গম।

গম থেকে আটা প্রস্তুত প্রণালী—গমগুলিকে ঝেড়ে বেছে এবং সুযোগ থাকলে জলে ধুয়ে রোদে শুথিয়ে যাঁতায় বা মেসিনে ভাঙ্গিয়ে নিলে বিশুদ্ধ আটা পাওয়া যায়। আটা না চেলে ব্যবহার করলে বেশী পুষ্টিকর হয়। তবে যাঁরা ভুষিশুদ্ধ আটা ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক, মোটা চালুনিতে চেলে নেবেন। আটা যদি বেশ মোলায়েম ও সুস্বাদু করতে চাও, গমের সঙ্গে সিকি পরিমাণ যব (গমের মত ঝেড়ে বেছে ধুয়ে ও শুকিয়ে নিয়ে) মিশিয়ে ভাঙ্গিয়ে নেবে। যব-মিশ্রিত গমের আটা—ভাঙ্গা বা পেশাইয়ের পর মোটা চালুনিতে ছেঁকে নেওয়াই ভাল। পাঞ্জাব প্রদেশে গম ও যবের সঙ্গে ছোলা মিশিয়ে পেশাই করে ব্যবহার করা হয়। এর ভাগ এই রকম হবে : গম যদি নাও দশ সের, যব নেবে তিন সের, আর ছোলা পাঁচপো থেকে দু'সের। এই তিন জাতীর শস্য-মিশ্রিত আটা অত্যন্ত পুষ্টিকর হয়ে থাকে।

গমের দালিয়া—গম থেকে তৈরী এই মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্যটি বাঙ্গালী-সমাজে একেবারে অপরিচিত। কিন্তু পাঞ্জাব অঞ্চলে

এটি অতি পরিচিত প্রাতরাশ। খুব সহজেই এই খাদ্যটি প্রস্তুত করে জলখাবারে পরিণত করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী—গমগুলি জলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নাও আগে। তার পর ঝেড়ে বেছে বালুতে ভেজে নাও। ভাজা গমগুলি যাঁতায়, হামানদিস্তায় বা শিলে গুঁড়িয়ে চালুনীতে ছেঁকে নিয়ে প্রয়োজনমত চূর্ণ উনানে পাক-পাত্র চাপিয়ে জলে গুলে সিদ্ধ করতে দাও। বার দুই ফুটে উঠলে দুধ, চিনি ও ছোট এলাচ চূর্ণ মিশিয়ে নামিয়ে নাও। সুবিধা থাকলে জল না দিয়ে শুধু দুধেই এই গোধুমচূর্ণ ফুটিয়ে নিলে খাদ্যটি আরও অধিক সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হবে। পাঞ্জাব প্রদেশে এই চূর্ণ যাঁতায় ভাঙবার পর না ছেঁকেই জল বা দুধে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। গমের খোসাগুলি 'বি'-ভিটামিনে পূর্ণ ব'লে খোসা চালুনীতে ছেঁকে নেওয়া হয় না। মেয়েদের পিকনিকে যেদিন এই খাদ্যটি তৈরী করা হয়, বনমালা দেবীর নির্দ্দেশমত খোসা না চেলেই চূর্ণগুলি সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। এই খাদ্যটি তোমাদের জলখাবারে চালু করে নিতে পার।

বিভিন্ন প্রকারের রুটি

আটা বা ময়দায় অল্প নূন ও ফুটন্ত জল মেখে ঘণ্টা দুই রেখে তার পর মেখে লেচি কেটে রুটি করলে ময়দা মাখার পরিশ্রম যথেষ্ট কম হবে, আর রুটিও খুব নরম হবে। এক্ষেত্রে আটায় জল দেবার সময় ঘিয়ের ময়ান না দিয়ে ভিজানো আটাগুলি ঠাসবার মুখে অল্প পরিমাণ ঘি ঈষৎ গরম করে ঐ আটায় মাখামাখি করে দেবে। এর ফলে অনেকক্ষণ ধরে আটাগুলি জলমাখা অবস্থায় থাকায় এবং ঘৃত পড়ায় মাখবার পক্ষেও সুবিধা হবে। সেঁকার সঙ্গে সঙ্গে রুটি যদি গরম গরম পরিবেষণ করা

যায়—ভোজনকারীরা খেয়ে প্রচুর তৃপ্তি পাবেন। ঘি না দিলেও ক্ষতি নেই।

আটার রুটিই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অনেকে আটার সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে রুটি করে থাকেন। ময়দার রুটিতে একটু বেশী ময়ান না দিলে রুটি শক্ত হয়। কিন্তু আটা নুন ও ফুটন্ত গরম জলে মেখে নিলে ঘি না দিলেও বেশ নরম থাকে এবং খেতে অসুবিধা হয় না।

সাধারণতঃ, এক মুঠা আটায় একখানি রুটি হবে—এই আন্দাজে আটা নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ যত মুঠা আটা, তত খানা রুটি হবে—এই হচ্ছে মোটামুটি আটা নেবার আন্দাজ। অনেকে এক পো আটায় আটখানা রুটি করে মাপটি বজায় রাখেন। বেশ খাসা হয়ে গেলে লেচি-গুলি সমান আকারে যাতে হয় লক্ষ্য রাখবে। আটা মাখার জন্য পিতল বা লোহার পরাত বা কাঠের বারকোশ প্রশস্ত। রুটি বেলবার জন্য চাই একখানি চাকি ও বেলুন। সেঁকবার জন্য লোহার চাটু ও খুন্তি এবং উনান থেকে রুটি পুড়িয়ে নেবার জন্য চিমটাও একখানি প্রয়োজন। সেঁকা ও আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে রুটিগুলি রাখবার জন্য একটি পাত্র এবং ঢাকা দেবার জন্য একখানি থালা বা কোন পাতলা ডিস কাছে রাখা চাই। তৈয়ারী রুটিগুলি পাত্রে রেখেই চাপা দিলে রুটি অনেকক্ষণ গরম থাকে এবং শীঘ্র শক্ত হয় না।

লেচিগুলি শুখনা ময়দায় ডুবিয়ে চাকিতে বেলুনের সাহায্যে গোল গোল করে বেলে নিয়ে চাটুতে সেঁকে নিতে হবে। রুটির জন্য উনানের আঁচ মৃদু বা টিমে হবে না—টিমে আঁচে রুটি সেঁকলে পাপড়ের মত শক্ত হয়ে যায়। এজন্য রুটি সর্ব্বদাই বেশী আঁচে সেঁকবে। কাঠের উনানের চেয়ে কয়লার উনানে রুটি ভাল হয়, কারণ, আঁচ বরাবর এক রকম

ফুটন্ত জলে ঐ তাল কয়টি ফেলে আধ ঘণ্টা রেখে সিদ্ধ করে নাও। এর পর নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হলে ভেঙ্গে রুটির ময়দার মতন করে মাখ। মাখবার সময় জলের দরকার হলে গরম জল দেওয়া চাই। এখন রুটির মত বেলে সেঁকে নাও। এই রুটি খুব লঘুপাক অথচ বলকারক ব'লে রোগীর পথ্য হিসাবে গণ্য।

নারিকেলের রুটি—একটা নারিকেল কুরে দুধ বা'র করে সেই দুধের সঙ্গে আধসের আটা বা ময়দা বেশ করে মেখে ফেল। যদি জলের প্রয়োজন হয়, পরিমাণমত জল মিশিয়ে নাও। ভাল করে ঠেসে লেচি কেটে যথারীতি বেলে, সেঁকে ও পুড়িয়ে নাও। এই রুটিও খুব নরম ও সুস্বাদু হবে।

তালের রুটি—পাকা তালের মণ্ড অল্প নুনের সঙ্গে আটা বা ময়দায় মিশিয়ে বেশ করে মেখে ফেল। তালের মণ্ড বা কাই জলের কাজ করবে। তবে যদি প্রয়োজন বোঝ, পরিমাণমত জল মিশিয়ে নেবে। খুব ভাল করে থাসতে হবে। এর পর লেচি কেটে বেলে রুটির মত সেঁকে পুড়িয়ে গরম গরম খেতে দাও বা পাত্রের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ।

চাপাটি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা এই রুটি খুব পছন্দ করে। পাঞ্জাব প্রদেশে এক একখানি চাপাটি থালার চেয়েও আকারে বড় হয়ে থাকে, এবং এরূপ একখানি চাপাটি গড়তে এক সের আটা লাগে। খুব ছোট করতে গেলেও একখানি চাপাটির জন্য এক পো আটা নিতে হবে। আটাগুলি জলে মেখে বড় বড় গোল গোল লেচি কর। এখন দু'হাতে চারটি করে শুক্‌না আটা নিয়ে ঐ বড় লেচিটি হাতের ময়দায় মাখিয়ে দুই হাতের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেলবার মত করে গোলাকারে বাড়াতে থাক। বেশ পুরু ও আকারে বড় হয়ে এলে

উনানের উপর চাটুখানি উপুড় করে দিয়ে অর্থাৎ চাটুর উলটা পীঠে এই হাতে গড়া রুটি সেঁকে নাও। দুটি পীঠ ভাল রকমে সেঁকা হয়ে গেলে চাটু উনান থেকে তুলে সেই সেঁকা রুটি আগুনের উপর দাও। ফোস্কা পড়ে এলে আগুন থেকে চিমটার সাহায্যে তুলে, ফোস্কাগুলি ফুটো করে তার মধ্যে অল্প অল্প করে গরম ঘি ঢেলে দাও।

চাপাটির আর এক রকম প্রকরণ হচ্ছে—আটায় অল্প নুন মেখে ঘিয়ের ময়ান দাও। বেশ মাখামাখি করে জল দিয়ে থেসে মাখতে থাক। লেচি কেটে পুরু পুরু করে রুটির মত বেলে ফেল। উনানে চাটু চড়িয়ে অল্প ঘি দাও। ঘি তেতে উঠলে এক একখানি পুরু রুটি চাটুর ঘিয়ে চড়িয়ে খুন্তি করে চেপে চেপে দাও। নীচের দিকটা বাদামী রং ধরলেই উলটে উপর দিকটা নীচে দাও। এই সময় অল্প একটু ঘি দিতে পার। দু'দিক্ বেশ ভাজা হলে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখ।

পুরু পুরু রুটি চাকিতে বা হাতে হাতে বেলে শুক্না চাটুতে সেঁকে নিয়ে আগুনে না পুড়িয়ে চাটুতে অল্প ঘি দিয়ে দু পীট ভেজে কেউ কেউ চাপাটি তৈরী করেন।

পাঁউরুটির টোষ্ট—সাধারণভাবে টোষ্ট করতে হলে পাঁউ-রুটি 'স্লাইস' করে কেটে মাখন বা ঘি মাখিয়ে আগুনের আঁচে সেঁকে নিয়ে নুন মরিচগুঁড়ো মাখিয়ে চায়ের সঙ্গে পরিবেষণ কর। এই টোষ্ট আরও উপাদেয় এবং রুচিকর করতে হলে পাঁউরুটি কেটে টোষ্টের আকারে স্লাইস করে রাখ। একটি পাত্রে ডিমের তরলাংশ সমস্ত ঢেলে তার সঙ্গে ডিমের পরিমাণ অনুযায়ী নুন হলুদ জয়িত্রী গোলমরিচ ও মাখন বেশ করে মিশিয়ে ফেটিয়ে ফেল। এর পর চাটু বা সস্‌প্যানের গায়ে অল্প ঘি বা মাখন মাখিয়ে নাও। এদিকে পাঁউরুটির স্লাইসগুলির দু-পিঠে ফেটানো তরল পদার্থ ভাল করে মাখিয়ে ঐ চাটু বা সস্‌প্যানে যে কয়খানা একসঙ্গে

ধরে পাশাপাশি রেখে মৃদু আঁচে ভাজাভাজি করে নামিয়ে বিস্কুটগুঁড়ো মাখিয়ে নাও। এর পর ডিসে সাজিয়ে চায়ের সঙ্গে পরিবেষণ কর। এটি হ'ল রুচিকর আধুনিক খাদ্য এবং পুষ্টিকরও বটে।

এর আর একটি প্রকরণ আছে। পাঁউরুটির স্লাইস কেটে উপরের লালচে চোঁচাগুলি তুলে ফেল। একখানা ডিসে সাজিয়ে কাটা রুটিগুলির উপর এমন আন্দাজে দুধ ঢেলে দাও ভিজে যেন নরম হয়। এর পর ঐ নরম স্লাইসগুলির প্রত্যেকটি ফেটানো ডিমের কুসুমে মাখিয়ে মৃদু আঁচে ঘিয়ে বা মাখনে ভাজাভাজি করে সুবাসিত চিনির রসে ডুবিয়ে নাও। চিনির রসটি পাতলা এক আঁশ হবে, এবং তাতে ৮।১০ ফোঁটা গোলাপ নির্যাস বা লেবুর রস দিয়ে সুগন্ধি করে নেবে। এই খাদ্যটি 'টোষ্ট-পুডিং' নামে পরিচিত। চিনির রসে ফেলে সুমিষ্ট করবার সুবিধা না হলে ডিমের শ্বেতাংশটুকু একটা ডিসে ভাল করে ফেটিয়ে তার সঙ্গে চিনি মেশাও। মেশাবার আগে চিনি বেটে বা পিষে নিবে। কিছুক্ষণ ফেটাতে ফেটাতে যখন বেশ চকচকে ও আটা আটা গোছ হয়েছে দেখবে, তাতে ৮।১০ ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে একখানা মোটা ছুরির সাহায্যে ঐ তরল পদার্থ টোষ্টগুলিতে প্রলেপ দিবে।

পরটা-পূরি-লুচি-কচুরি-শিঙ্গাড়া

গোল পরটা—পরটার ময়দা বা আটা পাতলা করে মাখতে হবে। রুচি অনুসারে একটু নুন দেওয়া যেতে পারে। খাস্তা করবার জন্য পরিমাণমত এক চিমটা খাবার সোডা (সোডা-বাই-কার্ব) মেশাতে পার। বেলবার পাটাটি একটু বড় হলে পরটা আকারে বড় হবে, ভাঁজ-গুলিও পাতলা পাতলা হবে। মাখবার আগে ময়দা বা আটায় নুন ও সোডা

মিশিয়ে বেশ করে মেখে তার পর ঘিয়ের ময়ান দিয়ে অল্প অল্প করে জল দিয়ে পাতলা করে দলে দলে মাখতে থাকবে। লেচিগুলি প্রথমে গোল করে বেলে তার পর তাকে গুড়িয়ে নলের মত কর। সেই নলটিকে আবার আড়ভাবে গোল করে (মাঝে ফাঁক না থাকে) জোড়গুলি টিপে ও হাতে চেপে লেচিটি একটু চ্যাপ্টা করে আবার গোল করে বেল। এখন অল্প ঘিয়ে ভাজবে।

তেকোনা পরটা—পরটার লেচি লুচির লেচির চেয়ে বড় হবে। লেচি সরিষা তেল বা ঘিয়ে ডুবিয়ে প্রথমে রুটির মতই গোল করে বেলে নাও। এর পর ঐটি দু-ভাঁজ করে তাকে পুনরায় দু-ভাঁজ কর, অর্থাৎ গোলাকার বস্তুটি সব সমেত চার ভাঁজ হবে। এবার তাকে ত্রিভুজের মত তিন কোণা করে বেলে চাটুতে অল্প ঘিয়ের ওপর চড়িয়ে দাও। লুচির মত ভাসা ঘিয়ে পরোটা ভাজা হবে না। চাটুতে অল্প পরিমাণ ঘি দিয়ে তেতে উঠলে আস্তে আস্তে পরটাখানি তার ওপরে ছেড়ে দিয়ে যে পর্য্যন্ত না বাদামী রং হয়ে ওঠে সেই ভাবে রাখ। এর পর উপরের পীঠটা নীচে, আর নীচের পীঠটা উপরে উলটে দাও। সঙ্গে সঙ্গে চামচে করে একটু একটু ঘি দিতে থাকবে। একই ভাবে না রেখে খুন্তি দিয়ে নেড়ে চেড়ে বা উল্টে পাল্টে দেবে, এর পর ফুলতে সুরু করলে জোড়ের মুখ খুন্তি দিয়ে চেপে ধরে চার দিক দিয়ে একটু একটু ঘি দিবে। তাতে পরটাখানি বেশ ফুলে উঠবে। দু-পীঠই ঈষৎ লালচে রং ধরলে নামিয়ে নেবে।

চৌকো পরটা—বেশী ময়ান দিয়ে ময়দা মাখার পর প্রথমে তাকে লেচি কেটে চাকিতে গোল করে বেল। খানিকটা ঘি বেলা-লেচিটার ওপর হাতে করে লাগিয়ে দাও। তারপর ঐ বেলা লেচিটার তিন ভাগের এক ভাগ ঘিয়ের দিকে উল্টে দাও এবং অপরদিকের তিন ভাগের এক ভাগ

আগেকার অংশের উপর ঐভাবে উল্টে দাও। এখন এটাকে দেখতে লম্বাটে মত হল। এবার লম্বা দুটো দিক আগেকার মত মুড়ে দাও। এখন এটাকে চার কোণা রেখে বেলে পাতলা কর। এইবার খোলায় অল্প পরিমাণ ঘি দিয়ে পরটাকে চেপে চেপে আধ ভাজা করে পরে ছাঁকা ঘিয়ে ভেজে নাও। তাহলে বেশ মচকদার চারকোণা পরটা হবে।

মোগলাই পরটা—বেশী করে ময়ান দিয়ে ময়দা মেখে লেচি গোল করে বেল। বেলা ময়দাটার ওপর আধখানা ডিম ভাঙ্গা (সাদা ও কুসুম শুদ্ধ) ঢেলে দাও। তার ওপর আগে থেকে তৈরী করা কিছু মাংসের কিমা ছড়িয়ে দিয়ে চৌকো পরটার মত ভাঁজ করে খোলায় ভেজে নিলে মোগলাই পরটা হবে।

ডিম ও মাংসের বদলে ঘি এবং নিরামিষ 'পুর' (যেমন ঘুগনি, আলু কপির শুকনো তরকারী, বিট গাজর শালগম প্রভৃতি সিদ্ধ, ছাঁইকরা নারিকেল, ভাজা পেস্তা বাদাম কিসকিসের সঙ্গে মেশান খোয়া ক্ষীর, হালুয়া, সন্দেশ, ইত্যাদি নানা জিনিস) মেশান যেতে পারে।

ঢাকাই পরটা—ময়ান ও খাবার সোডা মেশান ময়দা পাতলা করে মেখে সেটাকে গোল করে বেল। খানিকটা ঘি হাতে করে বেলা ময়দার ওপর লাগিয়ে দাও। বেলা ময়দাটার মাঝখান থেকে একটা ধার পর্য্যন্ত ছুরি দিয়ে কেটে দাও। এবার যেখান থেকে কাটাটা আরম্ভ হয়েছে সেখানে হাত রেখে ধারের দিকে আর এক হাত দিয়ে ওটাকে গোল করে জড়াও। এখন জিনিসটা দেখতে অনেকটা 'কুলপি' বরফের মত হল। এইবার ঐ কুলপিটাকে থেবড়ে দিয়ে লেচির মত কর। এবার গোল করে লেচিটাকে বেল। খোলায় ঘি দিয়ে মন্দা আঁচে চেপে চেপে ভাজ।

ফেণী পরটা—ঢাকাই পরটার মত সব করতে হবে কেবল যেখানে ঘি লাগান হয়েছে, সেটা শুধু ঘি না হয়ে ঘিয়ের সঙ্গে সমপরিমাণ

চালের গুঁড়ি আগে থেকে মিশিয়ে সেই মেশান জিনিসটি লাগাতে হবে। আর ছাঁকা ঘিয়ে সেটা ভেজে নিতে হবে। ভাজবার সময় বেলা ময়দাটাকে এমন ভাবে ছাড়তে হবে যাতে সেটার যেদিকে ময়দার ভাঁজের দাগ পড়েছে সেই দিকটা উপর দিকে থাকে। হাতায় করে খোলার ঘি সেইটির উপর দিয়ে একটু চেপে ধরতে হবে। তাহলে পরটার পাপড়ী ফেণীর (খাজার) মত ফুলে উঠবে।

দ্রষ্টব্য :—ঘিয়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে যে জিনিসটা তৈরী হয় তাকে বলে 'সাঁটা'। ময়দার কোন কিছু তৈরি করবার সময় যদি পাপড়ী খোলার দরকার হয় তা হলে এই 'সাঁটা' মাখবার বিশেষ প্রয়োজন।

পূরি—সাধারণত, আটার লেচি লুচির চেয়ে একটু বেশী পুরু করে বেলে ভাসা ঘিয়ে ভেজে নিলেই তাকে পুরি বলা হয়। কিন্তু পুরির সংজ্ঞা তা নয়। আটা বা ময়দার লেচির খোলে নোন্‌তা বা মিষ্ট পুর ভরে লুচির মতন বেলে অল্প আঁচে ভাসা ঘিয়ে ভেজে নিলে তবে সেই খাদ্যটি পূরি বলে গণ্য হবে। কিন্তু এখন পূরি লুচির পর্য্যায়েই পাশাপাশি চলেছে। পূরের সম্পর্ক নাই বা থাকল, আটার লেচি আর একটু পুরু হলেই তা পূরি হয়ে গেল। লুচি হবে ময়দার লেচি থেকে এই যা তফাৎ।

সাধারণ পূরি—আটায় অল্প নূন ও ঘিয়ের ময়ান দিয়ে জলের সঙ্গে শক্ত করে মেখে লেচি কাট। লেচিগুলি বেলে ভাসা ঘিয়ে ভেজে নিলেই পূরি হল।

ছাতুর পূরি—সাদাসিধা ভাবে ছাতুর পূর দিয়ে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু পুরি প্রস্তুত করবার প্রণালী এইরূপ :—আটা বা ময়দায় পরিমাণ মত ময়ান দিয়ে বেশ করে আগে মাখ। এখন অল্প নূন, কিছু কালজিরা এবং নেবুর রস মিশিয়ে আবার মাখ। অল্প অল্প জল দিয়ে খুব থেসে মাখ। মাখবার দোষে যেন কোথাও শক্ত বা খিচ না থাকে।

লেচি গড়ে আঙ্গুলে টিপে টিপে খোলের মতন কর। তাতে পূর ভরে মুখটি টিপে বন্ধ করে দু হাতের তেলোতে আস্তে আস্তে চেপে পূরির মত কর, কিম্বা অল্প একটু তেল দিয়ে ধীরে ধীরে চাকিতে বেলে ভাসা ঘিয়ে ছেড়ে অল্প আঁচে ভাজ। ভাজবার পর পূরিগুলি উপরে উপরে রেখে চাপা দেবে, তাতে নরম হবে। **পূরের কথা**—এবার বলছি। টাটকা বুটের ছাতুর সঙ্গে জিরা মরিচ, গরমমসলা, লঙ্কার গুঁড়া (কাটখোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে) ও নুন মিশিয়ে অল্প জল দিয়ে শক্ত করে মেখে রাখবে। এই হল পূর। পরিমাণমত নিয়ে পূরির খোলে দিয়ে ভরবে। পূরের ছাতু ভাল কারি-পাউডার দিয়েও মেখে নিতে পার।

ডাল-পূরি—পূরির খোল ঐ ভাবে তৈরী করে ডালের ছাতুর পূরের স্থলে ডালের পূর দিয়ে খোল এঁটে বেলে নিয়ে মন্দা আঁচে ভাসা ঘিয়ে ভাজবে। বিভিন্ন ডালের পূর দিয়ে ডাল-পূরি প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক ডালেব পূর করবার প্রণালী এক রকম নয়। **ডালের অধ্যায়ে** বিভিন্ন ডালের পূর কি প্রণালীতে সহজে প্রস্তুত করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে পূরির পূর ঠিক করে নাও।

জোড়া-পূরি—লেচি গোল করে বেলে তার উপর পূর সমান করে সাজিয়ে দাও। সেই পূরের উপর একখানি লেচি গোল করে বেলে সমান করে বসিয়ে উপর-নীচের পূরি-দুইখানির ধারগুলি আঙ্গুলে টিপে মুড়ে ভাসা ঘিয়ে মধ্যম আঁচে ভেজে নাও।

কচুরি—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বেসন ও ডালের পূর দিয়ে খাস্তার কচুরিও তৈরি করা যেতে পারে। তবে কচুরির ময়ান, লেচির গড়ন এবং ভাজবার প্রণালীতে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেগুলির উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ—

(১) পূরির জন্য ইচ্ছানুরূপ ময়ান দিতে পার, কিন্তু কচুরির ময়দায় ময়ান বেশী দিতে হবে। অন্ততঃ সের প্রতি আধপো ময়ান না দিলে কচুরি খাস্তা হবে না।

(২) লেচিগুলি হাতে টিপে টিপে পূর দিয়ে ভরে জোড়ের মুখগুলি বন্ধ করে পাকিয়ে এঁটে দিবে। চাকিতে বেলবে না এবং বড় করবে না।

(৩) কড়ায় ঘি বেশী পরিমাণে দিয়ে পেকে উঠলে ঘি-শুদ্ধ কড়া নীচে নামিয়ে কচুরির লেচিগুলি ছেড়ে দিয়ে ভাজতে থাকবে। যখন দেখবে ঘিয়ের তাপ কমে এসেছে, তখন পুনরায় উনানে কচুরি শুদ্ধ কড়াটি চাপিয়ে ঘি তাতিয়ে নেবে। তেতে উঠলে আবার নামিয়ে নেবে। এই ভাবে ঘিয়ের কড়া উনানে উঠা-নামা করায় ঘিয়ের তাপ অতিরিক্ত বেশী হবে না—মাঝামাঝি থাকবে। মধ্যম আঁচেই কচুরি ভাজা ভাল হয়ে থাকে। কচুরি ভাজবার সময় ঘিয়ের তাপের উপর বিশেষ নজর রাখা চাই। আঁচের তারতম্য হলে কচুরির গায়ে ফোস্কা পড়বে ও ভিতরের ময়দা কাঁচা থেকে যাবে।

আলু, কাঁচকলা, কচু, মোচা, ইচড়, মাছ, মাংস প্রভৃতির পুর দিয়েও কচুরি প্রস্তুত করা যায়। এই সব পূর করবার প্রণালীও যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিঙ্গাড়া—প্রস্তুত করতে হলে ময়দায় একটু বেশী ময়ান দিয়ে (কচুরিতে যদি সের করা আধপো ময়ান দাও, শিঙ্গাড়ায় ময়ান চাই তিন ছটাক) অল্প নুন সহ খুব করে মাখামাখি কর। চারিটি কাল জিরা ও নেবুর রস একটু দিতে পার। অল্প অল্প জল দিয়ে খুব দলে থেসে মাখ। লেচি কেটে পাতলা লুচির মত বেল। ঐ লুচি ছুরি দিয়ে কেটে দু-খণ্ড কর। প্রতি খণ্ডটি নিয়ে পানের খিলির মতন করে পূর দিয়ে ভরে

মুখগুলি আঙ্গুলে টিপে জুড়ে জোড়ের মুখগুলি মুড়ে দাও। ভাসা ঘিয়ে মধ্যম আঁচে কড়া করে ভেজে তোল।

শিঙ্গাড়ার পূর প্রস্তুত করবার বিভিন্ন প্রণালীগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে :—

(১) সিদ্ধ আলু ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে নুন ও মরিচ গুঁড়ো মাখিয়ে সহজ পূর করে নিতে পার।

(২) সিদ্ধ আলু কুঁচির সঙ্গে জিরা মরিচ তেজপাতা ও গরম মসলা গুঁড়া কিম্বা কারি-পাউডার মিশিয়ে স্বাদের পার্থক্য করতে পার।

(৩) আলু কুঁচির সঙ্গে পরিমাণ মত কাবুলি মটর বা চিনাবাদাম, নারিকেল কুঁচি অল্প ঘিয়ে কারি-পাউডার বা লঙ্কা জিরা মরিচ আদা ও গরমমসলা বাটার সঙ্গে ভাজাভাজি করে অল্প জলে সিদ্ধ কর। পরিমাণ মত নুন ও চিনি দাও। জল শুখিয়ে গেলে গরমমসলা গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নাও। ইচ্ছা করলে কিসমিস ও আমচুর মেশাতে পার।

(৪) ফুলকপি ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে ভাপিয়ে নিয়ে সা-জিরা, সা-মরিচ, গরমমসলা গুঁড়া ও নুনের সঙ্গে মিশিয়ে পূর করে নাও।

(৫) ফুলকপি কুঁচিয়ে ঘিয়ে ঐ সব মসলার সঙ্গে ভাজাভাজি করে নুন, চিনি, কিসমিস ও গরমমসলা মিশিয়ে পূরের রকম-ফের করতে পার। কড়াইশুঁটিও এই পূরে দেওয়া চলে।

(৬) মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আদা বাটা ও টমেটোর রসে মেখে অন্যান্য মসলার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজাভাজি করে নূন, মিষ্টি ও গরমমসলা গুঁড়ো মিশিয়ে পূর করবে। এর সঙ্গে আলু কুঁচি, কপি কুঁচি, কড়াই শুঁটি, চিনাবাদাম ও কিসমিস সংযোগ করতে পার।

(৭) মাংসের কিমা সুসিদ্ধ করে আদাবাটা পিঁয়াজবাটা টক দই বা টমেটোর রসে মেখে কারি-পাউডার যা বিভিন্ন মসলার সংযোগে

ঘিয়ে ভেজে পাক করে পূর করে নেওয়া চলে। পরিমাণ মত নুন, মিষ্টি এবং রুচি অনুসারে কিসমিস পেস্তা বাদাম প্রভৃতি মেশাতে পার।

লুচি—আটা ময়দায় পরিমাণ মত ঘিয়ের ময়ান দিয়ে ভাল করে মাখ। ইচ্ছা করলে এক চিমটা নুন দিতে পার। এই নুনটুকুর সঙ্গে ময়ান দেওয়া ময়দা উত্তমরূপে মেশা চাই। এর পর অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দাগুলি মেখে ফেল। মাখা হলে কিছুক্ষণ থেসে তার পর লেচি কেটে বেল। পাত্রের উপর চারিটি শুক্‌না ময়দা ছড়িয়ে বা একটু তেল মাখিয়ে লেচিগুলি রাখলে জড়িয়ে যাবে না। এখন লেচিগুলি গোল গোল করে বেলে ভাসা ঘিয়ে ভেজে নাও। বেশ ফুলে উঠলে লালচে হতে না হতে ঝাঁঝরিতে তুলে নামিয়ে রাখ।

মিষ্ট লুচি—লুচিতে মিষ্ট দিবার রীতি নাই। তবে মিষ্ট লুচিও অনেকে পছন্দ করেন। তার প্রণালী এইরূপ :

রুলের ময়দা সের করা আধপো চিনির সঙ্গে পরিমাণমত ঘিয়ের ময়ান দিয়ে জলের সঙ্গে মেখে ভাল করে থেসে নাও। লেচি কেটে গোল গোল করে বেলে হাতের কৌশলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেমন করে পেরাকির ধার মোড়ে, সেইভাবে মুড়তে থাক। এর পর ভাসা ঘিয়ে ফেলে কড়া করে ভাজ। এই লুচি অনেকক্ষণ ফোলা অবস্থায় থাকবে।

রঙ্গিন লুচি—ভোজন-বিলাসী বা সৌখিন সমাজের ভোজে রঙ্গিন লুচি দেখে অনেকে অবাক হয়ে থাকেন। কিন্তু সামান্য একটু চেষ্টাতেই অল্পায়াসে রঙ্গিন লুচি তৈয়ারী করা যায়। এর প্রণালী এইরূপ :—

লাল লুচি—বিট পালম জলে সিদ্ধ করলে জলের রং লাল হবে। তার পর সেই লাল জলে, ঘিয়ের ময়ান দেওয়া ময়দা মেখে নিয়ে লুচি ভাজলে লুচির রং লাল হবে।

সবুজ লুচি—ময়দার সঙ্গে পুদিনা পাতা বাটা মিশিয়ে মেখে নিয়ে লুচি ভাজলে লুচির রং সবুজ হবে।

হলদে লুচি—নটকানের দানা কিছুক্ষণে ভিজিয়ে তারপর সেই জলে ময়দা মাখলে রং হলদে হবে।

চাঁপা রঙের লুচি—দুধে জাফরাণ ভিজিয়ে সেই দুধ দিয়ে ময়দা মাখলে, ময়দার রং চাঁপা হবে।

দ্রষ্টব্য—যে কোন রাসায়নিক রংয়ের দ্বারা নানাপ্রকার রং করা যায় বটে কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়। অতএব উদ্ভিজ্জ রংই ব্যবহার করা উচিত। রংএর জল ছাড়া ময়দায় আর যতটুকু জল লাগবে সেটুকু দিতে হবে।

যব ও ভুট্টাজাত খাদ্য

যবের আটা—যবগুলি ধুয়ে শুখিয়ে গমের মত যাঁতায় বা মেসিনে পিষে নিলে উত্তম পুষ্টিকর আটা হয়। অবশ্য গমের সঙ্গে যব মিশিয়ে আটা তৈরী করলে রুটি বেলার পক্ষে সুবিধাজনক এবং খাবার পক্ষেও নরম এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। গমের অভাবে শুধু যবের আটার রুটি বা লুচি তৈরী করতে হলে ময়ান না দিয়ে অল্প অল্প জল খাইয়ে মেখে নিতে হবে। বেলবার সময় কিন্তু লেচিগুলি ময়দায় মাখিয়ে বেলে নেবে, তা না হলে বেলতে খুব অসুবিধা হবে। শুধু যবের আটার রুটির ধারগুলি ফাটা ফাটা হয়, কিন্তু তাতে খাবার পক্ষে অসুবিধা হয় না। রুটি তৈরী হবার পর ঘি মাখিয়ে নেবে।

যবের ছাতু—যবগুলি বেছে জলে ধুয়ে শুখনা মেঝের উপর (রোদে নয়) মেলে শুখিয়ে নাও। শুখিয়ে ঝর ঝরে হলে ঢেঁকির গড়ে,

উদুখলে বা বড় হামানদিস্তায় ফেলে আস্তে আস্তে ঘা দিয়ে এমন ভাবে 'ছেঁটে' বা 'পাল্টে' নাও যাতে যবের গায়ের উপরকার খোসাগুলি উঠে যায় কিন্তু ভিতরকার শস্য না গুঁড়া হয়। এই ভাবে সমস্ত যবগুলি 'পাল্টান' হয়ে গেলে কুলায় ঝেড়ে খোসা বা তুষ থেকে আলাদা করে নাও। এখন হাঁড়ি বা খোলায় উত্তপ্ত বালুতে খই ভাজার প্রণালীতে যবগুলি ভেজে চালুনীতে ফেলে বালু ঝেড়ে ফেল। এর পর ঢেঁকি, যাঁতা বা মেসিনে গুঁড়িয়ে মিহি চালুনীতে ছেঁকে মুখ আঁটা পাত্রে ভরে রাখ। এই চূর্ণই হল বিশুদ্ধ ছাতু। ছাঁকবার পর যে খিঁচগুলি অবশিষ্ট থাকবে, সে-গুলিকে 'মলিখা' বা 'মোল্ক' বলে। চালের ক্ষুদের মত এগুলিও ব্যবহার্য্য খাদ্য। পুনরায় গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিলে এর কিয়দংশ ছাতুতে পরিণত হয়। অবশিষ্ট অংশ গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রিয় খাদ্য।

ভুট্টা, জোয়ার, বজরা প্রভৃতি শস্য থেকেও এই প্রণালীতে ছাতু প্রস্তুত করা চলে।

ছোলা ও মটর এই প্রণালীতে ধুয়ে শুখিয়ে ও কুটে বালুতে ভেজে ছাতু প্রস্তুত করতে পার। এবং যবের ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে তেল, নুন, মরিচ গুঁড়া, নারিকেল কোরা, চিনাবাদাম ভাজা প্রভৃতি অনুপানের সঙ্গে আহার করবে। খেতে যেমন মুখরোচক, তেমনই বলকারক এই খাদ্যটি। কোন দিন বা জলে গুলে মিষ্টির সঙ্গে, কোন দিন বা দধির সঙ্গে মেখে, কোন দিন বা দুধে গুলে আম কলা বা আমসত্তর সঙ্গে মেখে খেতে পার।

আলু কচু ওল কাঁচকলা পেঁপে প্রভৃতি শর্করা-জাতীয় তরকারীগুলির রন্ধন-প্রণালী

এগুলির রাসায়নিক উপাদান—চাল আটা ও ছাতুর মত এই তরকারীগুলির মধ্যেও প্রচুর শ্বেতসার আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্বেতসারই (Starch) চিনিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের দেহ-যন্ত্রটি ভালভাবে চালাতে ইন্ধনের কাজ করে। এই জন্যই স্বাস্থ্যবিদ্‌রা জোর গলায় ইদানীং বলছেন—অন্নকষ্টের সময় এই খাদ্যগুলি পাল্টাপাল্টি বা মিশ্রিত করে অন্নের অভাব কতকটা পূর্ণ করা যেতে পারে! শ্বেতসার ছাড়াও এই খাদ্যগুলির মধ্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস এবং লৌহ আছে। সুতরাং পুষ্টিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই খাদ্যগুলির উপযোগিতাও যথেষ্ট। আবার গোল আলুর অভাবে কচু, রাঙ্গাআলু, ওল এবং কাঁচকলার দ্বারা পূর্ণ করা যেতে পারে। ওল কচু ও পেঁপে পাকস্থলীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। পাকা কলার মধ্যে কাঁচা পেঁপের আঠা তিন চার ফোঁটা মাত্র পূরে প্রত্যহ কিছুদিন খেলে যকৃত ও প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। মাংসের মধ্যে কাঁচা পেঁপে কেটে ডুমো ডুমো করে দিলে অতি শীঘ্র মাংস সুসিদ্ধ হয়। পেঁপে পাতায় মাংস খানিকক্ষণ জড়িয়ে রাখলে মাংস বেশ নরম হয় এবং অল্প সময়ে সিদ্ধ হয়ে যায়।

আলু ছেঁচকি—আলুগুলি ইচ্ছামত ফালা বা ডুমো করে কুটে ফেল। কড়ায় তেল চড়িয়ে শুখনা লঙ্কা ও মেথি ফোড়ন দাও। কাটা আলুগুলি ছেড়ে কষতে থাক। হলুদ, নুন ও আন্দাজমত জল দাও। সামান্য একটু চিনিও দিতে পার। জল মরে এলে নেড়ে চেড়ে শুখিয়ে ঝরঝরে করে নামাও।

আলুর ঘণ্ট—আলুগুলি সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে মেখে মণ্ডের মত কর। (আলুর ঘণ্টের প্রাসঙ্গিক উপাদান হচ্ছে বড়ি। খোসাশুদ্ধ মাষকড়াই ডাল জলে ভিজিয়ে খোসা ফেলে সেই ডাল বেটে বড়ি করে নেবে। এই বড়ি খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ঘণ্টের বড়ি আগে তেলে ভেজে রাখবে।) কড়ায় তেল দিয়ে জিরা, তেজপাতা, লঙ্কা, অল্প মৌরি ও রাঁধুনি এবং রুচি থাকলে হিঙ ফোড়ন দিয়ে আলুর মণ্ড ছাড়। হালুয়া করবার মতন ভাজাভাজি কর। নুন হলুদ ও আন্দাজ মত জল দাও। (জল বেশী না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে) ফুটে উঠলে ভাজা বড়িগুলি ঢেলে দাও। লঙ্কা বাটা ঐ জলে গুলে মেশাও। অল্প পরিমাণ মিষ্টি দিয়ে ঘেঁটে দাও। জল মরে এলে একটু ঘি দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেল।

রাঙা আলু, কচু, ওল, কাঁচকলা, পেঁপে প্রভৃতির ঘণ্টও এই প্রণালীতে রাঁধবে।

আলু ভাজা (১)—আলু চাকা চাকা করে কুঁচিয়ে নুন হলুদ মেখে গরম তেলে ছাড়, তেলের আঁচ কম থাকতে আলু ছাড়লে তেল থেকে ফেনা হবে, কিন্তু সেই অবস্থায় আলুগুলি সিদ্ধ হবে ভাল। কাজেই এরকম তেলে আলুর টুকরোগুলি মোটা মোটা হলেও সুসিদ্ধ হবে এবং রং থাকবে বেশ সাদা। তেল বেশী গরম করে আলু ছাড়লে আলুর রং রাখা শক্ত হয়।

আলু ভাজা (২)—তেলে বা ঘিয়ে তেজপাতা ও পাচফোড়ন ছেড়ে তার সুগন্ধ বের হলে আলু ভাজতে ছাড়। আলু বেশ ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে নাও। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তেল কি ঘিয়ের আঁচ বেশী হওয়া চাই।

আলু ভাজা (৩)—আলুর খোসা ছাড়িয়ে খুব পাতলা করে আলু কুঁচিয়ে নাও। নুন ও মরিচবাটা ও হলুদ মাখাও। কড়ায় ঘি কি তেল একটু বেশী পরিমাণ দাও। বেশ গরম হলে আলুর টুকরো যেমন করে

পাঁপর টুকরো ছাড়ে তেমন করে হাতে করে ঘষে ঘষে ছাড়। টুকরোগুলো যেন বেশী গায়ে গায়ে জড়িয়ে না যায়। অল্পক্ষণ ভেজে তুলে নিলেই বেশ মুচমুচে হবে। এই প্রণালীর আলু ভাজাই Potato Chips নামে পরিচিত।

আলুর ঝুরি ভাজা—আলু পাতলা করে কেটে পুনরায় সরু করে কেটে নাও (সুপারির মত) নুন হলুদ ও মরিচবাটা মাখিয়ে ছাঁকা তেলে বা ঘিয়ে ভাজ। অল্পক্ষণেই ভাজা হয়ে যাবে।

দ্রষ্টব্য—কচু, লাল আলু, মানকচু প্রভৃতি কুঁচিয়ে এই ভাবে ঝুরি ভাজা করা যায়।

গুলি আলু ভাজা—ছোট ছোট আলু জলে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নাও। ছাঁকা তেলে ভেজে নুন ও মরিচ গুঁড়ো মেখে খেতে দাও। নতুন ছোট আলুর খোসা না ছাড়ালেও চলবে।

আলুর পকৌড়ী—ছোট নতুন আলু অল্প পরিমাণ বেসন গোলা, পোস্ত, কালজিরা, নুন (রুচি হিসাবে শুকনা লঙ্কা বাটা বা কাঁচা লঙ্কার টুকরো, মাখিয়ে ছাঁকা তেলে বা ঘিয়ে মন্দ আঁচে ভাজ।

দ্রষ্টব্য—বড় আলুকে টুকরো করে নিয়েও এভাবে আলুর পকৌড়ী করা চলে।

আলুর বড়া (আলুর পাউ ভাজা)—বেসন এক পোয়া, সবেদা আধপোয়া, পোস্ত কালজিরা ও নুনের সঙ্গে বেশ ভাল করে ফেটিয়ে নাতি তরল গোলনা কর। গোলনায় এক চিমটি খাবার সোডা মেশাও। গোলনাটা যেন আলুর গায়ে একটু ঘন হয়ে লেপে থাকে। এবার আলুকে পাতলা পাতলা করে কেটে এক একটা টুকরো ঐ গোলনায় ডুবিয়ে গরম তেলে বা ঘিয়ে ছাড়। ভাজা বেশ কড়া কড়া হলে নামিয়ে নাও।

দ্রষ্টব্য—বেগুন পাতলা করে কুটে ঐ রকম গোলনায় দিয়ে ভাজলে বেগুনী হয়। কুমড়ো, পটল, কুমড়া ফুল, ফুলকপি, কাঁচকলা, স্কোয়াস (squas) প্রভৃতিও এই ভাবে "পাট ভাজা" করা যেতে পারে।

আলুর চপ—আলু সিদ্ধ করে চটকে নাও। নুন মরিচ-গুঁড়ো জিরা-ভাজা-গুঁড়ো মেশাও। একটা করে দলা নিয়ে চাকা চাকা করে গড়। আগেকার মত গোলা-বেসন নিয়ে এক একটা বড়া ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজ।

আলুর কচুরি—ময়দা ময়ান দিয়ে মেখে লেচি কাট। আলু সিদ্ধ করে নুন লঙ্কা ও মসলা দিয়ে পূর তৈরী করে ময়দার লেচির ভিতর দিয়ে মুখটা বন্ধ করে সাবধানে বেলে ফেল। তার পর ভেজে নাও।

আলুর ডেভিল—ডিমের মত আকারের নৈনিতাল আলু বেছে নিয়ে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রাখ। মাংসের কিমাও এমনভাবে সিদ্ধ করে রাখবে যে জলটুকু গায়ে মরে যাবে। এখন ডেক্‌চিতে ঘি চড়িয়ে তেতে উঠলে আন্দাজ মত পিঁয়াজবাটা, আদাবাটা, রসুন, লঙ্কা জিরা মরিচ ও গরমমসলা-গুঁড়া বা বাটা ঘিয়ের সঙ্গে ভাজাভাজি করে নাও। এর পর টমেটোর রস বা টক দধির সঙ্গে সুসিদ্ধ কিমাটুকু মেখে ঢেলে দাও। খানিকটা নেড়ে চেড়ে পরিমাণমত নুন এবং অল্প একটু চিনি দিয়ে মাখামাখি করে নামিয়ে নাও। এইটি হল এর পূর। যে সিদ্ধ করা আলুগুলির খোসা ছাড়িয়ে রেখেছ, এখন একখানি সরু মুখ ছুরি দিয়ে আলুর মাথাটি গোল করে কেটে তার ভিতর থেকে ছুরি বা কাঁটা দিয়ে এমনভাবে শাঁসটুকু কুরে কুরে বার করে নাও যেন আলুর খোলটি ঠিক বজায় থাকে। ঐ খোলের মধ্যে কিমার পূর আস্তে আস্তে ভরে ফেল। এর পর আলুর যে মাথাটি কেটে রেখেছ সেটি ময়দার কাই দিয়ে এঁটে পূর-ভরা খোলটির উপর বসিয়ে মুখটি বন্ধ করে দাও। এখন এ-গুলি তেল বা ঘিয়ে

পিঁয়াজ কুঁচির সঙ্গে লালচে করে ভেজে নাও। এই ভাজা খেতে খুব মুখরোচক হবে। ইচ্ছা করলে এর সঙ্গে মাষ্টার্ড বা গোটা-মসলা মিশিয়ে খেতে পার।

প্রকারান্তর—আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে চটকে নাও বা শিলে বেটে মণ্ডের মত কর। নুন ও জিরামরিচ-গুঁড়া বা বাটা ঐ মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে আতপ চাল চূর্ণ, এরারুট অথবা সিদ্ধ ডিমের কুসুমটুকু খুলে সবগুলি একত্র মাখ। এখন লেচি কেটে খুলির মত করে পূর দিয়ে ভ'রে ডিমের বা পটলের আকারে গড়। তেল বা ঘিয়ে ভেজে নাও। এর পূর—মোচা ইচড় ডাল কপি মাংসের কিমা মাছ প্রভৃতি দিয়ে ইচ্ছা মত তৈরী করতে পার। তৈরী হলে অমনি অমনি না ভেজে বেসনে ডুবিয়ে মোটা সুজি, পোস্তদানা, চালভাজা গুঁড়া বা বিস্কুট গুঁড়ায় মাখিয়ে ভেজে নিয়ে আরও মুখরোচক করা চলে।

কচু ও কাঁচকলা—সিদ্ধ করে এইভাবে ডেভিল বা চপ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আলুর পটপটি—আলুগুলি ডুমা ডুমা করে কুটে তেলে কষে নাও। ঝাড়া বাছা আতপ চাল ঘণ্টা দুই জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জলটুকু ছেঁকে রাখ। কড়ায় তেল বা ঘি চড়িয়ে জিরা, তেজপাতা ও শুখনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে হলুদ ধনে ও লঙ্কা বাটা বা গুঁড়া অল্প জলে গুলে ঢেলে দাও। জলটুকু মরে মসলা বেশ ভাজাভাজি হলে চাল-ছাঁকা জলটুকু ঢেলে দাও। ফুটে উঠলে কষে রাখা আলুগুলি ছাড়। এই সঙ্গে কড়াইশুঁটি কিম্বা ভিজিয়ে রাখা ছোলা বা মটর দিতে পার। আলু সিদ্ধ হলে আন্দাজ মত আদাবাটা জিরামরিচ ও তেজপাতাবাটা মিশিয়ে একটু ঘি, সামান্য চিনি ও আন্দাজ মত নুন দাও। রস মরে থস থসে হলে নামাও।

কচু, ওল, কাঁচকলা, পেঁপে প্রভৃতির পটপটিও এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হবে।

আলুর থাসা—আলু সিদ্ধ করে চটকে মাখ। উনানে পাত্র চাপিয়ে অল্প ঘি বা তেলে জিরামরিচ গুঁড়া, আদা ও পিঁয়াজ কুঁচি ভেজে নিয়ে চটকানো আলু ঢেলে দাও। খানিকটা ভাজাভাজি করে অল্প পরিমাণে জল, লেবুর রস ও নুন দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাক। জলটুকু মরে গেলে একটু ঘি দিয়ে খানিকটা ভাজাভাজি করে নামিয়ে নাও। নামাবার সময় অল্প গরমমসলা গুঁড়া মিশিয়ে দিতে পার।

কচু, কাঁচকলা, ইচড়, পেঁপে প্রভৃতির থাসাও এই প্রণালীতে প্রস্তুত হবে।

সিদ্ধ আলুর সালাদ—আলু সিদ্ধ করে খোসা শুদ্ধ চাকা চাকা করে একটি ডিসে সাজিয়ে রাখ। এনামেলের বা চিনামাটির একটি পাত্রে আন্দাজ মত নূন, মরিচ গুঁড়া, রাই সরিষার গুঁড়া এবং অল্প একটু চিনি একত্র মিশাও। খাঁটি সরিষার তেল এবং লেবুর রস ঐ মিশ্রিত মসলায় ঢেলে দিয়ে একটা চামচে করে ফেটিয়ে নাও। এখন পাত্রের এই মসলা মিশ্রিত তরল পদার্থটুকু ডিসের আলুর উপর এমন সন্তর্পণে ঢেলে দাও যে সব আলুগুলির উপর পড়ে।

সরিষার তেলের স্থলে সুইট অয়েল বা জলপাইয়ের তেল এবং লেবুর রসের স্থলে ভিনিগার বা সির্কা মিশালে স্বাদ আরও উত্তম হবে। টমেটো চাকা চাকা করে কেটে আলুর সঙ্গে দিতে পার। ধনে শাক বাটাও মিশিয়ে দেওয়া চলে।

বিট, শশা, কপি, গাজর, শালগম, মটরশুঁটি প্রভৃতির সালাদও এই প্রণালীতে প্রস্তুত হবে।

ওলের ডালনা—ওল ডুমো ডুমো করে কেটে সিদ্ধ করে এবং

খানিকটা পাকা তেঁতুল জলে গুলে রাখ আগে। আর একটি কাজ করতে হবে এই সঙ্গে—ব্যঞ্জনের পরিমাণ বুঝে শুখনা লঙ্কা পুড়িয়ে গুঁড়া করে, আর কিছু কালজিরা ও গুটিকতক মেতি কাট-খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবে। আলুগুলিও ওলের মত কেটে ফেল। কড়ায় তেল চড়িয়ে জিরা তেজপাতা এবং একটু হিঙ ফোড়ন দিয়ে আলুগুলি ছেড়ে দাও। একটু নেড়ে চেড়েই সিদ্ধ করা ওলগুলি ঢেলে দিয়ে আলুর সঙ্গে একত্র ভাজাভাজি করতে থাক। ভাল ভাবে ভাজা হয়েছে বুঝলে খানকয়েক তেজপাতা আন্দাজ মত নুন, মিষ্টি এবং তেঁতুল গোলা (জলটুকু ছেঁকে) ঢেলে দাও। আলাদা জল আর দিবে না—ঐ জলেই ব্যঞ্জনটি রান্না হবে—তেঁতুল গোলবার সময় এই আন্দাজে জল নেবে। জল মরে ঝোল বেশ ঘন ঘন হয়ে এলে পাত্রটি নামিয়ে নাও এবং লঙ্কা, কালজিরা ও মেথি গুঁড়া ঐ ব্যঞ্জনে ছড়িয়ে দিয়ে মাখামাখি কর। ওলের এই হাল্কা ধরণের ব্যঞ্জনটির আস্বাদ একটু নূতন রকমের হবে।

এই প্রণালীতে কচুর ডানলাও প্রস্তুত করলে বেশ মুখরোচক হবে এবং কচু মুখে লাগবে না।

কচুর কাটলেট—কচুগুলি কুঁচি কুঁচি করে কেটে সিদ্ধ করে জল থেকে ছেঁকে নাও। পাউরুটির গুঁড়ার সঙ্গে সিদ্ধ করা কচুর কুঁচিগুলি চটকে মাখ। এই সঙ্গে মরিচ-গুঁড়া, জায়ফল-গুঁড়া, কালজিরা (আস্ত), লঙ্কা-গুঁড়া ও নুন মিশিয়ে লেচি কেটে হাতে চেপে চেপে কাটলেটের মত গড়ে বেসনে ডুবিয়ে চাল ভাজা গুঁড়া, সুজি বা পোস্তদানায় মাখিয়ে তেলে বা ঘিয়ে ভেজে নাও। পাঁউরুটির অভাবে চালভাজা বা মুড়ি গুঁড়িয়ে নিতে পার।

এই প্রণালীতে কাঁচকলা, ওল, কপি, ইচড়, মোচা ও শাক সবজির কাটলেট হবে।

কাঁচা কচুর সালাড—মানকচুর একটা খণ্ড ডুমো ডুমো করে কেটে শিলে বেশ করে থেঁতো কর। এক টুকরা কাপড়ে ঐ থেঁতো করা কচুর রসটুকু নিংড়ে ফেলে দাও। এখন ঐ কচুর সঙ্গে নারিকেল কোরা মিশিয়ে শিলে পিষে মিহি করে বাট। রাই সরিষা ও কাঁচা লঙ্কা বাটা, নুন, লেবুর রস এবং একটু বেশি করে সরিষার তেল দিয়ে ভাল করে মেখে পরিবেষণ কর। এই খাদ্য খুব মুখরোচক এবং পুষ্টিকর।

শাক-সবজি-জাত খাদ্য

শাক-সবজি থেকে তৈরী খাদ্যগুলির মধ্যে চিনি বা শর্করা, ছানা, (প্রটিন) চর্ব্বি বা মাখন, লবণ, জল এবং ভিটামিন বা শ্রেষ্ঠ খাদ্য-প্রাণগুলির প্রয়োজনীয় সকল অংশই প্রচুর পরিমাণে আছে।

গোড়তে শাক-সবজির গুণের কথা এবং আমাদের খাদ্যে এদের কতখানি প্রভাব—সে-সব কথা—খাদ্য-বিচারে (৫২-৫৯ পৃষ্ঠা) বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত প্রণালীতে শাক-সবজীর রন্ধন প্রণালীও ঐ অধ্যায়ে ভাল করেই উল্লেখ করা হযেছে। কাজেই এখানে সে সব পুনরুল্লেখ করা হল না।

মটর নোটে শুশনি ঢেঁকি ও বিভিন্ন শাক ভাজার প্রণালী—সরিষার তেলে শাকের পরিমাণ বুঝে একটি বা দু তিনটি কাঁচা লঙ্কা অল্প থেঁতো করে এবং দুটি সরিষা ফোড়ন দিয়ে ধোয়া বাছা শাকগুলি ছাড়। খুন্তি দিয়ে শাকগুলি তেলে একটু মাখা-মাখি করে আন্দাজমত নুন, হলুদ-গুঁড়া ও সামান্য একটু চিনি মিশিয়ে পাত্রটি ঢাকা দিয়ে রাখ। শাক থেকে জল বেরিয়ে শাকগুলি সিদ্ধ হবে। শাক বেশি না ভেজে বা শাকে জল না দিয়ে এই ভাবে সুসিদ্ধ করলে শাকের রঙ

ভাল থাকে এবং খেতে নরম হয়। তবে শাক শুখিয়ে গেলে বা ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া শাকে ঢাকা দেবার আগে প্রয়োজন মত জল দেওয়া চলে। রুচি থাকলে ফোড়নের সঙ্গে পিঁয়াজ কুঁচি বা পিঁয়াজ-কলি কুঁচিয়ে দিতে পার। বেগুন কুঁচি কুঁচি করে কেটে এবং মুগ, ছোলা, বুট, কড়াই-শুঁটি প্রভৃতি কষবার সময় শাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে শাকের স্বাদ আরও ভাল হয় এবং পরিমাণে বাড়ে। কষবার পর নুন ও একটু মিষ্টির সঙ্গে এক চামচ কারি-পাউডার দিলে আর হলুদ-গুঁড়া দিবার প্রয়োজন হয় না। এতে শাকের রঙ যেমন খুলবে, স্বাদও বাড়বে।

কলমী শাক ভাজবার সময় তেলে কাঁচা লঙ্কা এবং সরিষার স্থলে কালজিরা ফোড়ন দিবে। খেঁসারি, ছোলা ও মটর শাক ভাজতে হলে কাঁচা লঙ্কা ও সরিষা ফোড়ন দিয়ে বেগুন কুঁচিয়ে শাকের সঙ্গে একত্র ছাড়বে। বেগুন এই সব শাকের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

মেথি গিমা ও ব্রাহ্মী শাকে শুখনা লঙ্কার সঙ্গে জিরা মেথি ও সরিষা ফোড়ন দিবে। এই শাকগুলি থেকে জল কম বেরিয়ে থাকে, সুতরাং প্রয়োজন হলে ঢাকা দেবার আগে একটু জল দিবে। **কুমড়া** শাকের কচি পাতা ও ডগা কুঁচিয়ে নেবে। এর ফোড়নে শুখনা লঙ্কা প্রশস্ত। জল মরে এলে কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে সরিষা বাটা একত্র বেটে মিশিয়ে ভাল করে মাখামাখি করে ও নেড়ে চেড়ে নামাবে। **মুলা সরিষা, কপিপাতা** প্রভৃতি ভাপে সিদ্ধ করে নিয়ে জিরা ও শুখনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সরিষা বাটার সঙ্গে ভাজবে। **ছাঁচি কুমড়া**—সুপুষ্ট তেজালো পাতাগুলি কুঁচিয়ে নেবে। তেলে কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পাতাগুলি ছাড়বে। নুন, সামান্য একটু মিষ্টি, হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে পাত্রের মুখে চাপা দাও। প্রয়োজন হলে অল্প একটু জল ছিটিয়ে দেবে। জল মরে এলে তিল, দুটি ভিজানো আলোচাল ও সরিষা একত্র

বেটে ঢেলে দিয়ে ভাজাভাজি করে নামিয়ে নেবে। **পালং শাকে** জিরা তেজপাত ও শুখনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ভাজবে। এর সঙ্গে বেগুন ও কড়াইশুঁটি সংযোগ করা চলে।

সজিনা ফুল ভাজতে হলে আগে ফুলগুলি একটু ভাপিয়ে জলটুকু গেলে ফেলবে। তেলে শুকনা লঙ্কা ও সরিষা ফোড়ন দিয়ে বেগুন কুঁচির সঙ্গে জলগালা সজিনা ফুলগুলি ছাড়। ভাল করে কষে নুন হলুদ মিশিয়ে ভাজাভাজি করে নামাও।

কচু ও ওলের কচি ডেগো ভাজতে হলে বঁটিতে ছাল ছাড়িয়ে সরু সরু করে কুটে ভাপিয়ে নিতে হবে আগে। তেলে শুখনা লঙ্কা ও কালজিরা ফোড়ন দিয়ে ভাপানো খণ্ডগুলি ছাড়। ভাল করে কষতে থাক। নুন হলুদ লঙ্কাবাটা ও মিষ্টি মিশিয়ে ভাজাভাজি করে নামাও। মসলার সঙ্গে নারিকেল কুরা মিশাতে পার।

কচুপাতা ভাজা—বেসন নুন কালজিরা পোস্তর সঙ্গে বেশ ভাল করে গুলে ফেটিয়ে নাও। ঐ গোলায় একটু খাবার সোডা (সোডি বাই কার্ব্ব) মেশাও। এইবার কচু পাতার বোঁটা ফেলে একটা থালায় খানিকটা বেসন গোলা রেখে তার উপর একখানা কচুপাতা ফেল। হাতে করে একটু গোলা নিয়ে কচুপাতার উপর মাখাও। দেখ, পাতার দুপিঠেই বেশ ভাল করে বেসন মাখান হয়েছে। এইবার পাতাটাকে একধার থেকে অপর ধার পর্য্যন্ত গোল করে গুড়িয়ে ফেল। আর একখানা পাতা নাও এবং ঐভাবে বেসন মাখাও ও গোড়াও। সবগুলি বেসন মাখান হলে একটা হাঁড়ির ভিতর কাঠের টুকরো লম্বা লম্বা করে সাজাও। হাঁড়িতে খানিকটা জল ঢাল। জল যেন কাঠের নীচে থাকে। এবার কচুপাতাগুলো সেই কাঠের উপর এক এক করে সাজাও। পাতা হাঁড়ির চেয়ে লম্বা হলে সেগুলো

ভাঁজ করে মুড়ে নাও। হাঁড়ির মুখে একটা ঢাকা দাও। হাড়িটা সবশুদ্ধ উনানে বসাও। জলটা খানিক ফুটে বাষ্প উঠে ভিতরের বেসনগুলোকে জমিয়ে দেবে। হাঁড়ি নামাও। আস্তে আস্তে পাতাগুলো বের করে নাও। পাতাগুলো যদি পরস্পরে জড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেগুলি খুন্তি বা ছুরি দিয়ে কেটে পৃথক করে নাও। এখন পাতা গুলোকে এক ইঞ্চি পুরু টুকরো করে কাট ও ছাঁকা তেলে ভাজ।

দ্রষ্টব্য—যে কচুপাতা মুখে ধরে না সেই কচুপাতা নেবে। অমৃত-মানের পাতাই এই ভাজাতে খুব উপযোগী।

পলতা ভাজা—বেসনের সঙ্গে আন্দাজমত নুন এবং গোটা সরিষা ও কালজিরা মিশিয়ে জল দিয়ে গুলে ভাল করে ফেটিয়ে নাও। এক চিমটে খাবাব সোডা মিশাও। পলতার পাতাগুলি ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে নাও। বেসন গোলায় পাতাগুলি মাখিয়ে ছাঁকা তেলে বা ঘিয়ে ভাজ। লালচে রঙ হলে তুলে নাও। ইচ্ছা করলে ডাঁটাশুদ্ধ পলতা ঐ ভাবে ভাজতে পার।

পালন শাক, নটে শাক, মুলোশাক, বাঁধা কপির পাতা, হিংচে শাক, কুমড়াপাতা প্রভৃতি এই ভাবে বেসন দিয়ে ভাজা যেতে পারে।

কুমড়াপাতার কাটলেট—কুমড়াপাতাগুলি আগে বাছাই করে ধুয়ে মুছে রাখ। সরিষা বেটে নাও এবং এর সঙ্গে আন্দাজ-মত নুন ও কাঁচা লঙ্কা কুঁচি কুঁচি করে মিশিয়ে ফেটিয়ে ফেল। এর পর এই বাটা সরিষা এক একটি কুমড়া পাতার মাঝখানে দিয়ে এমন ভাবে মুড়ে ফেল ভিতরের কাইটুকু যেন ভাজবার সময় বেরিয়ে না পড়ে। পাতাটি সুকৌশলে মুড়লে খুলে পড়বে না বা কিছু বেঁধবার প্রয়োজন হবে না। ইচ্ছা করলে লঙ্কার বোঁটা, কোন সরু কাটি বা লবঙ্গ দিয়ে পানের

খিলির মত করে বিঁধে দিতে পার। পাতার মোড়কগুলি তৈরি হলে কড়ায় তেল চড়িয়ে এক একটি মোড়া দু-পীঠ লাল করে ভেঁজে নাও।

শাক সিদ্ধ—যে কোন একটি শাক, কিম্বা বিভিন্ন জাতীয় পাঁচ-মিশালী শাক কুঁচিয়ে ভাল করে ধুয়ে কোন পাত্রে ভরে জ্বালে বসাও। এই সময় অল্প একটু নুন শাকের উপর ছড়িয়ে দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দাও। রুক্ষ বা বাসি শাক হলে অল্প জল দিবে। নতুবা শাক থেকেই জল বেরুবে। একটু পরে ঢাকাটি খুলে দেবে। ডালের বড়ি কিছু আগে ভেজে রাখবে। সেই বড়ি এই সময় শাকের সঙ্গে মিশিয়ে দাও। এখন সরিষার তেল, আন্দাজ মত নুন (প্রথমে অল্প একটু নুন দিয়েছ মনে রেখে) শুখনা লঙ্কা গুঁড়া (লঙ্কা পুড়িয়ে বা ভেজে গুঁড়া করে নিলে ভাল হয়) দিয়ে শাকগুলি ভাজাভাজি করে নামিয়ে নাও। রুচি থাকলে এই সঙ্গে পিঁয়াজ কুঁচি ও আদা কুঁচ দিতে পার। পিঁয়াজগুলি বড়ির মত আগেই ভেজে রাখতে হবে—এবং আধ ভাজা করে রাখবে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত শাক খুব পুষ্টিকর এবং মুখরোচক। এর খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকে।

বাঁধা কপির বড়া—বাঁধা কপির পাকা পাতাগুলি ফেলে না দিয়ে সরু সরু করে কুঁচিয়ে নাও। যেমন করে শাক সিদ্ধ করা হয় সেই প্রণালীতে সিদ্ধ করে রাখ। কপির জলে পাতাগুলি যদি সুসিদ্ধ না হয় ত আন্দাজ মত জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। ছোলা মুগ বা মটর ডাল ভিজিয়ে আগে থাকতে মিহি করে বেটে রাখা চাই। এখন সেই ডাল-বাটার সঙ্গে আদা বাটা, কারি পাউডার, অভাবে জিরা মরিচ লঙ্কা বাটা ও গরমসমলা গুঁড়া, অল্প একটু চিনি এবং আন্দাজমত নুন মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে সিদ্ধ কপিপাতাগুলির সঙ্গে চটকে মেখে ফেল। এর পর বড়ার মত করে তেলে ভেজে নাও। এই বড়া ভাজা খেতে খুব সুস্বাদু

হবে। ইচ্ছা করলে আলু, মাছ, কড়াইশুঁটি, টমেটো প্রভৃতি সংযোগে এই বড়ার কালিয়া করতে পার।

কপি সিদ্ধ—বাঁধা কপি, ফুল কপি, ওল কপি, সালগম, গাজর, কুমড়া, মোচা প্রভৃতি সিদ্ধ করে ঘি বা মাখন মেখে নুন ও মরিচগুঁড়া দিয়ে ভাত ও রুটি পরটার সঙ্গে খাবে। মূলা সিদ্ধ করে সরিষার তেল ও নুন মেখে খাওয়াই প্রশস্ত।

কপির রাওতা—কপিগুলি মিহি করে কুটে ভাপিয়ে জলটুকু ফেলে দাও। এখন জলশূন্য কপিগুলি রাই সরিষা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, নুন, চিনি ও দধির সঙ্গে মেখে সরিষার তেল মিশিয়ে নাও। ফুলকপি, সালগম, গাজর, মূলা প্রভৃতির রাওতাও এই প্রণালীতে প্রস্তুত করবে।

বাঁধা কপির মফিন—কপির পাতাগুলি কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে জাল থেকে ছেঁকে মণ্ডের মত করে মাখ। জিরা-মরিচ-গুঁড়া, লঙ্কাবাটা ও নুন মিশিয়ে অল্প ময়দা, অথবা ছোলা বা যবের ছাতু দিয়ে মেখে গোল গোল করে পাকাও। তেলে বা ঘিয়ে ভেজে নাও। ফুল কপি, আলু, ইচড়, পেঁপে, ডুমুর, ওল, কচু প্রভৃতির মফিনও এই প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায়।

কপির ঘণ্ট—কপিগুলি কুঁচিয়ে নাও আগে। আলুগুলি ডুমো ডুমো করে কুটে ফেল। কড়াইশুঁটিগুলি ছাড়িয়ে ভেজে রাখ। পাত্রে তেল চড়িয়ে জিরা, তেজপাত ও শুখনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কপিগুলি ঢেলে দিয়ে উত্তমরূপে কষতে থাক। কপির পাতা পাকা-গোছের হলে ভাপিয়ে নিয়ে কষাই ভাল। কষা হলে জিরামরিচ ও হলুদবাটা জলে গুলে ঢেলে দাও। ফুটে উঠলে ভাজা আলু ও কড়াইশুঁটি ছেড়ে দাও। সুসিদ্ধ হলে নুন ও চিনি দাও। জল মরে এলে অল্প ময়দা বা পিটুলি ঘন করে গুলে মিশিয়ে দাও। কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে বেশ মাখামাখি হয়ে এলে ঘিয়ের সঙ্গে গরমমসলা বাটা ও সা-জিরাগুঁড়া মিশিয়ে নামিয়ে নাও।

ফুল কপি, ওলকপি, সালগম প্রভৃতির ঘণ্টও এই প্রণালীতে রাঁধবে।

কপির বাটি-চড়চড়ি—বাঁধা, ফুল বা ওল কপিগুলি ছোট ছোট করে কাট। আলুগুলিও ঐভাবে কেটে নাও। কড়াইশুঁটিগুলি ছাড়িয়ে ফেল। একটি পিতলের বাটিতে, সবগুলি একত্র করে হলুদবাটা ও নুন মাখাও। কাঁচালঙ্কা চিরে এর সঙ্গে দাও। ডালের বড়ি (মটর, খেঁসারি বা মাসকড়াইএর) দিয়ে সরিষার তেল ও জল ঢেলে বাটিটি জ্বালে বসাও। সিদ্ধ হয়ে জল শুকিয়ে গেলে এবং আনাজগুলি ভাজা ভাজা মত হলে নামাও।

সিম, বরবটি, পটল কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি অন্যান্য আনাজের বাটি-চড়চড়িও এই প্রণালীতে হবে।

ঢেঁড়স-কারি—ঢেঁড়সগুলিকে চাকা চাকা করে কেটে ফেল আগে। উনানে কড়া চাপিয়ে তাতে তেল দিয়ে পাঁচফোড়ন বা হিং ফোড়ন দাও। এবার ঢেঁড়সগুলি কড়াতে ঢেলে সামান্য হলুদ ও নুন দিয়ে সাঁতলে নিয়ে জল ঢেলে দাও। ঢেঁড়সগুলি সিদ্ধ হবার মত জল আন্দাজ করে দেবে। ঢেঁড়স আধসিদ্ধ হলে তাতে পাতি লেবুর রস দাও। জল মরে গেলে নামিয়ে নাও।

গোলাপ ফুলের পাপড়ি-ভাজা—ফুটন্ত গোলাপের পাপড়ী অল্প পরিমাণ বেসনের গোলনায় সামান্য একটু সোডা ও নুন দিয়ে ছাঁকাঘিয়ে পকৌড়ীর মত ঝুরো ঝুরো করে মৃদু আঁচে ভাজ। ভাজতে খুব অল্প সময়ই লাগবে। খেতে খুব সুস্বাদু হবে এবং সুগন্ধে বাড়ী পূর্ণ করে দেবে। দ্রঃ—জিরা পোস্ত প্রভৃতি দিয়ে এর গন্ধ করবার প্রয়োজন নাই।

গুলকন্দ—গোলাপ ফুলের পাপড়ি থেকে প্রস্তুত এই জিনিসটি শুধু সুখাদ্য নয়, পাকস্থলীর পক্ষে হিতকর উৎকৃষ্ট ঔষধ। সুবাসিত

টাটকা গোলাপ ফুলের পাপড়ীগুলি বেছে নিয়ে মিছরীর রসের সঙ্গে কচলাতে থাক। ফুটন্ত জলে আন্দাজমত মিছরী দিয়ে এই রস আগে তৈরী করে রাখবে। রসের সঙ্গে পাপড়ীগুলি কচলাতে থাকলে পাতাগুলি রসের সঙ্গে মিশে বেশ থকথকে মত হবে। তখন কাচের জারে ঐ রস ভরে ঢাকনা এঁটে দেবে এবং প্রত্যহ নিয়মিতরূপে একটি মাস এই মুখ আঁটা জারটি রীতিমত রোদ খাওয়াবে। এক মাস পরেই ব্যবহারযোগ্য উৎকৃষ্ট গুলকন্দ প্রস্তুত হবে। মিছরী অভাবে চিনির রসেও গুলকন্দ তৈরী হতে পারে, তবে মিছরীই প্রশস্ত এবং অধিক উপকারক।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একপো দুধের সঙ্গে আধ তোলা পরিমিত গুলকন্দ ব্যবহার করলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। আমাশয় রোগে সকালে খালি পেটে আধ তোলা গুলকন্দ ইসবগুলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে আমাশয় রোগ উপসম হয়। গ্রীষ্মকালে এই গুলকন্দ সরবতের উত্তম উপাদান।

আম পাতার ডালনা—কচি কচি আম পাতা কুঁচিয়ে শাক সিদ্ধ করবার মত প্রণালীতে জ্বালে বসাও। জল বেরিয়ে এলে জলটুকু না মেরে জল থেকে পাতাগুলি ছেঁকে তুলে নাও এবং জল ফেলে দাও। উনানে তেল চড়িয়ে তেজপাতা, পাঁচফোড়ন ও শুকনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সিদ্ধকরা আম পাতা-কুঁচি, বড়ি, আলু কুঁচি, ভিজানো মটর বা ছোলা দিয়ে কষতে থাক। ভাল কষা হলে জলে গুলে ঢেলে দাও। সিদ্ধ হয়ে এলে একটু মিষ্ট এবং আন্দাজ মত নুন দিয়ে নাড়াচাড়া কর। একটু পরে বেশ মাখমাখ হলে ঘি ও গরমমসলা মিশিয়ে নামিয়ে নাও।

মোচার টিকলি—মোচা কুটে কুঁচিয়ে ফেল। তার পর ঠাণ্ডা জলে অল্প তেঁতুলগুলে কুঁচিগুলি ৫।৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখ। বিকেলে বড়া তৈরী করতে হলে সকালে মোচা কুটে ভিজিয়ে দেবে। আর সকালের

দিকে রান্নার প্রয়োজনে রাতে কুটে ভিজিয়ে রাখবে। মোচার আন্দাজে ছোলার ডালও একই সময় আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে দেবে। যথাসময় মোচা কুঁচিগুলি বেশ করে কচলে কচলে ধুয়ে ফেলে জল নিংড়ে একটা পাত্রে পরিমাণমত জল দিয়ে সিদ্ধ করতে দাও। সুসিদ্ধ হলে একটা চুপড়িতে কুঁচিগুলি ঢেলে দাও—যাতে জলটুকু ঝরে বেরিয়ে যায়। এবার ডালগুলি ছেঁকে নিয়ে শিলে মিহি করে বেটে নাও। চুপড়ি থেকে সিদ্ধ মোচার কুঁচিগুলিও একটা পাত্রে তুলে আদাবাটা, লঙ্কা, জিরা, মরিচ, ধনেবাটা, নুন ও মিষ্টির সঙ্গে চটকে মেখে ফেল। ওদিকে কড়ায় তেল চাপিয়ে পেকে এলে অল্প জিরা ফোড়ন দিয়ে ডালবাটাটুকু আগে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ঐ তেলে ছেড়ে দাও। তার পর মিনিট দুই নেড়ে-চেড়ে মসলামাখা মোচা সিদ্ধ পাত্রে ঢেলে দিয়ে বেশ করে ডাল বাটার সঙ্গে মিশিয়ে দাও। তার পর খানিকক্ষণ ধরে অনবরত নাড়াতে থাক। যখন দেখবে ভাজাভাজি হয়ে আটা-আটা মত হয়েছে তখন গরমমশলা ও জায়ফলগুঁড়া মিশিয়ে বার দুই নেড়ে-চেড়ে নামিয়ে ফেল। হাতসওয়া মতন হলে গোল চৌকো লম্বা বা বাদামী যে কোন আকারে টিকলি গড়ে ডালনা বা দম রাঁধ। সে সময় এর সঙ্গে আলু ছোলা মটর প্রভৃতি মিশাতে পার। যেভাবে ডালনা বা দম তৈরীর ব্যবস্থা, সেই ভাবেই রাঁধবে।

এই প্রণালীতে ইচড় এবং কাঁচকলার টিকলিও তৈরী করা যেতে পারে।

শাক-সব্জীর আচার—যে সকল শাক-সব্জী আমরা তরকারীরূপে ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি, সেগুলিকে চাটনি বা আচারের উপাদান করলে খেতে যে খুব মুখরোচক হয়, এবং বিভিন্ন শাক-সব্জীর সাহায্যে কি ভাবে সুস্বাদু আচার হতে পারে, তার প্রণালীও বনমালা দেবী তাঁর ছাত্রীদের শিখিয়ে দিয়েছেন। যথাঃ

ধনে শাক—গোড়ার অংশ কেটে শাকগুলিকে পরিষ্কার জলে

বেশ করে ধুয়ে, পরিমাণ মত তেঁতুল (বিচি ফেলে শাঁসটুকু কাইয়ের মত হবে) কাঁচালঙ্কা, আদা ও নুন এক সঙ্গে শিলে পিষে তুলে নাও, অল্প চিনিও দিতে পার। এটি খুব মুখরোচক হজমী চাটনি।

পুদিনা শাক—ঐ প্রণালীতেই তৈরী করবে। এই প্রণালী কাঁচা-চাটনির। ইচ্ছা করলে কড়ায় সরিষার তেল চড়িয়ে, জিরা ফোড়ন দিয়ে এই কাঁচা কাই অল্প নেড়ে-চেড়ে ভেজে নিতেও পার।

বাঁধা কপি—ভিতরের সাদা অংশটি কুঁচি কুঁচি করে কেটে গরম জলে ধুয়ে নাও। চীনেমাটির একটি পাত্রে খানিকটা সির্কা অথবা ভিনিগার ঢেলে কপির কুঁচিগুলি তাতে ফেলে নুন, রাই সরিষারগুঁড়া ও চিনি দিয়ে বেশ করে মাখামাখি করে একটি ঘণ্টা এইভাবে রাখ। এদিকে মোটরশুঁটি, আলুকুঁচি এবং বিট কুঁচি কুঁচি বা চাকা চাকা করে কেটে সুসিদ্ধ করে নাও। কাঁচালঙ্কা গুটি দুই কুঁচি কুঁচি কর। (আলু ও বিটের খোসা ছাড়িয়ে সুসিদ্ধ করে কুঁচি করবে) এবার এনামেলের বা চিনামাটির একখানি কাণা উঁচু থালায় সির্কা মাখানো কপির কুঁচিগুলি সাজিয়ে তার উপরে সিদ্ধ বিট, আলু ও মটরশুঁটিগুলি (নুন ও মরিচগুঁড়ো মাখিয়ে) আল্‌গা ভাবে ছড়িয়ে দাও। সবার উপরে কাঁচালঙ্কা কুঁচিগুলি গায়ে গায়ে না মেশে এমন করে সাজিয়ে দিবে। ইচ্ছা করলে পিঁয়াজের কুঁচিও এইভাবে দিতে পার। চপ কাটলেট ও মাংসের সঙ্গে এই সব্জী-চাটনি খুব ভাল লাগে।

হিঞ্চে শাক—হিঞ্চে শাকের মাথার দিকের কচি ডাঁটাটুকু পাতা শুদ্ধ কেটে নিয়ে গরম জলে ধুয়ে ফেল। পরিমাণ মত আদা, কাঁচালঙ্কা ও পিঁয়াজ (পিঁয়াজে রুচি না থাকলে অল্প রাই-সরিষা) এক সঙ্গে শিলে পিষে বেটে নাও। একটি চীনামাটির পাত্রে কাইটুকু তুলে নুন ও লেবুর রসের সঙ্গে মাখামাখি কর। কড়ায় সরিষার তেল

চাপিয়ে হিং ও জিরা ফোড়ন দিয়ে ঐ কাই ঢেলে দাও। অল্প জল দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে ফেল। এই চাটনি অত্যন্ত হজমি এবং উপকারী।

সিম—সিমগুলি গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দু ধারের এঁসো খুলে ফেল (সিমের দুদিকের বোঁটা দুটি ভেঙ্গে আস্তে আস্তে নীচের দিকে টানলে দু'ধার থেকে এঁসো খুলে আসবে) এবার তাপে অল্প ভাপিয়ে (সিমগুলির গায়ে অল্প নুন মাখিয়ে একটি পাত্রে ভরে পাত্রটির মুখ বন্ধ করে উনানে অল্প তাপে চাপালেই জল বেরিয়ে ভেপে উঠবে, জলটুকু মরলেই নামাতে হবে) রাখ। চীনামাটির বাটিতে (পাথর বাটি হলে আরো ভাল হয়) খানিকটা সরিষার তেল ঢেলে তার সঙ্গে নুন, হলুদ-গুঁড়া, শুকনা লঙ্কা-গুঁড়া মিশিয়ে সিমগুলি মিশিয়ে ফেল। পাত্রের মুখটি ঢাকা দিয়ে রোদে দাও, তিনটি দিন পুরো রোদে রাখা চাই। তার পর আর তিন দিন ঠাণ্ডায় থাকবে। এই ছয় দিন পরে খাবার যোগ্য মুখরোচক অম্ল-আচার হবে।

ছানা জাতীয় বিভিন্ন খাদ্য (প্রটিন)

ডাল, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আধুনিক প্রণালীতে রন্ধন করিবার প্রণালী

ডাল থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য

ডালের গুণ—খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত এই যে, মাছ, মাংস, ডিম, পনির ও দুগ্ধ প্রভৃতিতে যে পরিমাণে প্রাণীজ 'প্রটিন' আছে, ডালের মধ্যেই পূরাপুরিভাবে তা পাওয়া যায়। এই জন্যই সঙ্কটকালে খাদ্য-সমস্যার সমাধান-কল্পে তাঁরা ব্যবস্থা দেন যে, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির প্রভৃতি যাঁদের প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করবার সামর্থ্য আছে, তাঁরা যেন 'ডাল' জিনিসটি দরিদ্রদের জন্য ছেড়ে দেন। কারণ, ধনীরা ডাল ব্যবহার না করলে দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে ডাল সংগ্রহ করা হয়ত সহজ হবে, আর ডাল থেকেই তারা এমন প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রটিন পাবে, যাতে তাদের শরীর ধারণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হবেনা। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, ডাল যদি ভাত বা রুটির সঙ্গে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা যায়, মাছ মাংস ডিম সংগ্রহ করতে না পারলেও শরীরের কোন ক্ষতি হয় না।

ডাল রাঁধবার প্রণালী—রাঁধবার আগে ডালগুলি ঝেড়ে বেছে ও পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া উচিত। ভাজা ডাল কিন্তু জলে ধোয়া হবে না। ডাল রাঁধবার পক্ষে মৃদু আঁচই প্রশস্ত, তাতে ডাল সুসিদ্ধ হয়। ডাল রাঁধবার সাধারণ প্রণালী এই যে, প্রথমে একটি পাত্রে জল চড়িয়ে দেবে। ডালের পরিমাণ অনুসারে জলের পরিমাণ হবে। এক পোয়া

ডালের জন্য পাঁচ পোয়া জল নেওয়া যেতে পারে। আবার ডাল অনুসারে জলের পরিমাণের তারতম্য হবে। যেমন কড়ায়ের ডালে অপেক্ষাকৃত বেশী জল দিতে হবে। ডাল খুব পাতলা রাখতে হলে এক পোয়া ডালের জন্য দু সের জল চড়াবে। ফোটবার সময় যদি দেখ জল মরে এসেছে কিন্তু ডাল সিদ্ধ হয় নি—আরো জলের প্রয়োজন, তখন ডালের হাঁড়িতে গরম জল আন্দাজ করে ঢেলে দেবে। ডালে তরকারী বা মাছ দিতে হলে ডাল সিদ্ধ হয়ে এলে তখন সেগুলি দেওয়া উচিত। গলদা চিংড়ি, মাছের বা পাঁঠার মুড়ি দিয়ে ডাল রাঁধতে হলে ডাল সিদ্ধ হবার মুখেই মিশিয়ে দেওয়া ভাল, তাহলে ডালের সঙ্গে এগুলি সুসিদ্ধ হবে। ডাল পুরানো হলে সিদ্ধ হতে বিলম্ব হয়, এক্ষেত্রে ডালে অল্প তেল মাখিয়ে নিলে সুসিদ্ধ হবে। যদি দেখ ডাল খুব বেশী পুরানো হওয়ায় বা অনেকদিন আবদ্ধ থাকায় কিছুতেই গলছে না, তখন খাবার সোডা তেল মাখানো ডালের সঙ্গে অল্প পরিমাণে মেখে এবং কিছুক্ষণ রেখে ফুটন্ত জলে ছেড়ে দেবে। ফুটন্ত জলে ডাল ঢেলে দেবার একটু পরেও সোডা দিতে পার। তবে যে ডাল কিছুতেই সিদ্ধ হতে চায়না, সেই প্রকার ডালেই সোডা দিবে। অড়হর, বুট, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল তেল বা ঘিয়ে অল্প কষে নিয়ে ফুটন্ত জলে দিলে শীঘ্র সিদ্ধ হয়ে থাকে। ফোটবার সময় ডাল উথলে উঠলে হাতায় করে ডালের ঝোল হাঁড়ি থেকে তুলে আর একটা পাত্রে রাখবে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ঝোল পুনরায় ঢেলে দেবে। উথলাবার সময় ডালের হাঁড়িতে আধ পলা তেল ঢেলে দিলে ডাল আর অত জোরে উথলাবে না। যখন দেখবে ডাল বেশ সিদ্ধ হয়েছে, তখন ঘি, মসলা, নুন ও মিষ্টি দেবে। এই সময় কাঁটা দিয়ে ডাল নেড়ে চেড়ে দিতে পার। ডাল পাতলা, ঘন বা থসথসে—যে রকম রাখতে চাও, সেই মত হলে নামিয়ে ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নেবে।

কাঁচা মুগ, কড়াই, শিম, বরবটি প্রভৃতি ডাল কাটখোলায় বা ঘিয়ে ভেজে রাঁধলে তবে তাদের স্বাদ ভাল হয়। অনেকে বালুতে এই সব ডাল ভেজে রাঁধতে দেন। এ ব্যবস্থা আরো ভাল।

টকের ডাল—মুগ মটর খেঁসারি প্রভৃতি ডাল কাঁচা আম, আমড়া, আমচুর, চালতা, করঞ্চা, কামরাঙ্গা, তেঁতুল, জলপাই, আলুবোখরা প্রভৃতি সংযোগে রাঁধা হয়ে থাকে। এই ডাল টক বা অম্বলের ডাল ব'লে পরিচিত। ডাল সুসিদ্ধ হলে পরিমাণমত যে কোন অম্লরস বিশিষ্ট আনাজ ডালে ঢেলে দিতে হয়। সিদ্ধ হয়ে এলে ডালের সঙ্গে মিশে গেলে নুন হলুদ আদা বা আঁবাদা বাটা ও মিষ্টি মিশিয়ে দেবে। তার পর শুকনা লঙ্কা ও সরিষা ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে নেবে।

তিত ডাল—খেঁসারি ও ছোট মটর ডালই তিত দিয়ে রাঁধা প্রশস্ত। অনেকে কাঁচা মুগ এবং মুসুর ডালও তিত দিয়ে রাঁধেন। তিত ডাল খুব মুখরোচক খাদ্য। এই ডাল রাঁধতে হলে ফুটন্ত জলে ডালগুলি অল্প তেল মাখিয়ে ছেড়ে দাও। সিদ্ধ হয়ে এলে কাঁটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে তিত তরকারির সঙ্গে অন্যান্য তরকারি যদি দিতে চাও—এক সঙ্গে ছাড়। যেমন—উচ্ছে, করলা, হিংচে, বেতের ডগা প্রভৃতি যে কোন একটি তিত আনাচ এবং আনুষঙ্গিক আনাজ—সাঁচি কুমড়া, শশা, লাউ, সিম, মূলা ইত্যাদি দিতে পার। ডাল ও তরকারিগুলি সিদ্ধ হলে আন্দাজ মত নুন মিষ্টি দিয়ে নামিয়ে রাখ। এখন উনানে কড়া চড়িয়ে ঘি বা তেল দাও, পেকে উঠলে ভাঙ্গা সরিষা, মেথি ও আদা বাটা ফোড়ন দিয়ে তরকারি শুদ্ধ ডালটুকু সমস্ত ঢেলে দাও। একটু ফুটিয়ে নামিয়ে নাও। নামাবার মুখে নারিকেল কুরা বা নারিকেল বাটা এবং ঘি এই ডালে মিশিয়ে দিলে স্বাদ আরও ভাল হয়।

ডালের মসলা ও ফোড়ন—জিরামরিচ, ধনে ও লঙ্কা

বাটাই ডালের প্রধান মসলা। অড়হর ডালে জিরা বাটা এবং কড়ায়ের ডালে মৌরি ও আদা বাটা নামাবার আগে ঘিয়ের সঙ্গে দিলে ডাল সুস্বাদু হয়। মাছ মাংস সংযোগে যে ডাল রাঁধা হবে, তাতে ঝালের দিক দিয়ে জিরামরিচ বাটা, লঙ্কা বাটা এবং পিপুল বাটা—ডাল ফুটে উঠলে দেবে। মুগ ও কড়াই ডালে নামাবার আগে আদা ছেঁচে ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। মুগের ডালে জিরামরিচ, হলুদ, লঙ্কা বাটা প্রভৃতি মসলার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিবে। এবং ঘিয়ের সঙ্গে শুকনা লঙ্কা, তেজপাতা, ছোট এলাচ, জিরা বা রাঁধুনি ফোড়ন দেবে। মুসুর ডালে পিঁয়াজ, রশুন বা হিং ফোড়ন দিলে আস্বাদ বাড়ে। মাস কড়াইডালে ঘিয়ের সঙ্গে জিরা, মৌরি, তেজপাতা ও শুকনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে নামাবে এবং নামিয়ে আদা ছেঁচা মিশিয়ে দিবে। সাধারণতঃ কড়াই ডালে হিং এবং মৌরি ফোড়ন দিয়েই নামানো হয়। কিন্তু যে ফোড়নই দাওনা কেন, ফোড়ন দিয়ে সাঁতলাবার পর নামিয়ে আদা ছেঁচা কড়াই ডালে দেওয়া চাই-ই। বুট বা ছোলার ডাল নামাবার আগে ঘিয়ের সঙ্গে গরম মসলা বাটা মিশিয়ে দিবে। ইচ্ছা করলে এই সময় পিঁয়াজ কুঁচি ভেজে এবং আদা ছেঁচে দিতে পার। নামাবার পর সাঁতলাবার সময় তেজপাতা, শুকনা লঙ্কা, এবং দারুচিনি দু'চার খণ্ড ফোড়ন দিবে। মটর ও খেঁসারি ডাল না ভেজেই রাঁধবে। এই দুটি ডাল ফুটন্ত জলে না দিয়ে রাঁধবার সময় তেল মাখিয়ে ঠাণ্ডা জলে ঢেলে দিয়ে জ্বালে চড়াবে। পূর্ব্ববঙ্গে অনেকে রাঁধবার আগে মটর ও খেঁসারি ডাল খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তার পর ছেঁকে তুলে নিয়ে নুন ও তেল মাখিয়ে জলের সঙ্গে জ্বালে চড়ান। মটর ও খেঁসারি ডালে তেলের সঙ্গে কাল জিরা ও কাঁচা লঙ্কা ফোড়নই প্রশস্ত। স্থান বিশেষে এই দুই ডালে হলুদ দেওয়া হয় না। কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে মেথিও এই দুই ডালে ফোড়ন দেওয়া চলে।

অনুষঙ্গ যোগে ডাল রন্ধন প্রণালী

মাংসের সঙ্গে ডালের সুপ—হাঁড়িতে একটু বেশী জল দিয়ে মাংস সিদ্ধ করতে দাও। মাংসগুলি আধা সিদ্ধ হয়ে এলে ভাজা ডাল ছাড়। ডাল ও মাংস সিদ্ধ হলে জিরা মরিচ, হলুদ, লঙ্কাবাটা, নুন এবং একটু মিষ্টি মিশাও। নামিয়ে ঘিয়ের সঙ্গে জিরা, তেজপাতা, লঙ্কা, পিঁয়াজ, রশুন, গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে হাঁড়ির ডাল-মাংস ঢেলে দাও। একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে আদা ছেঁচা মিশাও।

আর এক প্রণালীতে এই সুপ প্রস্তুত করা যেতে পারে। যথা—পূর্ব্বোক্ত ভাবে মাংসগুলি আধা সিদ্ধ হলে হাঁড়িতে ডাল ছাড়। সুসিদ্ধ হলে হলুদ, বাটা মসলা, নুন ও একটু মিষ্টি দাও। খানিকক্ষণ রেখে নাড়াচাড়া করে আর একটা পাত্রের মুখে শক্ত বস্ত্র খণ্ড বেঁধে হাঁড়ির ডাল-মাংস ঢেলে ছেঁকে ঝোলটুকু নিংড়ে বার করে নাও। এখন ঘিয়ে তেজপাতা, পিঁয়াজ, রশুন ও গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে ঐ ছাঁকা ঝোলটুকু ঢেলে দিয়ে সাঁতলে নাও।

ছোলার ডালের আমিষ কারী—উপকরণঃ মাংসের কিমা আধসের, ছোলার ডাল এক পোয়া, ঘি এক ছটাক, পিঁয়াজ বাটা এক ছটাক, আদা বাটা আধ ছটাক, লঙ্কা বাটা, হলুদ ও জিরামরিচ বাটা, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, দালচিনি, নুন ও চিনি পরিমাণ মত, টক দই বা টমেটোর রস আধ পোয়া। প্রস্তুত প্রণালীঃ ডালগুলি আগে আধ সিদ্ধ করে রাখ—এমন আন্দাজে জল দাও যেন সুসিদ্ধ হবার আগেই ডালগুলির সঙ্গে মাথামাখি হয়ে যায়, ছেঁকে নিতে না হয়। এর পর অল্প আঁচে পাকপাত্রটি চড়িয়ে অল্প ঘিয়ে কিমাটুকু ছাড় এবং সেই সঙ্গে আদা,

পিঁয়াজ বাটা ও দই বা টমেটোর রস থেকে সিকি পরিমাণ নিয়ে ঐ কিমার সঙ্গে খুন্তি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে পাত্রের মুখটি ঢেকে দাও। জল দিবার প্রয়োজন হবে না—কিমা থেকেই জল বেরিয়ে সিদ্ধ হতে থাকবে। লক্ষ্য রাখবে, জল মরে যেন তলা ধরে না যায়। জলটুকু শুখিয়ে এলে ভাল করে নেড়ে চেড়ে একটি পাত্রে কিমাটুকু ঢেলে রাখ। পাকপাত্রটি পুনরায় আঁচে চড়িয়ে ঘিটুকু ঢেলে দাও। ঘি পেকে উঠলে তেজপাতা লবঙ্গ ছোট এলাচ দালচিনি ফোড়ন দিয়ে বাকি আদা ও পিঁয়াজ বাটাটুকু ঐ ঘিয়ে ঢেলে দাও। খানিকক্ষণ খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করবার পরে পিঁয়াজগুলি ভাজাভাজি হয়ে এলে লঙ্কা, হলুদ ও জিরামরিচ বাটাটুকু ঐ সঙ্গে দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাক। দু চারবার নাড়াচার পর অল্প টমেটোর রস বা জলের ছিটে দিবে—তাতে মসলাগুলো ভাজবার সুবিধা হবে। বেশ ভাজাভাজি হলে দই বা টমেটোর রসটুকু ঐ সঙ্গে মিশিয়ে দাও। এর পর অল্পক্ষণ নাড়াচাড়া করে আধ সিদ্ধ ডাল ও কিমা ছেড়ে দাও। এই সময় খুব ভাল করে খুন্তি দিয়ে মসলার সঙ্গে ডাল ও কিমাগুলি যাতে মিশে যায় সেইভাবে নাড়াচাড়া করা চাই। যখন বেশ ভাজাভাজা হয়ে আসবে, সেই সময় আন্দাজমত জল (গরম হলে ভাল হয়) ঢেলে অল্প নাড়াচাড়ার পর নুন ও চিনি দিয়ে পাত্রের মুখটি ঢেকে দাও। ডালগুলি সুসিদ্ধ ও কিমার সঙ্গে মাখামাখি হলে নামিয়ে নাও।

মটর ডালের ঘণ্ট—উপকরণ: আলু, বেগুন, পটল, কাঁচকলা, সীম, বরবটি, ধুধুল, লাউ, কুমড়া, কপি প্রভৃতি সময়োপযোগী পছন্দমত দু তিনটি মিশিয়ে বা যে কোন একটি আলাদা; মটর ডাল; সরিষা তেল, কাঁচালঙ্কা, আদা, নুন, হলুদ বাটা ও অল্প মিষ্টি (গুড় বা চিনি) রাই সরিষা গুঁড়া। প্রস্তুত প্রণালী: আনাজগুলির খোসা ছাড়িয়ে সরু সরু করে কুঁচিয়ে রাখ। আনাজের পরিমাণ অনুসারে

মটর ডাল (কুঁচানো আনাজ যদি এক সের হয়, ডালের পরিমাণ হবে এক পোয়া) ৫।৬ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে তার পর ছেঁকে নিয়ে শিলে বেটে ফেল। কড়ায় অল্প তেল চড়িয়ে ডাল বাটাটুকু একখানা মোটা রুটির মত করে ঐ তেলে বেশ করে ভাজাভাজি করে নাও। এক পীঠ লালচে রং হলে উলটে দিয়ে অপর পীঠটিও লালচে করে ভেজে তুলে রাখ। ঐ কড়ায় আর একটু (দু পলা আন্দাজ) তেল চড়িয়ে অল্প সরিষা গুঁড়া, আদা বাটা ও ৪।৫টি কাঁচালঙ্কা চিরে ফোড়ন দিয়ে কুঁচানো আনাজগুলি ঢেলে নাড়তে থাক। ভাজাভাজি হলে হলুদ বাটা, নুন ও মিষ্টি দিয়ে আন্দাজ মত জল ঢেলে বেশ করে মিশিয়ে দাও। জল মরে এলে মটর ডালের ভাজা রুটিখানি ভেঙ্গে হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে তরকারির উপর ছড়িয়ে দাও ও খুন্তি দিয়ে নাড়তে থাক। জল একবারে মরে শুকনো শুকনো হলে পলা দুই তেল চার পাশে ছড়িয়ে দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে ফেল।

মটর ডালের ডালনা—শীতকালে অনেক রকম তরি-তরকারি পাওয়া যায়, সে সময় নতুন কিছু রাঁধবার জন্যে বড় একটা ভাবতে হয় না। মুস্কিল পড়ে বর্ষাকালে। এই ব্যঞ্জনটি গ্রীষ্ম বা বর্ষকালের পক্ষেই প্রশস্ত। উপকরণ: মটর ডাল, আলু পটল কুমড়া বেগুন, মূলা, কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারি, তেল, নুন, অল্প ঘি ও সাধারণ মসলা-পাতি, দু চারটি কাঁচালঙ্কা আর তেজপাতা। প্রস্তুত প্রণালী: মটর ডাল এক ভাগ আর সব রকম তরকারীগুলি কুটে তিন ভাগ। ডালগুলি বেছে ধুয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে আগে। তার পর তরকারীগুলি কুটে ধুয়ে অল্প নুন-হলুদ মাখিয়ে তেলে ভাল করে ভেজে নাও। বেশ ভাজাভাজি হলে জল ঢেলে সিদ্ধ করতে দাও। ফুটে উঠলে সিদ্ধ করা মটর ডালগুলি পাত্রে ঢেলে ভাল করে মিশিয়ে দাও। একটু পরে পরিমাণ মত

হলুদ বাটা, (তরকারিগুলিতে অল্প হলুদমাখা আছে বুঝে) জিরামরিচ বাটা ও কাঁচালঙ্কা চিরে ওতে ছেড়ে দাও। জল মরে তরকারিগুলি বেশ সিদ্ধ হয়ে এলে পরিমাণ মত মিষ্টি ও নুন দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নাও। লক্ষ্য রাখবে, তরকারীগুলি বেশ সিদ্ধ হবে বটে—কিন্তু গলে না যায় একেবারে। পাত্রের তরকারী আর একটি পাত্রে ঢেলে রেখে, আগের পাত্রটি পরিষ্কার করে উনানে চাপিয়ে একটু ঘি পাকাতে দাও, তার পর যে পরিমাণ ঝাল খাও সেই বুঝে কাঁচালঙ্কা চিরে পাকানো ঘিয়ে ছেড়ে দাও; লঙ্কাগুলি ভাজাভাজি হলে ২।৪ খানি তেজপাতা ও কালজিরা ফোড়ন দিয়ে পাত্রের ডাল-তরকারীটুকু সমস্ত ঢেলে একবার ফুটিয়ে নামিয়ে নাও। নামাবার আগে ইচ্ছা করলে আর একটু ঘি ও গরমমসলা দিতে পার।

মটর ডালের এই ডালনাটি বর্ষার ভারি মুখরোচক ব্যঞ্জন।

ডালের পূর

ছোলার ডাল—ডালগুলি ঝেড়ে বেছে জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিয়ে কিম্বা শুখনা ডাল সিদ্ধ করে 'আধ-কচড়া' করে বেটে নাও। কড়ায় ঘি বা তেল চড়িয়ে জিরা, মরিচ, লঙ্কা, তেজপাতা বাটা বা গুঁড়া সম্বরা দিয়ে ঐ বাটা ঢেলে ভাজাভাজি করে গরমমসলা গুঁড়া, নুন এবং অল্প একটু চিনি মিশিয়ে নামিয়ে ফেল।

মটর, বুট ও কাঁচামুগের ডালের পূরও এইভাবে তৈরী হবে। তবে কাঁচামুগের ডাল এক ঘণ্টার বেশী জলে ভিজিয়ে রাখবে না।

মাস কড়ায়ের ডাল—ভিজিয়ে বাটবার মত করতে ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে। আর এ ডালের সম্বরার মসলাও আলাদা। ডালগুলি ভিজে উঠলে খোসাগুলি খুব সহজেই পরিষ্কার করা যাবে। তখন আধ-

কচড়া করে শিলে বেটে রাখ। কড়ায় ঘি চড়িয়ে জিরা, মৌরি, কালমরিচ ও তেজপাতা চূর্ণ করে হিঙ্গের সঙ্গে ফোড়ন দাও। একটু নেড়েচেড়ে ডাল বাটা ছেড়ে দাও। এমন ভাবে কষতে থাক যে খুব বেশী ভাজাভাজি না হয়। মাঝারী রকম ভাজা হয়েছে বুঝলে, অল্প গরম জলে জিরা মরিচ ও কাঁচালঙ্কা বাটা গুলে ঢেলে দাও। নুন মিশিয়ে নাড়তে থাক। জলটুকু মরে গেলে আদা বাটা মিশিয়ে বার দুই নেড়েচেড়ে নামিয়ে নাও।

কড়াই শুঁটি—দানাগুলি ছাড়িয়ে শিলে বেটে নাও। এই বাটা অপেক্ষাকৃত মিহি হবে। কড়ায় ঘি চড়িয়ে সা-জিরা (অভাবে জিরা) শুকনা লঙ্কা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ডাল বাটা ছেড়ে দাও। নাড়তে থাক। মনে রেখো, খুব বেশী কষা হবে না। অল্প জলে জিরা মরিচ লঙ্কা বাটা গুলে ঢেলে দাও। নুন মিশিয়ে নাড়তে থাক। জলটুকু শুকিয়ে গেলে আর একটু নেড়েচেড়ে গরমমসলা গুঁড়া মিশিয়ে নামিয়ে ফেল।

ডালের এই পূর আটা-ময়দার কচুরি এবং আলু-কচু-কাঁচকলা প্রভৃতি চপের উপাদান। এই পূর চ্যাপটা বাদামী বা গোল গোল করে বেসনে ডুবিয়ে বড়া করেও খাওয়া চলে।

ডালের খাবার

চানাচুর—ছোলাকে হিন্দীতে চানা বলা হয়। ছোলাগুলি বেছে জলে ভিজিয়ে দাও। অন্তত বারো ঘণ্টা জলে ভিজবে। তারপর ছেঁকে তুলে গায়ের জল মরে গেলে শিলের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে আস্তে আস্তে থেঁৎলে নাও। না ভিজিয়ে কিম্বা অল্পক্ষণ ভিজিয়ে উত্তাপে ঈষৎ ভাপিয়ে নিয়েও এইভাবে থেঁতলাতে পার। সমস্ত ছোলাগুলি চিপ্‌টানো হয়ে

গেলে জল হাত ক'রে হলুদ নূন ও গোলমরিচ গুঁড়ো ভাল করে মাখিয়ে (মরিচ অভাবে শুকনা লঙ্কা গুঁড়া বা বাটাও মাখাতে পার) শুকনো মেঝের ওপর মেলে শুকাতে দাও। বেশ ঝরঝরে হলে কাট-খোলায় ভেজে নাও। সাবধান, বালিতে ভাজবে না। শুকনো কড়াতেই ভেজে নেবে। এই ভাবে তৈরী চানাচুর চায়ের সঙ্গে খাবার একটি মুখরোচক খাবার। ইচ্ছা করলে মুড়ির সঙ্গে মিশিয়ে সরষের তেল ও 'গোটা' মাখিয়ে খেতে পার।

ডালের বেসনের হালুয়া—পাত্রে ঘি চড়িয়ে তেজপাতা ও গরম মসলা ফোড়ন দাও। মুগ বা ছোলার ডালের বেসনগুলি এখন আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে ভাজতে থাক। বেশ ভাজাভাজি হলে জল ও চিনি দিয়ে সিদ্ধ করতে থাক। বেসন যে পরিমাণ, চিনি তার অর্দ্ধেক হওয়া চাই। জল মরে থসথসে হয়ে এলে বাদাম, পেস্তার কুঁচি, কিসমিস, সা-মরিচ ও জায়ফলের চুর্ণ মিশিয়ে নামিয়ে নাও। জলের বদলে দুধ দিয়ে খাদ্যটিকে আরো বেশী উপাদেয় করা চলে।

ডালের বরফি—ডালের বরফি করতে হলে, আগে ডালগুলি ভিজিয়ে শিলে মিহি করে বেটে নেবে। তারপর, যে পরিমাণ ডালবাটা, তার অর্দ্ধেক পরিমাণ চিনি জলে গুলে জ্বালে চড়িয়ে রস করে রাখবে। সাধারণ একতারবন্ধ রস হলেই হবে। এখন কড়ায় ঘি চড়িয়ে ডালবাটা-টুকু কষতে থাক। বেশ ভাজাভাজি হলে, খোয়া ক্ষীর ঐ সঙ্গে মিশিয়ে বেশ করে নাড়তে থাক। ডালের সঙ্গে ক্ষীরের অংশ গুলি মিশে বেশ ভাজাভাজি হয়ে এলে, চিনির রস ঢেলে দাও। ঐ রসে ভাজাগুলি সিদ্ধ হতে থাকবে। বেশ গাঢ় হয়ে এলে পেস্তা, বাদাম কুঁচি , কিসমিস, ছোট এলাচ ও জায়ফলচুর্ণ মিশিয়ে থালা বা বারকোসে একটু ঘি মাখিয়ে তার উপর ঢেলে বেশ করে বিছিয়ে দাও। এখন একখানা কলাপাতা ঐ খাদ্য বস্তুটির ওপর রেখে বেলুনের সাহায্যে খুব ধীরে ধীরে বেলে সমান করে

নাও। মসলা ও পেস্তা-বাদামচুর্ণগুলি ইচ্ছা করলে আগে না দিয়ে এই সময় মিছরি বা চিনির বুকমির সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে পার। ঠাণ্ডা হয়ে বেশ জমে গেলে ছুরি দিয়ে কেটে ইচ্ছামত আকারে বরফি তৈরী করে নাও। কাঁচা ও ভাজা মুগ, বুট, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল জলে ভিজিয়ে নরম করে বেটে নিয়ে এইভাবে বরফি করা হয়।

মাসকড়াইয়ের হালুয়া—উপকরণঃ মাসকলাই ডাল ভিজান একপোয়া, দুধ এক সের, চিনি আধপোয়া, ঘি আধপোয়া, কিসমিস এক ছটাক, বাদাম আধ ছটাক, পেস্তা আধ ছটাক, তেজপাতা ৩।৪ খানি, গোলাপী আতর দু ফোঁটা। প্রস্তুত প্রণালীঃ ডালগুলি ভিজলেই খোসা আপনি খুলে যাবে। খোসাশূন্য ডালের জল ঝরিয়ে বেশ লালচে করে ঘিয়ে ভেজে নাও। দুধটুকু আলাদা পাত্রে ফুটতে দাও। গোটা তিনেক বলক ওঠবার পর ভাজা ডালগুলি ঐ ফুটন্ত দুধে ছেড়ে দাও। দুধের সঙ্গে ফুটে ফুটে ও সুসিদ্ধ হয়ে ডালগুলি যখন মাখো মাখো হয়ে আসবে তখন চিনি মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে কিসমিস বাদাম পেস্তা তেজপাতা সব ঢেলে দাও। আর একটু ভাজাভাজি করে নামিয়ে ফোঁটা দুই আতর মিশিয়ে নামাও।

মাছ থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য

মাছের গুণ—ডালের মত মাছও বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিন খাদ্য, খাদ্যে ছানাজাতীয় যে পুষ্টিকর পদার্থটি অধিক পরিমাণে থাকে খাদ্য-বিজ্ঞানে তাকে য়্যালবুমেন (Allbumen) বলা হয়। ছোট বড় সকল প্রকার মাছের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে এই 'য়্যালবুমেন' আছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, শিঙ্গী মাছের মধ্যেই এই জিনিসটি সব চেয়ে বেশী আছে। শিঙ্গীর পরেই মাগুর মাছের নাম করা যেতে পারে। শুধু প্রোটিন নয়, এই দুইটি মাছের মধ্যে লৌহও খুব বেশী পরিমাণে আছে। মাগুর মাছে লোহার ভাগ ৬০, ক্যালসিয়াম ২০০, ফস্ফরাস ২৯০ এবং শিঙ্গী মাছে লোহা আছে ২২৬, ক্যালসিয়াম ৬০০, ফস্ফরাস ৩১০। পক্ষান্তরে এই দুইটি মাছে চর্ব্বির ভাগ কম। এই জন্যই রোগী ও প্রসূতিদের পথ্য হিসাবে চিকিৎসকগণ এই মাছ দুটির ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। মাছের মত মাছের তেলও সুখাদ্য এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কড মাছের যকৃতের তেলে (cod liver oil) যে পরিমাণে 'এ' এবং 'বি' ভিটামিন আছে, বাঙলা দেশের রুই, মৃগেল, কাতলা, কালবোস, ইলিশ, বোয়াল, শোল, শাল, ধাঁই প্রভৃতি মাছের যকৃতের তেলে তার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে ঐ দুই শ্রেণীর ভিটামিন আছে। এই সকল মাছের যকৃত অংশটি কেটে কুঁচিয়ে জলের সঙ্গে জ্বাল দিলে উত্তাপে তেল বেরিয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। সেই তেল সংগ্রহ করে সঞ্চয় বা ব্যবহার করা যেতে পারে কড লিভার অয়েলের মত। জ্বাল দেবার সময় পাত্রের মুখটি ঢেকে রাখতে হবে।

ছোট ছোট মাছের মধ্যেও প্রচুর খাদ্য প্রাণ আছে। দেহেরক্ত উৎপাদন করে জীবনীশক্তি বাড়াতে, মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চার করতে, চক্ষুকে নির্দোষ ও সতেজ করে তুলতে মাছ একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। সুতরাং মাছকে রুচি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যে পরিণত করবার অনেকগুলি নূতন তথ্যই পিকনিকের প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে।

মাছ ভাজা—মাছ ভাজবার আগে যে সব মাছের আঁকা আছে তাদের আঁকা গুলি ভাল করে ফেলতে হবে। পাকনাগুলো কেটে ফেলে মাছের পেটের ভিতর কার পোঁটা ও কানকোর ভিতরের গলসাগুলো ফেলে দিতে হবে। প্রয়োজনমত মাছের গায়ে আজি আজি (লম্বা লম্বা) দু চারটে বঁটির দাগ দিবে। এই দাগগুলো যেন মাছের মাঝখানের কাঁটা (মেরুদণ্ড) পর্য্যন্ত গভীর হয়। তাহলে মাছের ভিতরে মাছের গায়ে মাখানো নুন প্রবেশ করবার সুবিধা হবে। লালাযুক্ত মাছে আগে নুন মাখিয়ে তারপর : য় নিলে সহজে লালা কেটে যায়।

এখন মাছগুলোকে ভাল করে ধুয়ে ফেল। যদি বেশী লালাযুক্ত মাছ হয়, তাহলে তাকে খরখরে জায়গায় ঘষে ঘষে লালা তুলে দাও। মাছে নুন হলুদ ও সামান্য লঙ্কাবাটা মাখাও। খোলায় তেল দিয়ে উনানে চাপাও। জেনে রেখো, মাছ তেলে ভাজাই ভাল হয়, ঘিয়ে ভাজলে যতটা বড় মানুষী দেখানো হয় ততটা স্বাদের উন্নতি হয় না। আর এই তেলের মধ্যে সরিষা তেলই প্রকৃষ্ট। চর্ব্বি বা অলিভ অয়েলে ইংরিজী ধরনে মাছ ভাজা হয় বটে, কিন্তু তাও সরিষার তেলের মত সুস্বাদু হয় না এবং ব্যয় সাপেক্ষ।

এইবার মাছগুলিকে তপ্ত তেলে ছাড়। খোলায় একটার পাশে একটা মাছের টুকরো যেন থাকে। ঘর-যোগের রান্নায় অল্প স্বল্প তেলে কাজ সারতে হয় বলে এই রকম প্রক্রিয়াই ভাল। যজ্ঞির রান্নায়

খুব বেশী তেলে মাছ ভাজা হয় ব'লে, গাদা করে মাছ ছেড়ে দিলেও মাছের চারদিকেই স্নেহ পদার্থটি পাবার সম্ভাবনা থাকে। মাছ বেশ সাবধানে উলটে পালটে 'পিট পিট' করে ভাজতে থাক। ডিমযুক্ত মাছ হলে তার পেটের দিকটাও খোলার উপর মাছটি স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাবে জলে থাকে, সেই রকম করে ধরে ভাজ। একাধিক মাছ এক সঙ্গে খোলায় দিলে তারা পরস্পরের ঠেস পেয়ে ঠিক ঐ ভাবেই থাকবে। একটা মাছ হ'লে অবশ্য খুন্তি দিয়ে ধরে তাকে ঐ রকম করে ভাজতে হবে। মাছের রঙ বাদামী হলেই মাছ ভাজা হয়েছে বুঝবে।

রুচি ভেদে কারো কড়া কড়া, কারো বা নরম ভাজা মাছ পছন্দ হয়। সুতরাং রাঁধুনির সেটা জেনেই রান্না করা ভাল। এটাও জেনে রাখা মন্দ নয় যে, কোন কোন মাছ কড়া কড়া ভাজা না হলে খেতে ভাল লাগেনা, আবার কোন কোন মাছ কড়া করে ভাজলে অখাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম বঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা—এবং খুব পাতলা পাতলা করে দাগা কুটে কড়া করে ভাজাই রুচিকর। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ইলিস মাছ ভাজাটাই অচল। সেখানে কাঁচা ইলিসের রান্নার আদরই অধিক। যে সব মাছে 'য়্যালবুমিন' বেশী, সে সব মাছ কম ভাজাই ভাল। নতুবা য়্যালবুমিন 'জড়িয়ে' শক্ত হয়ে যাবে। ডিম মাত্রই য়্যালবুমিন প্রধান, সেইজন্য ডিম যত নরম করে ভাজা যায় ততই ভাল। যে সব মাছ পুরু নয়—যেমন ফেঁসা খয়রা প্রভৃতি, সেগুলি কড়া করে ভাজাই রুচিকর। মুড়োগুলো কড়া করে ভাজাই ভাল; কেননা, মুড়োর শক্ত কাঁটাগুলো বেশী ভাজা হলে নরম হয়ে যায়। গোটা মুড়ো চিবিয়ে খেতে তখন ভোক্তার অসুবিধা হয় না।

তপ্ত অবস্থাতেই মাছ ভাজা পরিবেশিত হওয়া দরকার। কারণ, জুড়ানো ও গরম মাছ ভাজার স্বাদের তফাৎ অনেকখানি।

বেসন, চাল-পিটুলি, বিস্কুটের গুঁড়ো, ময়দা (গোলা বা শুকনো) এবং অন্যান্য প্রলেপ মাখিয়ে মাছ ভাজার কথাও যথাস্থানে আছে।

পারসে মাছ ভাজা—ভাল করে 'বাছা' ও ধোয়া মাছ নুন হলুদ (এবং রুচি হলে পিঁয়াজ বাটা) মাখিয়ে পূর্ব্বোক্ত রকমে খোলায় ভাজ। মাছগুলি ডিমওয়ালা হলে, ডিমযুক্ত মাছ ভাজবার কথা স্মরণ রেখ। খেতে দেবার সময় গরম মাছ ভাজায় দু'ফোঁটা পাতিনেবুর রস দিলে স্বাদের উন্নতি হবে।

বাটা, পমফ্রেট, গুড়জাউলি প্রভৃতি ছোট মাছ ঐভাবে ভাজা ও পরিবেশন করা যেতে পারে।

ইলিসমাছ ভাজা—ডিমশূন্য ইলিসই অধিকতর স্বাদু। সুতরাং ইলিসমাছ যখনই আনা হবে, সেটা যাতে ডিমশূন্য হয় সেটা লক্ষ্য রাখা ভাল। ডিমের দরকার হলে আলাদা সংগ্রহ করবে। কলকাতার বাজারে আলাদা করে ডিম বিক্রী হয়।

আস্ত মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে তারপর ডুমো-ডুমো করে কুটে নাও। এতে মাছের ভিতরের স্নেহ পদার্থ কু বেরিয়ে যায় না। তারপর নুন হলুদ লঙ্কাবাটা মাখিয়ে ভাজ। মনে রেখ, ইলিস মাছে পিঁয়াজ দিলে তার স্বাদের যথেষ্ট ব্যতিক্রম হয়, তখন সেটা বিস্বাদে দাঁড়ায়। কাশী কানপুর প্রভৃতি পশ্চিম-অঞ্চলের ইলিস মাছ কম তৈলাক্ত বলে এক রকম সুঁটকে গন্ধযুক্ত; সে সব ইলিস মাছ রাঁধবার সময় একটু পিঁয়াজ রশুন-বাটা দিয়ে ঐ সুঁটকে গন্ধ কমানো যায়।

ইলিসের ডিম ভাজা—ডিম বেশী 'পুরুষ্টু' হলে ডিমের দানা মোটা ও করকরে হয়। সুতরাং অপরিপুষ্ট ডিম ভাজাই বেশ মোলায়েম ও মুখরোচক।

ডিমগুলি টুকরো টুকরো করে কুটে নিয়ে 'মন্দা' আঁচে বাদামী রঙ

করে ভাজ। ডিমের 'য়্যালবুমিন' তেল 'গেঁজিয়ে' দেয়। সুতরাং সর্ব্বদাই যে কোন ডিম ভাজতে অল্প তেল ব্যবহার করা উচিত। গোটা ডিম ভাজতে হলে দেখা যায় তাপে সেটা বেঁকে অর্দ্ধচন্দ্রের মত হয়েছে। ডিম সরল বা সোজা রাখতে হলে সামান্য প্রক্রিয়ার দরকার। একটু পরিশ্রম করলে রাঁধুনীর কৃতিত্ব ভোক্তাদের বিস্ময় সৃষ্টি করবে নিশ্চয়। সরু সরু কাটি মসলা মাখানো ডিমের মধ্যে লম্বা-লম্বিভাবে এপার-ওপার করে চালিয়ে দাও। তারপর যদি সে ডিম খোলায়, বিশেষতঃ 'ফ্রাইং প্যানে' ভাজা যায় তাহলে ডিম সরল থাকবে। পরিবেশনের সময় কাটিটি খুলে নিলেই হবে।

কইমাছ ভাজা—কই মাছ বড় অবস্থায় 'ছিবড়ে' হয়, সুতরাং খুব বড় কই দর্শনডালি হতে পারে, খাদ্য হিসাবে তত ভাল নয়। মাঝারি কই-ই উপাদেয়। তাছাড়া কৈ-মাছে 'য়্যালবুমেন' বেশী থাকায় বেশীক্ষণ তাপে রাখা ভাল নয়, তাতে মাছ 'কুঁড়িয়ে' শক্ত হয়ে যায়।

প্রথমত, মাছগুলির কানকো কেটে ভেতর থেকে কলসা ফেলে দাও। মাছের দুধারের সারিবদ্ধ কাঁটা তুলে ফেলতে পারলেই ভাল হয়, নতুবা কেটে বাদ দাও। কাঁটাগুলি তুলে ফেলতে হলে একটা সারির ন্যাজের দিকের প্রান্তটি বঁটিতে বাঁধিয়ে ধীরে ধীরে টান, দেখবে তখন ডাক্তাররা যেমন দাঁত তোলে, কাঁটাগুলি মূলশুদ্ধ উঠে যাবে। অপর সারির কাঁটগুলিও ঐভাবে তুলবে। কণ্ঠার হাড়গুলো কেটে বাদ দাও। তারপর বুকের কাছের পাখনাগুলো গোড়াশুদ্ধ কেটে ফেলে গলার ভিতর দিয়ে আঙ্গুল চালাও, মাছের পোঁটাটি অমনি বুকের ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মাছে যদি ডিম থাকে ত পেটের মধ্যেই থাক, আঁসগুলি ভাল করে ছাড়িয়ে মাছের গায়ে লম্বালম্বি ভাবে একটা করে বঁটির আঁচড় দাও, তারপর একটা খরখরে জায়গায় ঘষে ধুয়ে ফেল, তাতে

মাছের গায়ের লালা সব উঠে যাবে। এই রকম সামান্য একটু কোট-বার পরিশ্রম করলে খাবার সময় আর কাঁটার জন্য বিরক্ত হ'তে হবে না। এইবার মাছগুলিতে নুন হলুদ মাখিয়ে একটু তেল বেশী দিয়ে ভেজে ফেল। ভাজা বেশী না হয়।

আর একরকম প্রণালী—উপরোক্ত উপায়ে মাছগুলো কোট, মাছের গায়ে বঁটি দিয়ে এড়ো ভাবে আঁজি আঁজি ডোরা কাট। ডোরার সংখ্যা একটু বেশী হওয়াই ভাল। এবার মাছে নুন হলুদ ও লবঙ্গবাটা মাথ। মাছ-প্রতি তিন চারটে লবঙ্গ হলেই হবে। মসলা মাথানো মাছ ঘণ্টা খানেক একটা পাত্রে ঢেকে রেখে দাও। এবার মাছগুলিকে ভাজ ও তপ্ত অবস্থায় পরিবেশন কর। সাধারণ ভাবে ভাজা কৈ মাছের যা স্বাদ হয়, এভাবে ভাজলে তার চেয়ে বেশীই হবে।

কৈ মাছের কানকো ভাজা—কৈ মাছের কানকো-গুলো নুন হলুদ মাখিয়ে কড়া করে ভাজলে বেশ মুখরোচক হয়। তবে যাঁদের দাঁত শক্ত, তাঁদের পক্ষেই সেগুলো উপযোগী হবে।

ফেঁসা মাছ ভাজা—কাঁটা বহুল ব'লে এ মাছটা অনেকে পছন্দ করেন না, কিন্তু একটু যত্ন করে কুটলে এ-মাছের ভাজা অত্যন্ত উপাদেয় হয়।

আঁস, কানকো, কলসা ও পাথনাগুলো ফেলে দিয়ে মাছের গায়ে পীঠ থেকে পেট পর্য্যন্ত বেশ ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে বঁটির দাগ দাও। বলা বাহুল্য, ভাজবার জন্য মাছ একটু বড় বড়ই হওয়া চাই। তাহলে একটা বিঘৎ প্রমাণ মাছের প্রত্যেক পীঠে ন্যূনাধিক চল্লিশটি দাগ পড়বে। দাগের গভীরতা সম্বন্ধে মাছ ভাজার প্রথমেই বলেছি,—অর্থাৎ দাগগুলি যেন মাঝের কাঁটা পর্য্যন্ত হয়। এবার নুন হলুদ মাখিয়ে ভাজ। জুড়োলে খেতে দাও। দেখবে, মাছের মধ্যকার সুরু কাঁটার একটিরও অস্তিত্ব নেই।

খয়রা, চেলা, সরলপুঁটি প্রভৃতি কাঁটা-বহুল ছোট মাছ এই রকম করে ভাজা যেতে পারে।

বোম্‌লা মাছ ভাজা—বোম্‌লা বা নি-হেড়ে মাছ বাঙ্গলা দেশের অনেকে পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু এই মাছটিই রোদে শুকনো হয়ে যখন 'বোম্বে ডাক' (Bombay Duck) নামে অভিহিত হয়, তখন অনেক ইংরাজেরও প্রিয় খাদ্য ও মাদ্রাজী ব্যবসায়ীর পকেট পূর্ণকারী হয়ে দাঁড়ায়। নামেই মনে হয় মাছটি নি-হেড়ে অর্থাৎ হাড়-শূন্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়, এর হাড় আছে; তবে সেগুলো নমনীয়। মাছের মধ্যে অবশ্য কাঁটা কিছুই নেই। এই মাছে জলীয় ভাগ অত্যন্ত বেশী থাকায় পাক করলেও স্বাদ-নেদে থাকে। কাজেই ভোক্তার রুচিকর হয় না। কিন্তু একটু শ্রমস্বীকার করে রাঁধলে একেও শুধু রুচিকর নয়—রহস্যোদ্দীপকও করা যায়। মাছের নিমকির মত স্বাদ এই বোম্‌লা বা নিহেড়ে মাছেই আছে। সুতরাং জামাই ঠকানো আমিষ-নিমকি খাওয়ার ব্যবস্থা এ থেকে হতে পারে।

একটু পুরুষ্টু বড় মাছ সংগ্রহ কর। মাছের মাথাটা কেটে ফেলে দাও। পেটের পোঁটাগুলোও বের করে ফেল। এবার ধারালো ছুরি দিয়ে ঘাড়ের কাছ থেকে নেজ পর্য্যন্ত মাছটাকে দুভাগ করে চিরে ফেল। একটা চেলায় শীড়দাঁড়ার কাঁটাটা অবশ্য থাকবে, অপর চেলাটা হবে কাঁটাহীন। লেজের পালকাগুলো ফেলে দাও। এবার একখানা ঝাড়ন, গামছা বা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় মাছের ফালাগুলো একটি একটি করে সাজাও। কর্ত্তিত দিকগুলি অবশ্য নীচের দিকেই থাকবে। ন্যাকড়াটি ভাল করে মুড়ে মাছগুলোকে চাপা দাও। এক খানা বড় পীড়ে ঐ মাছের ওপর রেখে তার উপর আধ মণ ত্রিশ সের ওজনের 'জাঁক' দাও। যেমন ময়রারা ছানায় জাঁক দেয়। জাঁকের

জন্য অন্য গুরুভার জিনিস যোগাড় না থাকলে বড় এক বালতি জলই যথেষ্ট। এই ঝাঁকে বা চাপের নীচে মাছগুলিকে ঘণ্টা খানেক রেখে বার করলে দেখবে, চাপের চোটে তার ভেতরকার জলীয় অংশ সব বেরিয়ে গেছে এবং সেগুলি হয়েছে বেশ পাতলা। এবার তাতে গোল মরিচ গুঁড়ো ও নুন মাখাও। বাটা মসলার কিছুই দেবার প্রয়োজন নেই, তবে আবশ্যক বোধ করলে দুটি শুকনো ময়দা মাখাতে পার। এবার একটু বেশী তেলে মাছগুলি ভাজ। দেখবে মুড়মুড়ে নিমকিই দাঁড়িয়েছে।

মৌরলা মাছ ভাজা—একটু বড় বড় মৌরলা মাছ সংগ্রহ কর। কানকো ও পাখনাগুলো কেটে ফেলে দাও। পেটের পোঁটা বার করবার চেষ্টা ক'রনা, অত ছোট মাছের পেট থেকে পোঁটা বার করতে গেলে প্রায়ই পিত্তি ফেটে গলে যায়, তাতেই মাছের স্বাদ দাঁড়ায় তেতো। কিন্তু পেটের ভিতর পোঁটাটা বজায় থাকলে পিত্তি গলবার ভয় থাকে না, অথচ রান্নার পরও এই পিত্তির জন্য মাছের স্বাদের কোন ব্যতিক্রম হবে না। মাছগুলোকে একটি খরখরে জায়গায় জল দিয়ে ঘষলেই আঁসগুলো ছেড়ে যাবে, সুতরাং আঁস ছাড়াবার জন্য কোন লেঠা নেই। এইবার মাছগুলোকে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে একটা চুপড়িতে খানিকক্ষণ রেখে জলটা ঝরিয়ে দাও। নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো মাখিয়ে ছাঁকা তেলে 'চারটি-চারটি' করে ভাজ। দু ফোঁটা নেবুর রস সহযোগে পরিবেশন কর। এই মৌরলা মাছই ইংরাজের কাছে White Beats এবং শোনা যায় নাকি, গর্ভিণী মেমসাহেবদের এটা খুব মুখরোচক খাদ্য।

অনুসঙ্গযোগে মাছ ভাজা

গ্রেনফ্রেট মাছ ভাজা—মাছের পালকা ও মাথা কেটে গলার কাছে ছিদ্র পথ দিয়ে পেটের আঁতড়ি ফেলে দাও। মাছগুলো ধুয়ে শুকনো নেকড়া দিয়ে মাছের গায়ের জল শুকিয়ে নাও। কালমরিচ গুঁড়ো ও নুন সংযুক্ত চারটি শুকনো ময়দায় উপর মাছগুলো এপিঠ-ওপিঠ করে গড়িয়ে নাও। এবার খোলায় ভাজ। এই মাছ ভাজাটা তেল না হয়ে মাখনে ভাজলেই ভালো হয়। এবং পরিবেশনের সময় খানিকটা গলানো মাখন মাছের ওপর ঢেলে দিলে খুব উপাদেয় হ'বে। সামান্য নেবুর রস যোগে এ মাছ ভাজা খেতে অত্যন্ত রুচিকর।

ইচ্ছা করলে ভাজা মাছের গায়ে লাগা ময়দায় আস্তরণ হাতে করে বা ছুরির ডগা দিয়ে সহজেই তুলে দিতে পার। সে ক্ষেত্রে এই ভাজা মাছের রঙই দেখতে হবে ঠিক কাঁচা মাছের মত।

তপসে মাছ ভাজা—ডিমযুক্ত সুপুষ্ট তপসে মাছের মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে কলসা ও পেটের আঁতড়ি ফেলে দাও। ডিম পেটের মধ্যেই থাকবে। সোঁয়া ও পালকাগুলো ফেলে আঁস উঠিয়ে দাও। ভাল করে ধুয়ে পূর্ব্বোক্তরকমে ময়দা মাখিয়ে ভাজ।

দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ—ডিমের গোলায় মাছটি ডুবিয়ে বিস্কুটের মোটা গুঁড়োর ওপর গড়িয়ে নাও। ফ্রাই পানে ভাজ।

এইভাবে পারসে, ভাঙন, ভেটকি প্রভৃতি মাছের 'ফ্রাই' ভাজা যেতে পারে।

তৃতীয় প্রকরণ ঃ—একটু নুন, লঙ্কাবাটা, কালজিরে ও পোস্ত সংযুক্ত বেসন নাতি তরল করে গুলে তপসে মাছ সেই গোলায় চুবিয়ে

নাও ও সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত তেলে ছাড়। ফলে 'মাছের বেগুনি' তৈরী হল। মচক থাকতে থাকতে খাও।

চিঙ্গড়ি মাছের শাঁস, ভেটকি, ভাঙ্গন, ভোলা, সিলং প্রভৃতি মাছের এইভাবে বেগুনি করা যেতে পারে।

বেসন গোলার পরিবর্ত্তে ময়দার গোলায়ও মাছ চুবিয়ে ভাজা যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের মচক বেশীক্ষণ থাকে না।

ভেলা ভাজা—গলদা চিংড়ির মাথা থেকে দাড়াগুলো, খোলাটা ও ভিতরকার 'চার' (পাকস্থলী) ফেলে দিয়ে ধুয়ে ফেল। নুন ও লঙ্কা হলুদবাটা মাখাও। সবেদা বা চাল-পিটুলি বাটা নাতি তরল করে গুলে নাও। চারটি কালজিরা মেশাও। তপ্ত তেলে ঐ গোলায় ডোবানো মাথাগুলি একটি একটি করে ছাড়। অল্পক্ষণেই ভাজা হয়ে যাবে। মচক থাকতে থাকতে খাও।

এই ভাজার জন্য গলদা চিংড়ির মাথাই উপযুক্ত। বাগদা চিংড়ির মাথা ঘৃতহীন বলে তেমন উপযুক্ত নয়। তবে বড় গলদা না হয়ে মাঝারী রকম গলদা চিংড়ির মাথাই গেরস্থ-সংসারের বেশী উপযোগী।

কাঁটা শূন্য করে ইলিসমাছ রাঁধবার ব্যবস্থা—অনেকের মুখে অনেক রকম শোনা যায়। কেউ বলে, মাছ ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখলে মাছের কাঁটা গলে যায়। কারুর মত, গোঁড়া নেবুর রসে ভিজালে ইলিসের কাঁটা থাকে না। আরও কত লোককে কত রকম কথাই বলতে শুনেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'পিকনিকে' পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওসব কিছুতেই ভিজিয়ে জড়িয়ে রেখে মাছের কাঁটা একটিও ক্ষয়ানো যায় না। মাছের কাঁটা হাত দিয়েই তুলতে হয়। অবশ্য, ইলিস মাছের ঘণ্ট রাঁধবার সময় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যদি একটা কাটিতে কতকটা পাট বেঁধে রাজমিস্ত্রীর 'পোঁচড়া'র মত একটা

কিছু তৈরী করে নিয়ে, সেইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে নাড়া যায় কতক কাঁটা পাটের গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে পাটের ফেঁশোয় ব্যঞ্জনটিকে খাবার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর করে তোলে এবং সব কাঁটাও এই প্রক্রিয়ায় বেরোয় না। ইলিসের সব কাঁটা বা'র করে মাছকে কেবল ছানা-মাখনের মত খিঁচশূন্য করতে হলে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত :

আস্ত ইলিস আঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে দু'পাশের মাছ ফালা করে কেটে বার কর। (হগ সাহেবের বাজারে মাছের দোকানে এই রকম মাছ কাটার প্রচলন আছে) কাটা ফালাদুটোর পেটির অংশ থেকে ভাসিয়ে ছুরি চালিয়ে পেটের কাঁটাগুলো ফেলে দাও। এর সঙ্গে কিছু মাছ বাদ পড়বে। ফালা দুটোর ঘাড়ের কাছের মাছও খানিকটা কেটে ফেল। অবশ্য, এ-সব টুকরো মাছ এবং মুড়ো ও মেরুদণ্ডের কাঁটার দ্বারা অন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা যেতে পারবে।

কাটা ফালা দুটো ধুয়ে শুকনো ন্যাকড়ায় চেপে মাছের গায়ের জল পুঁছে নাও। একটা 'পাই-ডিসে' অভাবে কোন একটি চ্যাটালো এনামেল বা এলুমিনিমের ডিসে ফালা দুটি রেখে 'বেকারে' পুরে মিনিট চারেক রেখে বেক করে নাও। সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরে বেকার মেলা যে সুবিধাজনক নয় একথা বলাই বাহুল্য। এ ক্ষেত্রে একটা বড় ডেকচিতে কিছু বালি ভরে ডেকচির মুখ ঢেকে উনানে বসিয়ে বালিটাকে তাতিয়ে নিতে হবে। দশ পনেরো মিনিট তাত পাবার পর ডেকচি উনান থেকে নামিয়ে তার মধ্যে পূর্ব্বলিখিত পাত্রশুদ্ধ মাছ রেখে আবার ঢেকে দাও। তপ্ত বালির ওপর ঐ মাছ বদ্ধ অবস্থায় কয়েক মিনিট থাকলেই বেক হয়ে যাবে। অবশ্য মাছ থেকে কিছু জলীয় অংশ বেরিয়ে পাত্রে

সঞ্চিত হবে। সেটা কাঁটা মুড়ো দিয়ে যে তরকারি হবে তাতে ব্যবহার করা চলবে।

এইবার ঐ সেঁকা ফালা দুটো জুড়োলে একটা পিঁড়ে, রুটি-বেলা চাকি অথবা কোন একটা থালা উলটে তার উপর আস্তে আস্তে রাখ। ফালা দুটোতে লম্বালম্বিভাবে চারটে দাগ বেশ স্পষ্ট নজরে পড়বে। মনে রেখো, এই দাগে-দাগেই কাঁটাগুলি সঞ্চিত আছে, অন্যত্র নয়। এখন একটা বড় ছুরির ডগা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘাড়ের কাছ থেকে নেজা পর্য্যন্ত ঐ দাগে দাগে মাছগুলিকে চারটি পৃথক অংশে বিভক্ত কর। এখানেও মনে রাখবে, মাছ কেটে নয়—ছুরির ডগাটি দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে ঐভাবে পৃথক করতে হবে। প্রথমত, পীঠের দিকের যে অংশটি, তার মধ্যে অত্যন্ত সরু অনেক কাঁটাই থাকে, সুতরাং সেটি পরিত্যাগ করাই ভাল। ঘাড়ের কাছের মাছেরও ঐ অবস্থা, সুতরাং তার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা। এখন মাছের দাগে দাগে যেখানে যেখানে বিভক্ত করা হয়েছে, সেখানে হাত দিলেই দেখা যাবে, অসংখ্য কাঁটার সার। সেগুলিতে হাত ও ছুরির ডগা দিয়ে সন্তর্পণে তুললেই সহজে পৃথক করে নেওয়া যাবে। নেজার কাছেও কতকগুলি কাঁটা মাছের ভিতর 'অন্তর্নিহিত ভাবে থাকে। সেগুলিকেও ছুরির ডগা দিয়ে ধীরে ধীরে টানলে সব বেরিয়ে আসবে।

প্রক্রিয়াটি লিখতে যত কটমট লাগল, কাজে করতে তত শক্ত নয়। একটু ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও একটা নতুন কিছু করবার আগ্রহ নিয়ে করলেই কাজটি সুসম্পন্ন হবে। কাঁটা বার করবার এই প্রক্রিয়াই ফারপো পেলিটি প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজী হোটেলে অবলম্বিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ইলিসমাছের কাঁটা বার করবার সহজ পন্থা আবিষ্কার হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে

বেক করবার ব্যবস্থাটি যদি বিরক্তিকর কষ্টসাধ্য কিম্বা 'ন্যাটা' বলে মনে কর তাহলে মাছের ফালা দুটো জলে ভাপিয়ে বা সিদ্ধ করে নিতে পার। তাতে অবশ্য স্বাদের একটু লাঘব হবে।

এইবার মাছের কাঁটাশূন্য অংশগুলি (যেগুলি প্রায় বিঘত প্রমাণ লম্বা ও আঙ্গুল দুই চওড়া আকারে পাওয়া গেছে) প্রয়োজনমত টুকরো করে নাও। ঐ টুকরোগুলি নুন ও কাল-মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখন সংযোগে খাবার ব্যবস্থা কর। টুকরোগুলো তেল বা মাখনে ভেজে নুন মরিচ-গুঁড়া যোগে খাওয়া যেতেও পারে। আর যদি মনে কর, সেগুলি দিয়ে নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনটি প্রস্তুত করতে পার। দেশী ও বিলাতী উভয়বিধ প্রক্রিয়ার সংযোগে এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় বলে, এর স্বাদের উৎকর্ষ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

এই ব্যঞ্জনটি নাট্যাচার্য্য রসরাজ ৺অমৃতলাল বসুর সান্ধ্য-বৈঠক অমৃত-চক্রের এক 'পিকনিকে' প্রস্তুত ও পরিবেশিত হয় এবং রসরাজের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়—ইলিসামৃত।

ইলিসামৃত—খোলায় একটু মাখন দিয়ে নাড়। পাক হয়ে গেলে গোটা-আষ্টেক কাঁচা লঙ্কা দুফালা করে চিরে এই মাখনে ফোড়ন দাও। একটু নুন মেশাও। পোয়াটাক জল ঢাল। ফুটে উঠলে মাছের টুকরোগুলি ছেড়ে দাও। অল্প সরিষাবাটা (রাই সরিষা হলেই ভাল) গুলে দাও। সামান্য ফোটার পর নামিয়ে নাও।

ইলিসের কাঁটা তরকারি—এখন মাছের মুড়ো কাঁটা ও পেটির অংশ—যেগুলি গোড়া থেকে পরিত্যক্ত হয়ে আছে, সেগুলি টুকরো টুকরো করে কুটে নাও। খোলায় তেল দিয়ে সামান্য সাঁতলে তুলে রাখ। আলু ও পটল টুকরো টুকরো করে কুটে খোলায় পুনরায় তেল দিয়ে কষে নাও। পরিমাণমত লঙ্কা হলুদ ও ধনেবাটা

জলে গুলে কষা আনাজের উপর ঢাল। একটু নুন দাও। ফুটে উঠলে সাঁতলানো কাঁটাগুলো ঢেলে দাও। জল মরে বেশ থকথকে হয়ে এলে একটা পাত্রে ঢাল। খোলায় আবার তেল চাপিয়ে তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন সংযোগে ব্যঞ্জনটিকে সম্বরা দিয়ে নামিয়ে নাও।

দ্রষ্টব্য—শুধু আলু পটল নয়, বিবিধ তরকারির যোগে এ ব্যঞ্জনটি প্রস্তুত করা যায়। যথা—বেগুন, কাঁচকলা, চিচিঙ্গে, কচুশাক, ওল-ডাঁটা, ডেঙ্গোডাঁটা, পুইশাক ইত্যাদি। অবশ্য প্রত্যেক তরকারির সঙ্গে আলুটি রাখতে হবে। উল্লিখিত তরকারিগুলির একটি বা একাধিক পদ দিতে পারা যায়। কেবল কচুশাক ও ওল-ডাঁটার সঙ্গে অন্য কোন আনাজের মিশ্রণ তত মুখরোচক নয়।

শুধু ইলিশ মাছের নয়, ফালা বার করে যে কোন মাছ কাটা হোকনা কেন, তার কাঁটা মুড়োকে বেশ উপাদেয় খাদ্যে পরিণত করা যেতে পারে। নিম্নে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে।

ভেটকি মাছের কাঁটা তরকারি—ভেটকি মাছের স্বাদ সাধারণতঃ শীতকালেই ভাল হয়। তার কারণ সে-সময় ভেড়ি প্রভৃতিতে ঐ মাছ পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। এবং ভেড়ির মাছ সাধারণত বেশী রকম তৈলাক্ত হয়। এই তেল পৌটাযোগে মাছের কাঁটা মুড়োর তরকারি রাঁধার একটা উপকারিতা এই যে, ঐ মাছের তেলেই কাঁটা এবং আনাজগুলি সাঁতলে নেয়াও চলে, অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত কিছু সরিষার তেল আবশ্যক হতে পারে।

শীতকালে কপি কড়াইশুঁটি মূলা বেগুন প্রভৃতি সবজিও যথেষ্ট আমদানী হয়, আর তাদের খরচও গ্রীষ্মাদিকালে দার্জ্জিলিঙ্গ রাঁচি প্রভৃতি স্থল থেকে আনা ঐ সব আনাজ অপেক্ষা অল্প।

তবে শীত ভিন্ন অন্য ঋতুতে যে ঐসব কাঁটা মুড়ো একেবারে

খাদ্যোপযোগী করা যায় না তা নয়। সে ক্ষেত্রে আনাজের তারতম্য একটু রাখতে হয়।

বাঁধাকপি ও ভেটকিমাছের কাঁটার তরকারী—একটি সের দুই আড়াই ভেড়ির ভেটকি মাছের কাঁটা মুড়ো টুকরো টুকরো করে কুটে নাও। তেল পোটাটাও পৃথক করে কুটে রাখ। বাঁধাকপির পাতাগুলিও একটু বড় বড় করে কুটে ফেল। সবগুলি বেশ ভাল করে ধুয়ে নাও। কড়ায় তেল চড়িয়ে আগে কাঁটাগুলো কষে তুলে রাখ। এর পর কড়ায় আর একটু তেল দিয়ে তেল পোঁটা ভেজে নাও—এই তেলের উপরেই কপিগুলি ছেড়ে কষে নাও। কষা হ'লে লঙ্কা হলুদ ধনে-জিরা-মরিচ ও আদা-বাটা দিয়ে ভাল করে ভাজাভাজি করে পরিমাণমত জল দাও। সিদ্ধ হ'লে নুন, একটু মিষ্টি দিয়ে বারকতক নেড়ে চেড়ে একটা পাত্রে ঢেলে রাখ। এখন কড়ায় একটু তেল দিয়ে জিরা তেজপাতা ফোড়ন দাও। তৈরী হ'লে ব্যঞ্জনটুকু ঢেলে দিয়ে অল্প শুকনা ময়দা ছড়িয়ে দাও। খুন্তি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দাও। ঘি-গরমমশলা দিয়ে নামিয়ে নাও।

কপির সঙ্গে আলু কড়াইশুঁটি মূলো স্কোয়াস প্রভৃতিও দেওয়া চলে।

মাছের ঝাল—মাছ কোটা হ'লে নুন হলুদ মাখিয়ে তেলে কষে রাখ। ঝালে যদি আনাজ ও বড়ি দিতে চাও, সেগুলিও বেশী ভাজাভাজি না করে কষে নাও। কড়ায় তেল চড়িয়ে জিরা, তেজপাতা ও কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে লঙ্কাবাটা, হলুদবাটা, ধনেবাটা ছেড়ে দাও। ভাল করে কষতে থাক। যখন দেখবে কষা-মসলা থেকে বেশ সুগন্ধ নির্গত হচ্ছে, তখন আন্দাজমত জল ও নুন দাও। ফুটে উঠলে আগে কষা মাছগুলি ছাড়। একটু পরে আনাজ ও বড়ি

যেগুলি আগে কষে রেখেছ—ঢেলে দাও। সিদ্ধ হ'য়ে জল মরে এলে জিরা-মরিচ, রাঁধুনি, পিপুল ও আদা একসঙ্গে বেটে অল্প জলে গুলে মিশিয়ে দাও। বেশ থস-থসে হয়ে এলে নামিয়ে নাও।

মাছ যদি খুব পাকা হয়, পিপুল ও রাঁধুনি বাটা দিবে। রাঁধুনি-গুলি কাটখোলায় ভেজে নিয়ে পিপুল ও আদা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই ভাল, তাহ'লে বেশ সুগন্ধ বেরুবে। ইচ্ছা করলে এই সঙ্গে দু' চারখানি তেজপাতাও বেটে দিতে পার। জল বেশী হয়ে গেলে বা রস খুব গাঢ় করতে হ'লে এই সঙ্গে দুটি ভিজা আলোচাল মিশিয়ে বা আলাদা করে বেটে দিতে পার।

মাছের ঝালের সঙ্গে অনুষঙ্গরূপে দুটি বা ততোধিক আনাজ মিশানোও চলে। যেমন: আলু-বেগুন, আলু-কপি, আলু-পটল, কপি-কড়াইশুঁটি, শিম-বেগুন, শিম-বরবটি, মূলো-স্কোয়াস, মূলো-বেগুন, কচু-কাঁটালবিচি, পটোল-বীন, পটোল-কাঁটালবিচি, ঝিঙ্গা-বেগুন প্রভৃতি। ঝাল ঝোল ডালনা প্রভৃতি ব্যঞ্জনে পটল, বীন ও সিম একটু বেশী কষা ভাল। আবার বেগুন, ঝিঙ্গে, বরবটি, মূলো, ফুলকপি না কষে কাঁচাই ছাড়া উচিত।

মাছের ঝাল রাঁধবার আরো কয়েকটি প্রণালী আছে। যেমন: অনুষঙ্গ আনাজ ও বড়িগুলি আলাদা আলাদা কষে রেখে কড়ার তেলে জিরা, তেজপাতা ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কোটা ধোয়া ও নুন-হলুদ-মাখা মাছগুলি ছাড়। কষতে থাক। এর পর লঙ্কা, হলুদ ও ধনেবাটা অল্প জলে গুলে ঢেলে দাও। একত্র কষতে থাক। মসলার গন্ধ বেশ বেরুতে থাকলে নুন ও হলুদ মিশিয়ে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে জল ঢেলে দাও। ফুটে উঠলে আনাজ ও বড়ি—আগে যেগুলি কষে রেখেছ, ছেড়ে দাও। সিদ্ধ হ'লে জিরা-মরিচ, তেজপাতা, আদা,

পিপুল এবং দুটি আলোচাল, পোস্তদানা ও অল্প কাঁচা চীনাবাদাম দানা একত্র বেটে মিশাও। জল মরে রস গাঢ় হয়ে এলে নামাও। এই সময় অর্থাৎ পাত্র নামিয়ে কাটখোলায় ভাজা রাঁধুনি-গুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে মাখামাখি করে নিতে পার।

চিতল, বোয়াল, ধাঁই (শিলং) বাচা রিটা প্রভৃতি তৈলাক্ত মাছের ঝাল আনাজ-পত্র না দিয়েই প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে—মাছগুলি নাম মাত্র কষে নিয়ে তুলে রাখবে, তারপর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাক করবে। কিম্বা তেলে কালোজিরা, তেজপাতা ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পূর্ব্বোক্ত বাটা মসলাগুলি অল্প জলে গুলে ঢেলে কষবার পর জল ঢেলে দিবে। জল ফুটে উঠলে নুন হলুদ মাখা মাছগুলি কাঁচা অবস্থাতেই ঢেলে দিবে। জল মরে এলে পিপুল, আদা, কালজিরা ও তেজপাতা বাটা মিশিয়ে ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নেবে।

রোগীর জন্য মাছের ঝাল রাঁধতে হলে লঙ্কা মোটেই ব্যবহার করবে না। লঙ্কার স্থলে পিপুল বেটে দেবে। রোগীর জন্য মাগুর মাছের ঝাল বা ঝোলে সোমরাজী ফোড়ন দিয়ে রাঁধলে মুখরোচক হবে, গুণও বাড়বে।

ঝাল-চড়চড়ি—মাছের কাঁটা-মুড়া বা ডুমা ডুমা করে কাটা পাকা মাছের ঝাল-চড়চড়ি করতে হ'লে যথারীতি মাছ, কাঁটা বা মুড়া কেটে নুন হলুদ মাখিয়ে কষে রাখ। আনাজগুলিও ডুমো ডুমো করে কেটে তেলে কষে রাখ। এখন তেলে জিরা, কালজিরা, তেজপাতা ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কষা মাছগুলি বেছে নিয়ে ছাড়। কাঁটা বা মুড়ার অংশগুলি এখন দেবে না। আনাজগুলি মিশাও। নুন, হলুদ, ধনে ও লঙ্কাবাটার সঙ্গে জল ঢেলে দাও। সিদ্ধ হলে মুড়াগুলি ভেঙ্গে দাও। এই সময় আদা, জিরামরিচ ও তেজপাতা বাটা মিশিয়ে

ভাল করে নেড়ে চেড়ে দাও। জল মরে শুকনা শুকনা হলে নামাও। রাঁধুনি ভাজা গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিতে পার। তাতে আস্বাদ আরও ভাল হবে।

মাছ কষার প্রণালী—পাকা পোনা মাছ, শোল, শাল, বাইন, পাঁকাল প্রভৃতি একটু বেশী কষবে। ইলিস, ভেটকি, ভাঙ্গন, চিতল, ধাঁই, বোয়াল, বাচা, কৈ, মাগুর, শিঙ্গি, চিংড়ি, মোরোলা প্রভৃতি মাছ খুব কম করে কষবে বা কাঁচাই রাঁধবে।

মাছের তেল ঝোল—মাছের ঝালে যে সব আনাজের কথা বলা হয়েছে, তেল ঝোলেও সে সব আনাজ ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে আনাজগুলি কচি হওয়া চাই। বিনা আনাজেও তেল ঝোল রন্ধন করা যায়। ঝালের মত আনাজ ও মাছ আলাদা আলাদা কষে রাখ। কচি ঝিঙ্গা, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপির কচিপাতা, কড়াইশুঁটি—এসব আনাজ না কষলেও চলে। পাকপাত্রে একটু বেশী করে তেল চড়াও। তেল তৈরী হ'লে শুকনা লঙ্কা ফোড়ন দাও। আনাজগুলি ছাড়। একটু ভাজাভাজি করে হলুদ বাটা, সরিষাবাটা এবং গুটি দুই কাঁচা লঙ্কা বাটার সঙ্গে জল ঢাল। ফুটে উঠলে কষা মাছগুলি দাও। সিদ্ধ হয়ে জল মরে এলে চার পাশে পলা দুই খাঁটি সরিষার তেলে ছড়িয়ে দিয়ে একটু রেখে নামিয়ে নাও।

মাছের ঝাল ও তেল ঝোলে **'গোটা-মসলা'** একটি বিশেষ উপাদান। 'রন্ধনের মসলা' প্রসঙ্গে গোটা-মসলার ব্যবহার প্রণালী (৭৬ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

মাছের ঝোল—ঝালে যে সব আনাজের কথা বলা হয়েছে, ঝোলেও সেই সব আনাজ চলবে। ঝোলের আনাজগুলি একটু বেশী করে কষে রাখ। তবে বেগুন, বরবটি, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যদি ঝোলে

দিতে চাও, কাঁচাই রাখ। ঝোলের মাছগুলি ভাল করে ভেজে নেওয়া চাই। মাছ ভাজার প্রণালী আগেই বলা হয়েছে। এখন হাঁড়ি বা কড়ায় আন্দাজ মত জলে লঙ্কাবাটা, হলুদবাটা, জিরামরিচ বাটা, ভাল করে গুলে জ্বালে চড়াও। ফুটে উঠলে তরকারিগুলি ছাড়। খানিক পরে ভাজা মাছগুলি দিয়ে পরিমাণমত নুন দাও। পাকপাত্রের মুখটি চাপা দাও সরা বা অন্য কিছু দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে আনাজগুলি বেশ সিদ্ধ হলে নামিয়ে নাও। এখন এই সিদ্ধ ঝোলটি সাঁতলে নিতে হবে। ব্যঞ্জনটুকু একটি আলাদা পাত্রে ঢেলে রেখে এই পাত্রটি ন্যাতা দিয়ে মুছে উনানে চাপাও। সরিষার তেল আন্দাজমত দাও। তেল পেকে এলে শুকনা লঙ্কা ও তেজপাতা একসঙ্গে ছাড়। বেশ ভাজাভাজি হয়েছে দেখলে পাঁচফোড়ন দাও। চড়বড় করে উঠলেই ঢেলে-রাখা ঝোলটুকু সমস্ত ঢেলে দাও। বার দুই ফুটে উঠলে নামিয়ে ফেল।

বাটা মসলা গোলবার সময় জলটুকু আন্দাজ করে দিলে কোন কথা নেই। ঝোল ঠিক মতই হবে। কিন্তু যদি দেখ, জল বেশী হয়ে গেছে, সাঁতলাবার পরও খুব পাতলা রয়েছে, তখন অল্প পরিমাণ ময়দা গুলে কিম্বা ভিজা আলোচাল জলে বেটে পিঠালি করে মিশিয়ে দাও।

মাছের কালিয়া—এই ঝোলের একটু উঁচু রকমের প্রকরণ বই আর কিছু নয়। ঝোলে নানাপ্রকার আনাজ দেওয়া হয়, কালিয়ার কতিপয় আনাজ মাত্র চলে। যেমন—আলু, ফুলকপি, ওলকপি, প্রভৃতি এবং এই আনাজগুলি ছাঁকা তেলে ভেজে নিতে হবে। বড়ি যেমন ঝোলের অঙ্গ, কালিয়ার জন্য তেমনি বড়ির বদলে ডালের বড়া বা 'ধোঁকা' উত্তম অনুষঙ্গ। ঝোলের মাছ ভাল করে ভেজে রাখা চাই। কালিয়ার

মাছ কিন্তু অল্প কষে নেওয়াই বিধি। ঝোলের বাটা মসলা জলে গুলে জ্বালে চড়ালেই হল। কালিয়ার মসলাগুলি আগে কষে নেওয়া চাই।

কালিয়ার রন্ধন প্রণালী—তেলের বদলে ঘিয়ে জিরা, তেজপাতা, শুকনা লঙ্কা, গরম মসলা (ছোট এলাচ, লবঙ্গ ও দালচিনি একটু থেঁতো করা), রুচি থাকলে পিঁয়াজকুঁচি এবং রশুন বাটা ফোড়ন দাও। অল্প ভাজাভাজি হলেই লঙ্কাবাটা, ধনেবাটা, আদাবাটা ছাড়। ভাল করে কষতে থাক। এই সময় চীনাবাদাম বাটা বা পোস্ত-বাটা, হলুদবাটা, নুন এবং অল্প একটু চিনি মিশিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে জল ঢেলে দাও। ফুটে উঠলে কষা মাছগুলি মেশাও। খানিক পরে ভাজা আনাজ এবং ইচ্ছা করলে ডালের বড়া বা ধোঁকা ছাড়। ঝাড়া বাছা ও ভিজানো কিস্‌মিসও এই সঙ্গে দিতে পার। আনাজ ও মাছ সুসিদ্ধ হলে টকদধি অথবা টমেটোর রসে একটু জিরামরিচ ও তেজপাতা বাটা, সামান্য মিষ্টি গুলে ঢেলে দাও। বার দুই ফুটে ঘন ঘন হয়ে এলে নামাও।

ইচ্ছা করলে—ফোড়নের সঙ্গে রশুন বাটা না দিয়ে, এই সময় আদা এবং গরমমসলার সঙ্গে রশুন বেটে ঘিয়ে পাকিয় কালিয়ায় ঢেলে দিতে পার। এর আস্বাদ আর এক রকম হবে।

মাছের সূপ বা যুষ—মাছের সূপ বা সুরুয়া অত্যন্ত বলকারক খাদ্য। শিঙ্গী ও মাগুর মাছের গুণের কথা আগেই বলা হয়েছে! কিন্তু মাছের গুণগুলি বজায় রেখে খাদ্য প্রস্তুত করতে হলে সূপই প্রশস্ত। সূপ শুধু যে রোগীর পথ্য তা নয়, ছেলে মেয়েদের মুখ-রোচক খাদ্যরূপেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এর প্রস্তুত প্রণালীও কঠিন নয়।

মাছগুলি যথারীতি কুটে ধুয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে একটা

হাঁড়িতে রাখ। আন্দাজমত ঠাণ্ডা জল ঢাল। হাঁড়িটি জ্বালে চাপাও। জল তেতে উঠলে হলুদবাটা, আদা ও পিঁয়াজ (থেঁতো করা—মিহি করে বেটে নয়), সা-মরিচ অথবা কালমরিচ (আস্ত) ধনে (আস্ত) হাঁড়ির জলে ছাড়। ইচ্ছা করলে কাটা ধোয়া কাঁচা আনাজ এই সঙ্গে দিতে পার। মৃদু আঁচে ধীরে ধীরে ফুটতে থাকুক। ফুট খুব বেশী হলে বা উথলে উঠলে ঠাণ্ডা জলের ঝারা দিয়ে ফুট বন্ধ করবে। এই সময় দেখবে চিনির গাদের মত ময়লা ভেসে উঠছে। ঝাঁঝরি দিয়ে ঐ গাদ কাটিয়ে তুলে ফেল। অল্পসময় ব্যবধানে বার তিনেক এই ভাবে কাটালেই সমস্ত গাদ উঠে সূপটি নির্ম্মল হবে। আনাজগুলি সুসিদ্ধ হয়ে গলে গেলেই সেগুলি ছেঁকে তুলে ফেল। মাছগুলিও সুসিদ্ধ হয়ে কাঁটা থেকে খুলে পড়বার মত হয়েছে দেখলে হাঁড়ি নামিয়ে ফেল। একটু ঠাণ্ডা হলে একখণ্ড শক্ত কাপড়ে ঢেলে মাছশুদ্ধ ঝোলটুকু ছেঁকে ক্বাথ বার করে নাও। ছাঁকবার সময় লক্ষ্য রাখবে কাঁটা যেন না হাতে ফুটে। কাঁটাগুলি আলাদা করে বেছে নিয়ে ছাঁকাই ভাল। এখন ঘিয়ে, অলিভ অয়েলে বা খাঁটি সরিষার তেলে জিরা, কালজিরা ও তেজপাতা এবং রুচি থাকলে পিঁয়াজ ও রশুন (থেঁতো করা) ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নিলেই সূপ, যূষ বা সুরুয়া প্রস্তুত হ,ল।

এট প্রণালীতে প্রস্তুত সূপ রোগীদেরও পথ্য। তবে সুস্থ অবস্থায় মুখরোচক খাদ্য রূপে ব্যবহার করতে হলে গরম মসলা, লঙ্কা প্রভৃতিও ফোড়ন দেওয়া চলে।

কুঁচা চিংড়ির ব্যঞ্জন—সহজেই এটি যোগাড় করা যায়, আর সস্তাও বটে। কিন্তু এই সস্তার মাছটিকে উপাদান করে পিকনিকে যে-সব উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে তাদের কিছু কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে।

কাটলেট :—প্রথমেই কুঁচা চিংড়িগুলিকে বেছে গরম জলে ধুয়ে শিলে মিহি করে বেটে নাও। মাছগুলি যদি খোসা ছাড়াবার মত হয় ত খোসা ছাড়িয়ে বাটাই ভাল। নিতান্ত ছোট হলে সেঁায়াগুলো ফেলে বেটে ফেল। জিরা মরিচ ধনে লঙ্কাবাটা, আদা পিঁয়াজ বাটা, গরম মসলা বাটা বা গুঁড়া, অল্প টক দই বা টমেটোর রস, নুন মিষ্টি এবং ঐ চিংড়ি বাটা একটি কলাই করা পাত্রে একত্র করে মিশিয়ে ফেটাও। এখন এই নাতি তরল পদার্থটিকে একটু শক্ত বা আঁট সাঁট করবার জন্য প্রয়োজন মত বেসন বা ময়দা মিশাও। ভাল করে মেখে একটি বড় ডেলা কর। এই ডেলা থেকে লেচি কেটে হাতে চেপে চেপে কাটলেটের মতন পাতলা পাতলা কর। এখন বার্লি, এরারুট, বেসন, ময়দা বা ডিমের গোলায় ডুবিয়ে এক একখানি করে ভাজ। ইচ্ছা করলে বিস্কুট, মুড়ি, চালভাজা বা ভাজা সুজিতে মাখিয়েও ভেজে নিতে পার।

কোপ্তা :—কুঁচা চিংড়িগুলি ধুয়ে বেছে নুন হলুদ মেখে ভিজানো ডালের সঙ্গে শিলে ভাল করে বাট। কাঁচালঙ্কা, আদা, পিঁয়াজ ও জিরা মরিচ বাটা মিশাও। আন্দাজমত নুন ও অল্প মিষ্টি দাও। তপ্ত তেলে বড়ার মত ভাজ। এখন বড়াগুলিকে ভাজা বা কষা মাছের সামিল করে ব্যঞ্জন রাঁধ। ফুলুরি :—খোসা ছাড়ানো চিংড়ি (গলদা বাগদা বা খোলা ছাড়ানো যায় এমন আকারের কড়ানে চিংড়ি) নুনহলুদ মাখিয়ে সিদ্ধ করে শিলে বাট। সিদ্ধ আলু বা কচুর সঙ্গে চটকে মাখ। আদা, পিঁয়াজ, জিরা মরিচ ধনে হলুদ লঙ্কাবাটা মিশিয়ে ফেটিয়ে নাও। সরিষার তেলে লালচে করে ভেজে নাও। পাকা পোনা, ভেটকি, ধাঁই, বোয়াল, শোল প্রভৃতি পাকা মাছ সিদ্ধ করে এই প্রণালীতে ফুলুরী করা যায়। কুঁচা চিংড়ির আর একটা মুখরোচক

ব্যঞ্জন মেয়েদের পিকনিকে খুব উপাদের বলে আদর পেয়েছে। কাঁচা পেঁপে বা মিষ্টি কুমড়া দিয়ে এই ব্যঞ্জনটি পিকনিকে রান্না হয়ে থাকে। এর প্রণালী হচ্ছে: ছোট ছোট চিংড়িগুলির খোসা একটু কষ্ট করে ছাড়িয়ে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখ। কাঁচা পেঁপে বা মিষ্টি কুমড়ার খোসা ছাড়িয়ে কুঁচিয়ে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে তপ্ত তেলে অল্প কষে আলাদা করে রাখ। কড়ায় তেল চাপিয়ে দু'চার কুঁচি কাঁচালঙ্কা, আদাকুঁচি ও পিঁয়াজ কুঁচি ফোড়ন দিয়ে নুন হলুদ মাখা চিংড়িগুলি ছাড়। খানিকটা ভাজা ভাজা করে লঙ্কাবাটা ও সরিষাবাটা, সামান্য মিষ্টি ও পরিমাণমত নুন দিয়ে জল ঢাল। ফুটে উঠলে কষা আনাজ ছাড়। পাকপাত্রের মুখটি ঢাকা দাও। সুসিদ্ধ হলে ও জল মরে এলে ঢাকাটি খুলে পলা খানেক সরিষা তেল ছড়িয়ে দিয়ে অল্প নেড়ে চেড়ে নামাও। ইচ্ছা করলে এর সঙ্গে কড়াইশুঁটি বা ভিজা মটর মিশাতে পার।

মাছের পুর—পাকা মাছের খণ্ডগুলি ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে সিদ্ধ করে কাঁটাগুলি বেছে ফেলে শিলে বেটে বা হাতে চটকে মাখ। পাত্রে ঘি চড়িয়ে গরম মসলা থেঁতো করে ফোড়ন দাও। আদা-বাটা, পিঁয়াজবাটা, রসুনবাটা ছাড়। জিরামরিচ ও লঙ্কাবাটা টক দই বা টমেটোর রসে মেখে ছাড়। মাছের মণ্ডটুকু ঢেলে মাখামাখি কর। নুন মিষ্টি কিস্‌মিস মিশাও। ভাজা ভাজা হলে অল্প জল দাও। সুগন্ধ বেরুলে এবং বেশ ঝরঝরে হলে নামাও।

মাংস থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য

মাংসকে রন্ধনোপযোগী করবার প্রসঙ্গে প্রথমেই কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে। মাংসের গুণের কথা আগেই 'মাছ-মাংস-ডিম' প্রসঙ্গে (৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে।

মাংস বলতে পাঁঠা, ভেড়া বা মটন এবং বিভিন্ন পাখীর মাংস বুঝতে হবে এবং এগুলির রন্ধনপ্রণালী প্রায় একই রকমের।

ষ্টু, সুপ, ক্বাথ, ঝোল প্রভৃতি হাল্কা ধরণের রন্ধনে কচি পাঁঠার মাংসই প্রশস্ত। রোগী বা ভোক্তার পক্ষে রুচি অনুসারে পাখীর মাংসও উপযোগী! কারি, কালিয়া, কোর্ম্মা প্রভৃতির জন্য খাসি মেষ বা মটনের পাকা ও চর্ব্বিদার মাংসই গৃহীত হয়ে থাকে। হাল্কা ধরণের কারিতে পাঁঠা বা খাসির মাংসও প্রশস্ত।

মাংস বিচার—মাংস ভাল হলেই তবে রন্ধনের সার্থকতা। পিকনিকের মেয়েরা মাংসটি দেখেই চিনে নিতে পারে—সেটি ভাল কি মন্দ, টাটকা কিম্বা বাসি, তেজাল অথবা কোন রুগ্ন পশু বা পাখীর পিঁয়াজের উপরকার খোসা ছাড়ালে যেমন দেখতে হয়, ভাল মাংস দেখতেও অনেকটা সেই রকম। ভাল মাংস থেকে কোন গন্ধ নির্গত হবে না, মাংসের গায়ে জোরে আঙ্গুল দিয়ে টিপলেও জল বেরুবে না। যে মাংস থেকে জল গড়িয়ে আসে, জানবে সে মাংস কখনই ভাল নয়। নির্দ্দোষ মাংস শুকিয়ে যাবে তবু তার গা বেয়ে জল ঝরবে না। রুগ্ন বা মৃত পশুর মাংসই ফ্যাকাসে হয়ে থাকে।

মাংসের কিমা—অল্প মাংসে ব্যঞ্জন রেঁধে ভালভাবেই খাওয়াটাকে সার্থক করতে হলে মাংস কিমা করে রাঁধবে। দোকানে তৈরী করে রাখা কিমা বিষবৎ ত্যাগ করবে। মাংসের আবর্জ্জনা অংশ কুঁচিয়ে থুড়ে তারা কিমা প্রস্তুত করে। মাংস পছন্দ করে কিনে সামনে দাঁড়িয়ে খুড়িয়ে নেবে, অথবা ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে বাড়ীতেই তৈরী করে নেবে। একবারে মিহি নাইবা হ'ল। এই কিমা ঝোল কারি বা কালিয়ার প্রণালীতে রাঁধ। আনাজ দিয়ে বাড়াও। কোন দিন বা ডাল দিয়ে স্বাদ ও পরিমাণ আলাদা রকম কর। দেখবে, এক সের

মাছের চেয়েও এক পোয়া কিমায় বেশী আয় দিয়েছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা কিমাটাকেই তাদের দৈনন্দিন আহারের একটা প্রধান উপাদান বলে গ্রহণ করে থাকে—আমরা যেমন মাছকে প্রাধান্য দিয়েছি।

মাংসের রোষ্ট—করতে হলে মুরগী, পায়রা, হাঁসই প্রশস্ত। কচি **পাঁঠার মাংসেও রোষ্ট হয়ে থাকে। পাখীর মাংস** তৈরী করতে হলে প্রথমে পাখীর পালকগুলি তুলে ফেলে ভিতরের নাড়ী বার করে পরিষ্কার করা চাই। এর পর পাখীর বুকের হাড়ের দুই পাশ থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে দুটো খণ্ড করতে হবে। দুটি ডানা এবং পা দুটীর মাঝখানটি ছুরি চালিয়ে কৌশলে ভেতরের হাড়টি বার করে ফেলা চাই। এখন পাখীটি হাড়শূন্য হয়ে দুটি টুকরোয় দাঁড়াল। মাংসগুলি কুটে খুড়ে নাও। কালমরিচগুঁড়া, আদা পিঁয়াজবাটা, নুন এবং ঘি, মাখন, সুইটওয়েল বা সরষের তেল —যে কোন একটি দিয়ে মাংসটুকু মাখামাখি কর। এই সময় খানিকটা ‘সস’ অভাবে ভিনিগার মিশাও। ফ্রাই প্যান, সসপ্যান, অভাবে চাপা দেওয়া যায় এমন একটা চ্যাটালো পাত্র মৃদু আঁচে চড়িয়ে একটু ঘি দাও। তেতে উঠলে মাংসগুলি ছড়িয়ে মেলে দাও—গায়ে গায়ে লেগে থাকবে, কিন্তু উপরি উপরি থাকবে না। উপরে একটা কিছু চাপা দাও। মাংস থেকে জল না বেরুলে অল্প জল দিতে হবে এবং ধরে না যায় লক্ষ্য রাখবে। মৃদু আঁচে বা দমে বসিয়ে পাক হবে। মাংসের জল মরে নীচের দিকটা ভাজা-ভাজি হয়েছে দেখলে মাংসগুলি উলটে দাও। লক্ষ্য রাখ, পুড়ে বা মাংসের তলা যেন ধরে না যায়। সুগন্ধের সঙ্গে একটা শোঁ শোঁ শব্দ বেরুলেই নামিয়ে নাও। কিছু পিঁয়াজ কুঁচিয়ে আগে ভেজে রাখবে। এখন ভাজা পিঁয়াজ কুঁচিগুলি ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেষণ কর।

এই প্রণালীতে পাঁঠা, খাসি এবং মটনও 'রোষ্ট' করা যেতে পারে।

হরিণের মাংস—থেকে একটা 'মাটি মাটি' গন্ধ নির্গত হয়। ধানের পোয়াল অর্থাৎ ধান ঝেড়ে নেবার পর খড় থেকে তৃণের মত যে অংশগুলি ছড়িয়ে পড়ে, তাকে 'পোয়াল' বলে। এই পোয়াল অভাবে খড় কেটে খণ্ড করে টাটকা হরিণের মাংসের সঙ্গে আধ ঘণ্টা আন্দাজ সিদ্ধ করে নিলে ঐ মাটি গন্ধ আর থাকে না এবং মাংস খুব কোমল হয়। এই অল্প সিদ্ধ মাংসে যাবতীয় বাটা মসলা প্রভৃতি মেখে যথা-রীতি রাঁধবে। হরিণ মাংস অনেকে বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে বাসি করে তবে রাঁধবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাসি মাংস স্বাস্থ্যকর হয় না। এর চেয়ে যাবতীয় বাটা মসলার সংযোগে মেখে অন্ততঃ আট ঘণ্টা কাল যদি হরিণমাংস চাপা দিয়ে রাখা যায়, তার পর রাঁধলে দিব্য সুস্বাদু হয়ে থাকে।

কচ্ছপ বা কেঁভোর মাংস—রাঁধতে হলে পাঁঠা খাসির মাংস রান্নার প্রণালীই অনুসরণ করবে। তবে এই মাংসে পিঁয়াজ রশুনের স্থলে হিঙ বেশী খাপ খায়। আর এতে দই বা কোন অম্লরস না দিয়েই রাঁধার বিধি। তবে আদার ভাগ বেশী দিতে পার।

মাংসের চর্ব্বি—মাছের তেলের মত মাংসের চর্ব্বিও অত্যন্ত পুষ্টিকর জিনিস। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঘিয়ের বদলে চর্ব্বি ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। সাহেবরাও চর্ব্বিকেই বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু আমরা চর্ব্বির নামেই চমকে উঠি—যদিও নিকৃষ্টতম চর্ব্বি নানা ভাবেই আমরা ঘি মাখনের সঙ্গে অজ্ঞাতে ব্যবহার করে থাকি। একটু চেষ্টা এবং যত্ন করলেই আমরা বাড়ীতে চর্ব্বি প্রস্তুত করে ঘিয়ের অভাব দূর করতে পারি। খুব সংক্ষেপেই চর্ব্বি প্রস্তুত করবার প্রণালী বলা হচ্ছে :

খাসি বা ভেড়ার চর্ব্বি সংগ্রহ করে টুকরো টুকরো করে কাট।

একটা মাটির হাঁড়িতে অথবা লোহার কড়াইয়ে ঠাণ্ডা জল ভরে ঐ চর্ব্বি—খণ্ডগুলি ভিজিয়ে দাও। অল্পক্ষণ এই ভাবে রেখে জ্বালে চড়াও। মৃদু তাপ দেওয়া চাই। উত্তাপে স্নেহ দ্রব্যটুকু চর্ব্বির শিরা উপশিরা থেকে বেরিয়ে এসে গ'লে জলের উপর ভাসতে থাকবে। পাত্রের জিনিসটি শীতল হ'লে দেখতে পাবে যে, ঐ স্নেহ পদার্থটুকু বেশ একটি স্তরের মত হয়েছে। তখন সেটুকু সন্তর্পণে তুলে একটি পাত্রে রেখে পুনরায় তাপে বসাও। গ'লে তেলের মত হলে কাপড়ে ছেঁকে একটা জারে ভরে মুখ এঁটে রাখ। এই হল আসল বিশুদ্ধ চর্ব্বি। ঘিএর মত একে ব্যবহার করা চলে। এরই নিকৃষ্টতম সংস্করণ বিভিন্ন অবাঞ্ছিত পশুর দেহ থেকে সংগৃহীত হয়ে ।ঘি নামক দ্রব্যটির অঙ্গপুষ্টি করে থাকে।

মাংস মাখবার প্রণালী—মাছ কুটে শুধু নুন হলুদ মাখিয়ে রাখাই বিধি। যাবতীয় বাটা মসলা মেখে রাখলে মাছ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু মাংসের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। ষ্টু, সূপ বা ক্বাথের জন্য মাংস ছাড়া অন্যান্য প্রণালীতে রান্নার মাংস পূর্ব্ব থেকে মসলা মেখে রাখলে মসলার রস মাংসের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে মাংসের স্বাদ আরও উত্তম হয়।

ষ্টু—মাংসগুলি পরিষ্কার করে খণ্ড খণ্ড করে কুটে রাখ। পাত্রে ঘি চড়িয়ে তেজপাতা এবং গরম মসলা একটু থেঁতো করে ফোড়ন দাও। চড়বড় করে উঠলে একটু রেখেই পাত্রটি নামাও। অল্প পরিমাণে ময়দা, ফোড়ন দেওয়া তপ্ত ঘিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে এমন ভাবে নাড়তে থাক যে ময়দা-গুলি ডেলা পাকিয়ে না যায়। লালচে হবার আগেই পাত্রটি আবার আঁচে বসাও। ঘি বেশ তেতে উঠলে মাংস খণ্ড গুলি ছাড়। ভাল করে কষতে থাক। মাংস থেকে যে জলটুকু বার হবে সেটা শুকিয়ে গেলে গরম জল তাতে ঢেলে দাও। ফুটে উঠলে কুঁচানো আদা, ডুমাডুমা করে কাটা

পিঁয়াজ, চাকা চাকা করে কাটা আলু ও সালগম, সা মরিচ (অভাবে কালো মরিচ) গুঁড়া ও নুন ছাড়। একটু নেড়ে চেড়ে পাত্রটির মুখ বন্ধ করে ঢিমে আঁচে দমে বসিয়ে রাখ। এই ভাবে মাংসগুলি সুসিদ্ধ হলে অল্প একটু মিষ্ট, নারিকেল দুধ, বাদাম ও পোস্ত বাটা মিশিয়ে বার কয়েক নেড়ে চেড়ে ঘন ঘন মত হলে নামিয়ে নাও।

নারিকেল দুধের অভাবে আসল দুধ দিয়েও ষ্টু অনেকে করেন। আলু ও সালগমের সঙ্গে পেঁপে, কপি, কড়াইশুঁটি, বরবটি, স্কোয়াস, শশা, লাউ, বীন প্রভৃতিও ষ্টুর সঙ্গে দিতে পারা যায়।

সুপ—মাছের সুপের প্রণালীতেই মাংসের সুপ রান্না হবে। মাংসগুলি কুটে নেবার সময়, মাংসের যে হাড়গুলির মধ্যে মজ্জা বা শাঁস আছে বুঝবে, সেগুলি নোড়া দিয়ে ভেঙ্গে নেবে। হাঁড়িতে ঠাণ্ডা জল রেখে হাড় মাংস সব ঢেলে দাও। এখন জ্বালে বসাও। পরের ব্যবস্থা সমস্তই মাছের সুপের মতই।

মুগ সংযোগে মাংসের সুপ—সুপের মত হাঁড়ি করে মাংস জ্বালে বসাও। আধা সিদ্ধ হলে ভাজা মুগের ডালগুলি তাতে ছেড়ে দাও। সিদ্ধ হলে হলুদবাটা, জিরামরিচবাটা, নুন ও চিনি মিশাও। এখন অন্যপাত্রে ঘি চড়িয়ে তেজপাতা, জিরা, লঙ্কা, গরম মসলা এবং রুচি থাকলে পিঁয়াজ ও রশুনবাটা ফোড়ন দিয়ে মুগ-মাংস ঢেলে সাঁতলে নাও। নামিয়ে আদা ছেঁচা এবং গরম মসলা অল্প পরিমাণে গুঁড়িয়ে বা বেটে মিশিয়ে দাও।

ইচ্ছা করলে এইভাবে না সাঁতলে মুগ-মাংস সমস্ত এক খণ্ড শক্ত কাপড়ে ঢেলে নিংড়ে ক্বাথটুকু বার করে নিতে পার। এর পর পাত্রে ঘি চড়িয়ে জিরা তেজপাতা ইত্যাদি ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নাও। শেষে আদা ছেঁচা ও গরম মসলা মিশাও।

মাংসের ক্বাথ—মাংসগুলি কুঁচিয়ে থুড়ে ফেল। হাড়গুলি ফাটিয়ে শাঁস বার করে নাও। যে পরিমাণ মাংস তার দ্বিগুণ ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টা দুই ভিজিয়ে রাখ। তারপর জ্বালে চড়িয়ে ঢিমে আঁচে সিদ্ধ কর। জলের তিন ভাগ মরে গেলে নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে কাপড়ে ছেঁকে নাও। নুন, মরিচগুঁড়া ও আদার রস মিশিয়ে খেতে দাও। এই ক্বাথ রোগীর পথ্য। অবস্থা অনুসারে আর একটু মুখরোচক করতে হলে অল্প একটু ঘৃতে খান দুই তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ঐ ক্বাথটুকু সাঁতলে নেওয়া চলে।

মাংসের ঝোল—মাংসগুলি কুটে আদা বাটা, ধনে বাটা, হলুদ বাটা, অল্প সরিষার তেল ও টক দই এবং রুচি থাকলে পিঁয়াজ বাটা মাখিয়ে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখ। উনানে পাত্র চাপিয়ে তেল বা ঘিয়ে তেজপাতা ও শুকনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মসলামাখা মাংসটুকু ছাড়। সামান্য একটু চিনি দাও। অনবরত কষতে থাক। মাংস থেকে জল বার হয়ে জলটুকু শুকিয়ে গেলেই সেই সময় পরিমাণমত গরম জল দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দাও। ফুটে উঠলে দেখতে হবে মাংস সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এটি বোঝবার সহজ উপায় হচ্ছে—একখানি হাড়শুদ্ধ মাংস হাঁড়ি থেকে তুলে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে মাংসটি টিপে দেখ। সহজে যদি মাংস থেকে হাড়টি ছেড়ে যায়, তাহলে বুঝবে মাংস সিদ্ধ হয়েছে। নতুবা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাংস সিদ্ধ হলে জিরামরিচ বাটা ও নুন দিয়ে হাঁড়ি নামাও। এখন হাঁড়ির মাংস অন্য পাত্রে ঢেলে রেখে হাঁড়িটি পরিষ্কার ক'রে, কিম্বা অপর কোন পাত্রে ঘি চড়িয়ে তেজপাতা, গরম মসলা (ছোট-এলাচের দানাগুলি খুলে অল্প পিশে, দালচিনির খণ্ডগুলি কুঁচিয়ে এবং লবঙ্গগুলি গোটা) এবং শুকনা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মাংস সাঁতলে নাও। একটু জ্বালে রেখে ঘি ও গরম মসলা বাটা মিশিয়ে নামাও এবং ঢাকা দিয়ে রাখ।

মাংসে আনাজ দিতে হলে, সেগুলি আগে কষে রাখা চাই। মাংসের জল শুকিয়ে এলে গরম জল দেবার খানিক পরে আনাজগুলি ঢেলে দেবে। আলু, সালগম, স্কোয়াস ও কড়াইশুঁটি মাংসের ঝোলে দেওয়া চলে।

মাংসের কারি বা কালিয়া—মাংসের খণ্ডগুলি একটু বড় বড় করে কুটে রাখ। হলুদবাটা, আদাবাটা, লঙ্কাবাটা, ধনেবাটা, রশুনবাটা, টক দই বা টমেটোর রস, পলা দুই সরিষার তেল ও নুন সংযোগে উত্তমরূপে মেখে কিছুক্ষণ একটা চিনামাটি বা কলাইকরা পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখ। পাক-পাত্রে ঘি চড়িয়ে তেজপাতা এবং গরম মসলা (গোটাই থাকবে শুধু একটু ঘা দিয়ে নাও) ফোড়ন দাও। একটু পরেই কুঁচানো পিঁয়াজগুলি ছেড়ে ভাজাভাজি কর। লালচে রঙ ধরলেই মসলামাখা মাংসটুকু সব ঢেলে দিয়ে কষতে থাক। জল বার হচ্ছে বুঝলেই চাপা দাও। যখন বুঝবে মাংস থেকে জল বেরিয়ে সবটুকু শুকিয়ে গেছে এবং মাংসে মাখা মসলার গন্ধ নির্গত হচ্ছে, তখন গরম জল আন্দাজ করে ঢেলে দাও। সিদ্ধ হয়ে এলে কষা আলু, কড়াইশুঁটি, সালগম, কপি প্রভৃতি ছাড়। বেশ সিদ্ধ হয়েছে বুঝলে জিরামরিচবাটা ও তেজপাতাবাটা এবং অল্প একটু মিষ্টি দাও। এই সময় ঘিয়ে অল্প পরিমাণ আদাবাটা, রশুনবাটা ও গরমমসলা বাটা ভেজে নিয়ে ঐ মাংসের সঙ্গে মিশাও।

পক্ষীর মাংসও এই প্রণালীতে রান্না করলে স্বাদ খুব রুচিকর হবে।

মাংসের কোর্মা—বিনা জলে প্রচুর ঘৃত ও অম্লরসের সাহায্যে ঢিমে আঁচে মাংসের বড় বড় খণ্ডগুলি মসলা সংযোগে সিদ্ধ করে এই রুচিকর খাদ্যটি প্রস্তুত হয়।

শিরদাঁড়ার মাংসগুলিকে বড় বড় খণ্ড করে কুটে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকনা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নাও। যে পরিমাণ মাংস, তার অর্দ্ধেক পরিমাণ টক দই চাই। দই টক না হলে তেঁতুলের ক্বাথ বা টমেটোর রস মিশিয়ে

টক করে নাও। দই বেশী না পেলে, বাকিটুকু টমেটো বা তেঁতুল দিয়েই পুরিয়ে নিতে হবে। এই থেকে অর্দ্ধেক পরিমাণ দই বা অম্লরস আলাদা রেখে বাকি টুকু হলুদবাটা, লঙ্কাবাটা, ধনে-জিরা-মরিচবাটা, আদা-রশুনবাটা ও নুনের সঙ্গে একত্র ফেটিয়ে মাংসগুলি মেখে ফেল। পলা কয়েক সরিষার তেল ঐ সঙ্গে মিশিয়ে এনামেল বা চিনামাটির পাত্রে চাপা দিয়ে অন্ততঃ চার ঘণ্টা রাখ। ছ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইভাবে রাখাই বিধি। কোর্ম্মায় জলের সম্পর্ক থাকে না ব'লে অনেকে মসলাগুলি পর্য্যন্ত দই দিয়ে বেটে নেন। সে যাই হোক, এখন পাক-পাত্রে বেশী পরিমাণে ঘি চড়িয়ে তেজপাতা, গরম মসলা (ভেঙ্গে এবং একটু ঘা দিয়ে) ও পিঁয়াজকুঁচি ফোড়ন দিয়ে ঐ দই-মসলামাখা মাংস ছেড়ে কষতে থাক। মাংস থেকে জল বেরিয়ে ও শুকিয়ে মসলার গন্ধ বা'র হতে থাকলে বাকি দই বা অম্লরসটুকু ঢেলে দাও। একটু চিনি এবং জাফরান মিশাও। খানিকটা নাড়াচাড়া করে ঢিমে আঁচে রেখে আস্তে আস্তে কষতে থাক। হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দাও। ঘিয়ের সঙ্গে বাদামবাটা ও পোস্তবাটা মিশিয়ে নামাও। ঘিয়ে কষে নিয়ে কিসমিস দিতে পার।

দধির পরিবর্ত্তে ভিনিগার বা সির্কা এবং ঘৃতের স্থলে সুইট অয়েল (জলপাইতেল) অভাবে সরিষার তেল দিয়েও কোর্ম্মা রাঁধবার আর এক প্রকার প্রণালী আছে। এই প্রণালীর রন্ধনে যে পরিমাণ মাংস, তার সিকি পরিমাণ সির্কা বা ভিনিগার এবং সিকি পরিমাণ তেল নিতে হবে এবং রশুনের ভাগ একটু বেশী নেওয়া চাই। সির্কা ও তেলের সঙ্গে মাংস খণ্ডগুলি আগেকার মত বাটামসলা দিয়ে মেখে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা চাপা দিয়ে রাখতে হবে। এর পর কলাইকরা বা এনামেলের কোন পাত্রে এই মাংস পাক করা উচিত। পাত্রে ঘি দিতে হবে না। সির্কা ও তেল মাখা মাংস পাত্রে ভরে জ্বালে চাপাও। কষতে থাক। মাংসের জল বেরিয়ে

মরে এলে আঁচ কমিয়ে দমে বসিয়ে রাখ। যখন দেখবে সিদ্ধ হয়ে মাংস শুধু তেলের উপর ভাসছে, তখন নামিয়ে নাও।

মাংসের কাবাব—এর প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে ছোলার ডাল। মাংসের কিমা যে পরিমাণ হবে, তার সিকি পরিমাণ ছোলার ডাল আগেই ভিজিয়ে রাখা চাই। ডালের পরিমাণে পিঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখ। এখন মাংসের কিমা, ভিজা ডাল, মোট পিঁয়াজ কুঁচির অর্দ্ধেক, গরমমসলা ও আদা একত্র হাঁড়িতে ভরে মৃদু আঁচে চাপাও। কিমা ও ডাল সিদ্ধ হয়ে জল মরে এলে ভাল করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নাও। এর পর নামিয়ে শিলে বেটে মেখে তাল মত কর। এখন বাকি পিঁয়াজকুঁচিগুলি কাঁচালঙ্কার কুঁচি এবং পুদিনা পাতার সঙ্গে অল্প বেটে আলাদা রাখ। এটা হল পূর। এবার ঐ ডেলা থেকে লেচির মত কেটে পিঁয়াজ-পুদিনা-কাঁচালঙ্কার পূর দিয়ে হাতে চেপে চ্যাপ্টা করে গড়। মৃদু আঁচে চাটু চড়াও যেমন করে অল্প ঘিয়ে পরটা ভাজা হয়, তেমনি করে চামচের সাহায্যে অল্প অল্প ঘি দিয়ে এই কাবাবগুলি ভাজাভাজি করে নাও।

মাংস-বেগুন-কোপ্তা—বেগুনগুলি লম্বা লম্বি আধা আধি কেটে এমন ভাবে সিদ্ধ করতে হবে যেন তার খোসাগুলি আস্ত রেখে শাঁসটুকু কুরে বা'র করে নেওয়া যায়। খোসাগুলি একটি পাত্রে রেখে শাঁসটুকু আর একটি পাত্রে আলাদা করে রাখ। হাড় শূন্য মাংস সিদ্ধ করে শিলে বেটে রাখতে হবে আগে। মাংসের কিমা সিদ্ধ করলেও হবে। পিঁয়াজগুলিও কুঁচিয়ে রাখা চাই। এখন পাত্রে ঘি চড়িয়ে আগে পিঁয়াজগুলি ভাজ। লালচে রঙ ধরলে বাটা মসলা দধি বা টমেটোর রসে গুলে ঐ পিঁয়াজের উপর ঢেলে দাও। ভাজাভাজি হয়ে এলে বেগুনের শাঁসটুকুও ঐ সঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করতে থাক। এর পর সিদ্ধ করা মাংসের কিমা বা বাটা

মাংসটুকু ওতে ঢেলে দাও, আর পরিমাণমত নুন মিষ্টি ও কিসমিস দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজাভাজি করে নামিয়ে রাখ। এই হল কাটলেটের ভিতরকার পূর।

এখন এই পূর বেগুনের খোলাগুলির ভেতরে ভরে দাও। আধখানা খোলাতেই ভরবে, আর আধা আকারেই এই কোপ্তা হবে। ডিমগুলিও ভেঙ্গে আর একটি পাত্রে ফেটিয়ে রাখবে। এবার পুরভরা বেগুন-গুলির প্রত্যেকটিতে ঐ ফেটানো ডিম বেশ করে মাখিয়ে পুর দেওয়া দিকটা তৈরী ঘিয়ের উপর আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও। লালচে মত হলেই খুন্তি দিয়ে উল্টে অপর পিঠটা অর্থাৎ খোলার দিকটাও ভেজে তুলে রাখ। এই হ'ল বেগুনের কোপ্তা। এইভাবে ডাল মোচা ইচড় ও মাছের পূর দিয়েও কোপ্তা করতে পার।

ডিম থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য

ডিমের ঝাল, কারি ও কোর্মা মাছ-মাংসের প্রণালীতেই পাক হবে। ডিম তেলে বা ঘিয়ে যত ভাজাভাজি কম হবে ততই ভাল। বেশী ভাজা হলে বা সিদ্ধ হলে ডিমের কতকগুলি গুণের অপচয় হয়। ডিমের কুসুম বা হরিদ্রাংশ খুব সহজে পরিপাক হয় এবং এই অংশটি মস্তিষ্ক পুষ্টির পক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। ডিমের গুণের কথা—মাছ-মাংসের গুণের সঙ্গে আগেই (৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে।

সূপ—মুগ, মসুর, ছোলা, বুট প্রভৃতি ডালের সংযোগে ডিমের সূপ তৈরী হয়ে থাকে। ডিমগুলি আগে সিদ্ধ করে খোলা ছাড়িয়ে অর্দ্ধখণ্ড করে কেটে রাখ। উনানে জল চড়াও। সিদ্ধ হলে হলুদবাটা, জিরা-মরিচবাটা, লঙ্কাবাটা, নুন ও চিনি মিশাও। ফুটে উঠলে ডিমের খণ্ডগুলি আস্তে আস্তে ছাড়। খানিকটা রেখে নামিয়ে নাও। ঘিয়ে

তেজপাতা, গরম-মসলা, পিঁয়াজ ও রশুনবাটা ফোড়ন দিয়ে পাত্রের ঝোল সঁাতলে নাও। নামিয়ে আদা ছেঁচা মিশাও।

পোচ—মৃদু আঁচে একখানা ফ্রাইপ্যান অভাবে চাটু চড়াও। অল্প একটু জল ঢাল। ফুটে উঠলে সামান্য নুন ছড়িয়ে মিশিয়ে দাও। ডিমটি ভেঙ্গে এমনভাবে ঐ লবণাক্ত জলে ফেল যাতে ডিমের কুসুম ও সাদা পরদা আলাদা হয়ে না যায়—অর্থাৎ ভিতরের সবটুকু অংশই আস্ত থাকে। ডিমের খোলাটির নীচের দিকটা ধারালো ছুরি দিয়ে একটু বেশী করে কাটলেই ভিতরের অংশটুকু এক সঙ্গেই আস্ত পড়বে। এখন জলে পড়বার একটু পরেই চামচে করে চাটুর জল তুলে ডিমের উপর আস্তে আস্তে দিতে থাক। যখন দেখবে নারিকেলের পাতলা শঁাসের মত হয়ে উঠেছে, তখন আস্তে আস্তে চামচে বা ছুরি দিয়ে ডিসে তুলে মরিচগুঁড়া মিশিয়ে খেতে দেবে। এটি হ'ল অত্যন্ত লঘুপাকের পোচ। একে আর একটু উপাদেয় করতে হ'লে জলের বদলে গাওয়া ঘি বা মাখন দিয়ে এই ভাবে তৈরী করবে।

ডিম-রুটি—পাঁউরুটি স্লাইস করে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে একখানা এনামেল বা চিনামাটির ডিসে রাখ। একটা পাত্রে ডিম ভেঙ্গে তার সঙ্গে নুন ও মরিচগুঁড়ো মিশিয়ে চামচে দিয়ে ফেটাও। এখন এই ডিমের গোলা পাঁউরুটির টুকরোগুলিতে মাখিয়ে মাখন বা ঘিয়ে সেঁকে নাও। চায়ের অনুষঙ্গরূপে এটি খুব মুখরোচক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য। নুন মরিচের বদলে চিনি দিয়ে মিষ্টি করে নিতেও পার।

ডিম-পরোটা—ময়দায় ময়ান দিয়ে মাখ; লুচি পরটায় জন্যে যেমন করে ময়দা তৈরী করা হয়। একটা পাত্রে ডিম ভেঙ্গে সমস্ত তরল পদার্থের সঙ্গে নুন, হলুদবাটা, কাঁচা লঙ্কাবাটা ও পিঁয়াজবাটা মিশিয়ে ভাল করে ফেটাও। মাখা ময়দার লেচি কেটে লুচির মত

গোল করে বেল। তার উপর ঐ ডিমের গোলা প্রলেপ দিয়ে আর একখানা লেচি ঐভাবে বেলে প্রলেপ দেওয়া পীঠটির উপরে বসিয়ে উভয় লুচির চারদিকের কিনারাগুলি মুড়ে দাও। এমনি করে সব লেচিগুলি তৈরী হলে ঢিমে আঁচে ফ্রাইপ্যান বা চাটু চড়িয়ে রুটির মত সেঁকে তারপর অল্প ঘিয়ে পরটার মত ভেজে নাও।

ডিমের কাষ্টার্ড—উপকরণঃ—ডিম চারটি, দুধ আধ-সের, চিনি এক ছটাক, কাগচিলেবু আধখানা, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস পরিমাণমত। **প্রস্তুত-প্রণালী**ঃ—দুধটুকু প্রথমে জ্বালে চড়াও; দু-তিনটে বলক উঠলে চিনিটুকু মিশিয়ে নাড়তে থাক। ঘন হয়ে এলে ডিম কয়টি ভেঙ্গে তরলাংশটুকু স্বতন্ত্র একটা পাত্রে ফেটিয়ে নিয়ে পাত্রের ফুটন্ত দুধে ঢেলে মিশিয়ে দাও। এখন থেকে অন্ততঃ বিশ মিনিট একটি বড় চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে পাত্রের দুধটুকু নাড়া চাই। এরপর পেস্তা, বাদাম, কিসমিসগুলি ছেড়ে দিয়ে অল্প নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেল। খাবার সময় দু চার ফোঁটা নেবুর রস মিশিয়ে নিলে আস্বাদ ভাল হয়।

ডিমের 'স্নোবল'—উপকরণঃ—ডিম চারটি, দুধ আধসের, চিনি এক ছটাক, ছোট এলাচের গুঁড়া। **প্রস্তুত-প্রণালী**ঃ—প্রথমে ডিম কয়টি ভেঙ্গে শ্বেত অংশটুকু হলদে অংশ থেকে আলাদা করে একটি পাত্রে রেখে ভাল করে ফেটিয়ে রাখ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফেনা না উঠবে ফেটাতে থাকবে। এদিকে দুধটুকু জ্বালে চড়িয়ে দাও। দু তিনটে বলক ওঠবার পর ঐ ফুটন্ত দুধের উপর অপর পাত্রে রাখা ফেটানো ও ফেনাযুক্ত ডিম একটা ছোট চামচ করে এক এক চামচ নিয়ে পর পর এমন ভাবে ফেলতে থাক যেন গায়ে গায়ে না মিশে যায়। ফুটন্ত দুধে পড়লে ডিমের ঐ

ফেনানো অংশ এক একটি ছোট ছোট গুটি বা বলের মত ফুটে উঠবে। তখন সেগুলিকে তুলে একটা আলাদা পাত্রে রাখ। এখন ডিমের হলদে অংশটুকু—সাদা অংশ থেকে যাকে পৃথক করে আলাদা পাত্রে রেখেছ, সেটা সেই পাত্রে ফেটিয়ে ঐ ফুটন্ত দুধে ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাক। নাড়তে নাড়তে দুধ মাঝারি রকমের ঘন হয়ে এলে তার সঙ্গে চিনিটুকু মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়। এর পর এলাচগুঁড়াটুকু মিশিয়ে নামিয়ে ফেল। পরিবেষণ করবার সময় এই দুধ ডিসে ডিসে ঢেলে তার সঙ্গে সাদাগুটি বা ডিমের বল (যেগুলি দুধ থেকে তুলে রেখেছ) পাঁচ ছয়টি করে ডিসের দুধের সঙ্গে দাও। এগুলো ঘন দুধের উপর ভাসতে থাকবে। দেখে যেমন আমোদ পাবে, খেতেও তেমন তৃপ্তিজনক।

ডিমের কোপ্তা—উপকরণঃ—ডিম, ঘি, আদা-পিঁয়াজ লঙ্কা-হলুদবাটা (ডিমের পরিমাণমত) নুন, চিনি ও গরমমসলাগুঁড়া। **প্রস্তুত-প্রণালী**ঃ—ডিম সুসিদ্ধ হলে খোলা ছাড়িয়ে লম্বা দিকটার সিকি অংশ ছুরি দিয়ে চিরে কুসুমটুকু একটা শলা দিয়ে আস্তে আস্তে বার করে রাখ। কড়ায় অল্প ঘি চড়িয়ে আদা-পিঁয়াজ-লঙ্কা-হলুদ-গরমমসলা-নুন-চিনি সবগুলি মেখে বাদামি রঙের মত হলে নামাও। ডিমের ভিতর থেকে যে কুসুমটুকু বার করে আলাদা রেখেছ—এই ভাজা মসলার সঙ্গে বেশ করে মেখে ফেল। এখন এই মাখা পদার্থটি ডিমের যে অংশটি চিরে রেখেছ—তার মধ্যে সন্তর্পণে ভরে দিয়ে ডিমটির মাঝখানে মিহি সূতা বা কলার ছোটা দিয়ে বেঁধে ঘিয়ে বা তেলে ভাজ। লালচে রঙ হলে তুলে নিয়ে খেতে দাও কিম্বা ডালনা, দম বা কারি যে প্রণালীতে রান্না হয় আলুর সঙ্গে পাক কর।

ডিমের ডেভিল—ডিম ১০ মিনিট সিদ্ধ করে তার খোলা

ছাড়াও। ডিমের খানিকটা অংশ ছুরি দিয়ে ফাঁক করে কুসুমটুকু বার করে কিসমিস, আদা-পিঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কাবাটা ও নুনের সঙ্গে ঐ কুসুম-টুকু এক সঙ্গে মেখে তার ভিতর পুরে দাও। আলু সিদ্ধ করে সামান্য ময়দা ও নুন দিয়ে মেখে ডিমের উপর পাতলা পরদার মত মাখাও। ডিমের সাদা ভাগ যেন দেখা না যায়। একটা কাঁচা ডিম ভেঙ্গে ফাটাও। বিস্কুট বা মুড়ি গুঁড়ো করে রাখ। এখন কড়ায় ঘি চাপিয়ে আলু-ময়দার প্রলেপ দেওয়া ডিম ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে লাল করে ভাজ।

ডিমের পুডিং—এক সের দুধে আধ পোয়া চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে আধ সের কর। আটটি ডিম ভেঙ্গে কুসুম ও সাদা অংশটা আলাদা করে রাখ। ডিমের সাদা অংশটা ঘোল মইবার মত করে এমন ফেটাও যেন ফেনা ওঠে। যখন খুব ফেনা হবে তখন তার সঙ্গে হলদে কুসুম, ঘন দুধ, ফোঁটা দুই গোলাপী আতর ও বেকিং পাউ-ডার—সবগুলি এক সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে ফেল। এখন একটি এলুমিনিয়মের পাত্র একটু গরম করে তার ভিতরটার চারদিকে ঘি মাখিয়ে ঐ মেশান তরল পদার্থটুকু সমস্ত ঢেলে মৃদু আঁচে চড়িয়ে দাও। একঘণ্টা রেখে নামাও। ঠাণ্ডা হলে খেতে দাও।

ডিমের পাটি-সাপটা—প্রথমে মাংসের কিমাটুকু দমে বসিয়ে বা সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে সুসিদ্ধ কর। যেন সিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে জলটুকু কিমার গায়ে মিশে যায়। এই অবস্থায় শিলে এই সিদ্ধ কিমা বেটে রাখ। এর পর পাক-পাত্রে ঘি চড়িয়ে লঙ্কা-হলুদ-পিঁয়াজ-আদা-ধনে-জিরা-মরিচ ও গরম মসলা বাটা সমস্ত ছাড়। বেশ ভাজা-ভাজি হলে বাটা কিমাটুকু ঢেলে দিয়ে মসলাগুলির সঙ্গে খন্তি দিয়ে মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে চেড়ে ভাজ। এই সময় টক্ দই বা টমেটোর

রস-টুকুর সঙ্গে কাঁচালঙ্কার কুঁচি, (ইচ্ছা করলে বা রুচি থাকলে অল্প ধনে শাক কুঁচিয়ে এই সঙ্গে দিতে পার) দিয়ে আর একবার ভাজাভাজি কর। রসটুকু মরে গিয়ে ঝরঝরে হলে কিসমিস পেস্তা বাদাম-কুঁচি ও নুন মিষ্টি মিশিয়ে আরও একটু নাড়াচাড়া করে একটা পাত্রে ঢেলে চাপা দিয়ে রাখ। এই হল পাটি-সাপটার পূর।

এবার ডিমগুলি ভেঙ্গে সাদা অংশটুকু একটি পাত্রে ও হলদে অংশ বা কুসুমটুকু আর একটা পাত্রে রাখ। সাদা অংশটুকু আগে চামচ বা কাঁটা দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নাও। এর পর কুসুমটুকু এই সঙ্গে মিশিয়ে অল্প গরম মসলার গুঁড়া নুন চিনি ও কালমরিচ চূর্ণ দিয়ে গোলাটি নাড়াচাড়া করে মৃদু আঁচে চাটুর উপর মাখন বা ঘি চড়িয়ে ঐ গোলা ঢেলে দিয়ে সরুচাকলি বা পাটি-সাপটা পিঠে যে ভাবে চাটুর উপর তালের পাতা বা কোন শক্ত পাতা দিয়ে চার দিকে গোল করে মেলে দেওয়া হয়,—সেই ভাবে পুরু করে বিস্তার করে দাও। এখন এর এক প্রান্তে কিমার পূর পরিমাণমত নিয়ে লম্বালম্বি করে দিয়ে—পাটি-সাপটার মত ডিমের আমলেটটি পূর শুদ্ধ ঘুরিয়ে পাকিয়ে ফেল। এর পর এই পাকানো পাটি-সাপটার দুই পিঠ উল্টে পাল্টে লালচে করে ঘিয়ে ভেজে নাও। এই ভাজাতে ছাঁকা ঘিয়ের প্রয়োজন হয় না—চাটুর উপর অল্প মাখন বা ঘি দিয়ে ভাজার কাজ সেরে নেবে। এই ভাবে যে কখানা পাটি-সাপটা তৈরি হবে সেগুলি খাবার সময় ছুরি দিয়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করে পরিবেষন কর। ইচ্ছা করলে আস্তও রাখতে পার।

স্নেহ দ্রব্য বা চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য (ফ্যাট)

ইংরাজী ফ্যাট (Fat) শব্দের অর্থ হচ্ছে চর্ব্বি। যে সকল খাদ্যে চর্ব্বির ভাগ বেশী থাকে তারা চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য বলে গণ্য হয়েছে। আমাদের খাদ্য-ব্যাপারে বর্ত্তমানে একে স্নেহ জাতীয় খাদ্য বলা হয়ে থাকে। **চর্ব্বি বা স্নেহজাতীয় খাদ্য বলতে মোটামুটী মাখন, ঘি, সরিষা, বাদাম, জলপাই, নারিকেল প্রভৃতির তেল, মাছের তেল ও প্রাণীদের চর্ব্বিকে বুঝায়।** কিন্তু কতকগুলি ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ দ্রব্য থাকায় খাদ্য বিজ্ঞানে তারাও চর্ব্বিজাতীয় খদ্যের অন্তর্গত হয়েছে। যেমন—**নারিকেল, বাদাম, চিনাবাদাম, আখরোট** প্রভৃতি। দুধের সরে এবং ডিমের কুসুমেও প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি থাকায় এ দুটি খাদ্যও স্নেহ জাতীয় বলে গণ্য হয়েছে। সুপারিতেও কতকটা স্নেহ পদার্থ আছে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে চর্ব্বিই আমাদের দেহের সঞ্চিত শক্তি। এই শক্তির সঞ্চয় হ্রাস পেলেই দেহ ক্ষয় হতে থাকে। তখন যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু অবাধে দেহের মধ্যে জট পাকিয়ে বসে। এই জন্যই পুষ্টিকর আহারের অভাবে বা রোগে ভুগে যে সব ছেলে মেয়ে খুব কৃশ হয়ে পড়ে, চিকিৎসকরা তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা দেন। দৈহিক কৃশতা হলেই বুঝতে হবে দেহে হয়েছে চর্ব্বির অভাব এবং যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি গ্রহণ করলেই সহজে তা পূরণ হতে পারে। স্বাস্থ্যবিদ্‌দের মতে সঞ্চিত চর্ব্বি দেহকে ঠাণ্ডা থেকে শীত বস্ত্রের মত রক্ষা করে। দেহের চামড়ার নীচেই এক স্তর চর্ব্বি জমে থাকলে সহজে ঠাণ্ডা যেমন লাগতে পারে না, মারাত্মক রোগের জীবাণুও সেখানে প্রবেশ করবার পথ পায় না। তাছাড়া

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রধান উপাদান হচ্ছে এই চর্ব্বি। মন ও মাথাটি ভাল রাখতে হলে চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। তবে এই সঙ্গে একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, স্নেহ পদার্থ পৃথকভাবে আহার করলে সহজে পরিপাক হয় না, ভাত রুটি প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করলে তবেই সুপাচ্য এবং দেহের পক্ষে হিতকর হবে।

মাখন—চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাখনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিজ্জ তেলে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) বলে কিছু নেই, কিন্তু মাখনে খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। এমন কি, ঘিয়ের চেয়েও মাখনের গুণ অনেক বেশী। ঘি দুষ্পাচ্য, ঘিয়ে কোষ্ঠবদ্ধতার ভয় থাকে। কিন্তু মাখন সহজপাচ্য ও সারক। কাঁচা অবস্থায় বা ঈষৎ গলিয়ে মাখন ব্যবহার করলে যে ফল পাওয়া যায়, তেল বা ঘিয়ের মত মাখনকে পাক করে ব্যবহার করলে সে উপকার হয় না। খাদ্যের সঙ্গে মাখন পাক করলে তার ভিতর থেকে চর্ব্বি-জাতীয় একপ্রকার অম্ল নির্গত হয়, তার ফলে অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি হয়। বরং ব্যঞ্জন রন্ধনের পর কতকটা ঠাণ্ডা হলে তখন মাখন ঈষৎ গলিয়ে তাতে ঢেলে দিলে মাখনের গুণ বজায় থাকে। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা বলেন যে, গরম স্নেহ পদার্থের চেয়ে শীতল স্নেহ পদার্থের গুণ বেশী এবং শীঘ্র সুপাচ্য হয়। গরম ভাতে মাখন মেখে কিম্বা রুটির সঙ্গে চিনি দিয়ে মাখন খেলে খাদ্য যেমন সহজে পরিপাক হয়, দেহেরও তেমনি উপকার হয়ে থাকে।

উদ্ভিজ্জ্য তেল—স্বাস্থ্যবিদ্‌দের মতে মাখন ঘি প্রভৃতি গ্রহণ করলে আমাদের দেহে যে পরিমাণে চর্ব্বির সঞ্চার হয়, তেলের দ্বারাতেও তাই হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, স্নেহ-পদার্থ মাত্রই দেহের মধ্যে গিয়ে একইভাবে কাজ করে। উদ্ভিজ্জ তেলগুলির মধ্যে অলিভ-অয়েল

বা জলপাইপের তেলকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে খাদ্য-বিজ্ঞানে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও যাবতীয় উদ্ভিজ্জ তেলই ঘি মাখনের চেয়েও সহজপাচ্য, কিন্তু এই তেলটি আরও অধিক সহজপাচ্য। সরিষার তেলের মত রন্ধন এবং গাত্রমর্দ্দন উভয় কাজেই এই তেলটি ওষুধের মত হিতকর এবং নির্দ্দোষ। আয়ুর্ব্বেদের মতে 'ঘিয়ের চেয়ে তেল আট-গুণ বেশী উপকারী—যদি দেহে মর্দ্দন করা যায়।' স্নানের আগে তেল ভাল করে মর্দ্দন করলেও দেহের মধ্যে গৃহীত হয়ে থাকে।

স্নেহজাতীয় বিভিন্ন খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালী

নারিকেল কুরকুচির ডালনা—কচি বা নেওয়াপাতি ডাব-নারিকেলের জলটুকু খেয়েই সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়; গৃহস্থ সংসারে সেটি শুখিয়ে পরে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যে ডাবে শাঁস হয়নি, তার কচি মালার ছালটুকু—যাকে আমরা 'কুরকুচি' বলি,কাটারি বা বাটালি দিয়ে চেঁচে নিয়ে একটি মুখরোচক ব্যঞ্জনে পরিণত করতে পারা যায়। এর প্রস্তুত-প্রণালী খুব সোজা, অথচ খাদ্য হিসাবে এর উপযোগিতা খুব বেশী।

ডাবের জলটুকু ঢেলে নিয়ে নারিকেলটি দু'ফালি করে চিরে ফেলে কচি কচি মালার কুরকুচিগুলি ছুরি বা কাটারি দিয়ে তুলে নাও। বঁটি দিয়ে ইচড়ের মত করে কুঁচিয়ে কাট। এরপর কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে নাও। পরিমাণ মত ছোলা ভিজিয়ে রাখ। আলুগুলি কেটে তেলে কষে তুলে রাখ। পাত্রে তেল চড়িয়ে তেজপাতা, জিরা ও গুটি দুই শুকনা লঙ্কা ছিঁড়ে ফোড়ন দিয়ে সিদ্ধ করা কুর-কুচিগুলি ঢেলে ভাজাভাজি করে নাও। এরপর লঙ্কা জিরা-মরিচ ও ধনে-বাটা দিয়ে জল ঢেলে দাও। জল তেতে উঠলে কষা আলু ও ভিজানো ছোলাগুলি ছেড়ে দাও। ফুটে ঘন ঘন

হয়ে এলে নুন একটু মিষ্টি ঘি ও গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে নাও। এই ব্যঞ্জনের স্বাদ ঠিক ইচড়ের ডালনার মত হবে।

নারিকেলের বড়া—নারিকেল কুরা যে আন্দাজে নেবে, তার অর্দ্ধেক আতপ চাল ভিজিয়ে রাখবে। চালগুলি ছেঁকে তুলে নারিকেল কুরার সঙ্গে শিলে বেটে নাও। সামান্য একটু মিষ্টি ও আন্দাজমত নুন এক চিমটে হলুদ গুঁড়া ও মৌরী গুঁড়া তাতে মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে তেলে বা ঘিয়ে বড়ার মত করে ভেজে নাও। বড়াগুলি একটু চ্যাপ্টা করবে।

নারিকেলের কচুরী—নারিকেল কুরে কিম্বা নারিকেল মালা থেকে বাটালির সাহায্যে সরু সরু করে খুলে নিয়ে শিলে বেটে রাখ আগে। এরপর কড়ায় ঘি চড়িয়ে আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, হলুদ-বাটা, টমেটোর রস বা টক দই, নুন ও চিনি, দিয়ে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে ফেল। এবার নারিকেলবাটাটুকু ঢেলে দিয়ে বেশ করে ভাজাভাজি করতে থাক। বেশ ভাজা হয়ে এলে জিরা ও গরম মসলা গুঁড়া মিশিয়ে অল্প নেড়েচেড়ে কিসমিসগুলি মিশিয়ে দাও। এরপর দু-একবার নেড়ে নামিয়ে ফেল।

এখন এই পুর ময়দার লেচির মধ্যে দিয়ে অল্প বেলে নিয়ে ভাজলে কচুরী; আর আলু সিদ্ধ করে মেখে তার মধ্যে ভরে বেসনে ডুবিয়ে ভাজলে চপ বলে গণ্য হবে।

নারিকেল-মুগের রসমুণ্ডি—মুগের ডাল সিদ্ধ করে জলটা শুকিয়ে নাও। নারিকেলটি কুরে সুজির সঙ্গে মেখে দুধে ভেজাও। পরিমাণমত কাঁচা মুগের ভিজা ডাল শিলে বেটে নাও। এখন নারিকেল বাটা, ডাল বাটা ও দুধে ভেজানো সুজি একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়ে মৃদু আঁচে পাক করে ছোট ছোট মোণ্ডার মত পাকিয়ে ঘিয়ে লালচে করে ভেজে চিনির রসে ফেল।

নারিকেলের বরফি—নারিকেল কুরে বেটে নাও। পরিমাণমত ছানাও আলাদা রাখ। দুটা নারিকেল হলে এক পোয়া ছানা চাই। এক ছটাক ক্ষীর, দেড় পোয়া চিনি, আধ সের সুজি, এক পোয়া ময়দা, নারিকেল বাটা ও ছানার সঙ্গে মেখে মিশিয়ে পাক কর। যখন জল মরে শুকনো মত হবে তখন নামিয়ে নিয়ে বরফির আকারে বেটে বাদামী করে ঘিয়ে ভেজে নাও। চিনির রস করে তাতে বরফিগুলি দিয়ে উনানে চাপাও। রস মরে গেলে নামিয়ে নাও।

নারিকেলের রসপুলি—উপকরণ: নারিকেল ১টা, ক্ষীর এক পোয়া, সুজি আধ পোয়া, চিনি পাঁচ ছটাক, দুধ পাঁচ পোয়া। প্রস্তুত-প্রণালী: সুজি দুধে ভিজিয়ে, নারিকেল কোরার সঙ্গে মিহি করে বেটে নাও। আধ পোয়া চিনি তার সঙ্গে দিয়ে হালুয়ার মত পাক কর। ছোট ছোট রসমুণ্ডির মত গুলি তৈরী কর। দুধ ও বাকী চিনি উনানে চড়িয়ে জ্বাল দিতে থাক এবং ফুটন্ত দুধে মুণ্ডিগুলি ধীরে ধীরে ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে খন্তি দিয়ে নাড়তে থাক। একটু ঘন হলে নামিয়ে এলাচের গুঁড়া মিশিয়ে দাও।

নারিকেল দুধের হালুয়া—উপকরণ: চিনি দেড় পোয়া, সবেদা এক পোয়া, দুটি নারিকেলের দুধ, ঘি বা মাখন আধ পোয়া, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস। প্রস্তুত-প্রণালী: চিনি ও সবেদা নারিকেলের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মৃদু আঁচে পাক কর। গাঢ় হয়ে এলে নামিয়ে রাখ। একখানি পিতল বা এলুমিনিয়মের কড়া চাপিয়ে অল্প ঘি বা মাখন দাও। তেতে উঠলে পূর্ব্বের পাক করা দ্রব্যটি ঢেলে দিয়ে, একটু নেড়েচেড়ে কিসমিস, বাদাম, পেস্তা ছড়িয়ে দাও। হালুয়ার মত হলে নামিয়ে নাও।

নারিকেল কারি—উপকরণ:—চিংড়ী মাছ এক সের,

নারিকেল ১টী, পেঁয়াজ এক পোয়া, আদা এক ছটাক, কিসমিস এক ছটাক, গরম মশলা আন্দাজমত, ঘি এক ছটাক, চিনি এক ছটাক, নুন, হলুদ ও লঙ্কা বাটা আন্দাজ মত, দই আধ পোয়া, সরিষার তৈল এক ছটাক। প্রস্তুত প্রণালী: মাছগুলির মাথা বাদ দিয়ে খোলা ছাড়িয়ে সামান্য নুন মাখিয়ে নাও। এবার ভাল করে ধুয়ে মাছগুলিকে কাটলেটের মাছের মত খুড়ে নিয়ে সিদ্ধ কর। সিদ্ধ হলে জল গেলে দইটুকু ঢেলে মাছগুলি মেখে ফেল। নারিকেলটি কুরে ঘি দিয়ে ভেজে নাও। এবার দই মাখান সিদ্ধ মাছ, ভাজা নারিকেল কোরা, গরম মশলা, কিসমিস, হলুদ-লঙ্কা বাটা, নুন চিনি সব এক সঙ্গে মিশিয়ে সামান্য জল দিয়ে উনানে চড়াও। ফুটতে আরম্ভ করলে খানিকটা কাঁচা সরিষার তেল ঢেলে দাও। পেঁয়াজ ও আদা মিহি করে বেটে পরিষ্কার কাপড়ে নিংড়ে তার রসটা দাও। জল মরে গেলে নামিয়ে নাও।

নারিকেলের মালপো—উপকরণ:—দুধ একসের, আধসের ময়দা, আটটী পাকা কলা, এক পোয়া নারিকেল কোরা, কিসমিস, চিনি, ছোট এলাচ ও ঘি। প্রস্তুত প্রণালী:—একসের দুধে ময়দা, কলা, চিনি, নারকেল কুঁচি বাটা বা কোরা ভাল ভাবে মিশিয়ে নাও। কিসমিস ও এলাচের গুঁড়োও তাতে দাও। কড়ায় পরিমাণ মত ঘি চড়াও। এবার গোলাটুকু ঐ ঘিয়ে বেশ লালচে করে ভেজে খেতে দাও। এগুলি হ'ল মালপো। এর পর ইচ্ছা করলে এগুলিকে ঘন চিনির রসে ফেলে আরও তৃপ্তিকর ও রস-মধুর করে নিতে পার।

নারিকেলের নকল চিংড়ী মাথা—উপকরণ: নারিকেল ১টী, চিনি এক পোয়া, ঘি এক ছটাক। প্রস্তুত প্রণালী:—একটি ঝুনো নারিকেলের শাঁসটুকু খুলে তার বাদামে রংয়ের খোসাটুকু ছাড়িয়ে সুপারির পাতের মত কেটে কুঁচি কুঁচি করে

একটা পাত্রে ভিজিয়ে দাও। খানিক পরে ভাল করে কচলে ধুয়ে একটি পাত্রে রাখ। এখন চিনির সঙ্গে নারিকেল কুঁচিগুলি মিশিয়ে মৃদু আঁচে একটা স্যসপানে করে উনানে চাপাও। পাক করবার সময় খন্তি দিয়ে নাড়তে থাক। যাতে ধরে না যায় বা রং লাল না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। পাক করবার সময় আটআটা মত হলে নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। এবার পাক করা নারিকেল খানিকটা হাতে নিয়ে চিংড়ী মাছের মাথার মত করে গড়। এই ভাবে সবগুলি গড়ে নিয়ে, চাটুতে সামান্য ঘি দিয়ে মৃদু আঁচে চিংড়ীর নকল মাথাগুলি বাদামী রং করে ভাজ। ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হলে খেতে দাও।

নারিকেলের চাটনি—একটা ঝুনা নারিকেল কুরে শিলে বেটে নাও। বাটবার সময় দুটো কাঁচালঙ্কা কুঁচিয়ে ঐ সঙ্গে দাও—একত্র বাটা হবে। এখন পাকা তেঁতুলের ক্বথ্ বড় চামচের এক-চামচে, দু-চামচে চিনি এবং চায়ের চামচের এক চামচে নুন মিশিয়ে মেখে নাও।

মধুরেণ সমাপয়েৎ—নিরামিষ পুডিং

মেয়েদের পিকনিকের ভোজ প্রায়ই একটি নিরামিষ খাদ্য দিয়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয়ে থাকে। বনমালা দেবী বিদেশী 'পুডিং' নামক খাদ্যটিকে নূতন প্রণালীতে একটি অপূর্ব্ব রুচিকর স্বদেশী খাদ্যে পরিণত করেছেন। এর নামকরণ হয়েছে—নিরামিষ পুডিং। অনেকের ধারণা, ডিম না দিলে পুডিং জমে না। কিন্তু বিনা ডিমেও যে পুডিং করা যায়, আর খেতেও খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হয়—পিকনিকের মেয়েরা হাতে-কলমেই সেটি জেনেছে।

পোয়াটাক জলশূন্য ছানাই হচ্ছে এর প্রধান উপাদান। আর চাই—এক ছটাক ক্ষীর, আধ পোয়া চিনি, দুধ আধ পোয়া, কিসমিস, বেকিং পাউডার চায়ের চামচের চার চামচে, কাঁচ্চা খানেক ঘি বা মাখন, আর

দু' চামচে গোলাপ জল। এখন চিনামাটি বা এনামেলের ডিসে ছানাটুকু এমন ক'রে থেসে মাখ—খিঁচ না থাকে। আর একটা পাত্রে দুধের সঙ্গে ক্ষীর ও চিনিটুকু মিশিয়ে ফেটিয়ে খিঁচশূন্য ক র। ছানাটুকু তুলে এই পাত্রে দিয়ে বেশ করে মিশিয়ে নাও। যেন একটুও খিঁচ না থাকে। এই সময় গোলাপ জল আর বেকিং পাউডার মিশিয়ে আর একবার ফেটিয়ে নাও। এখন একটি এলুমিনিমের কৌটা বা বাটি নাও—যার মুখটি ঢাকা দিয়ে সহজে এঁটে ফেলা যায়, এবং কাইটুকু ভরলে ভিতরে অর্দ্ধেকের উপর খালি থাকে। ঘি বা মাখনের কথা যা বলেছি, সেটুকু সমস্ত গলিয়ে এই বাটিটির ভিতরে—মায় ঢাকনির ভিতরটি পর্য্যন্ত ভালভাবে মাখিয়ে ঐ কাইটুকু ঢেলে দাও, ভিজা কিসমিসগুলি উপরে ছড়িয়ে দিয়ে কৌটা বা বাটির ঢাকনি এঁটে দাও। কোথাও যেন ফাঁক না থাকে। উনানে এমন একটা ডেকচি বসাও ও জল দাও—কৌটাটি তাতে বসালে অর্দ্ধেকটুকু মাত্র ডুবে থাকবে। জল ফুটতে থাকলে কৌটাটি জলের উপর মাঝখানে আস্তে আস্তে বসাও। ঘড়ি ধরে সওয়া ঘণ্টা ঐ ফুটন্ত জলে কৌটাটি রাখ। জল ফুটে কমে এলে, সেই আন্দাজ জল ডেকচিতে দাও। ৩।৪ বার এভাবে জল দিতে হবে মনে রেখো। ঠিক সওয়া ঘণ্টা পরে কৌটাটি তপ্ত জল থেকে তুলে একটী ঠাণ্ডা জলের পাত্রে ধীরে ধীরে বসিয়ে দাও। এই পাত্রে ঠাণ্ডা জল এমন আন্দাজে রাখবে কৌটার ঢাকনির ফাঁক দিয়ে তার ভিতরে না জল ঢোকে। পনেরো মিনিট এই ভাবে রেখে কৌটাটী খুলে একটা ডিসের উপর উল্টে দাও। দেখ, ঠিক ঐ কৌটার ছাঁচেই চাপ বেঁধে পুডিং তৈরি হয়েছে।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা